খেলাঘর

রাজ অন্দরের অন্তরঙ্গ কথা

মহারাজকুমারী কমলপ্রভাদেবী

ত্রিপুরা দর্পণ
আগরতলা

KHELA GHAR

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ১৯৯৯ইং

বিকচ চৌধুরী

সম্পাদনা
বিকচ চৌধুরী
সমীরণ রায়

প্রচ্ছদ
ইমানুল হক

প্রকাশনা
ত্রিপুরা দর্পণ
আগরতলা, ত্রিপুরা

মুদ্রণ : প্রিন্ট বেষ্ট

বিনিময় : পচাত্তর টাকা

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসের
অনুরাগী পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে

কার খেলাঘর ?

'খেলাঘর' কোন রূপকথার রাজ-কন্যার কাহিনী নয়। এই শ্যামলা ত্রিপুরার জল হাওয়ায় লালিত পালিত এক বিস্ময়কর প্রতিভাশালী রাজেন্দ্র নন্দিনী মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর জীবনবোধের অনুপম কাহিনী। সুদীর্ঘ জীবনের বিচিত্র অনুভূতির মর্মস্পর্শী স্মৃতিমালোর নাম খেলাঘর।

১৯১৫ সালে এই আগরতলায় তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। মায়ের নাম চতুর্থ মহারাণী জীবনকুমারী দেবী।

প্রথাগত শিক্ষায় তিনি শিক্ষিতা নন। তবে বিশ্বপ্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একনিষ্ঠ ছাত্রী। ছোটবেলা থেকেই অক্ষর, ধ্বনি ও রঙে তাঁর আকর্ষণ ছিল সুগভীর। পিতা বীরেন্দ্রকিশোর ছিলেন পাশ্চাত্য রীতির এক উচ্চমানের শিল্পী। সঙ্গীত ও যন্ত্রশিল্পেও তাঁর ছিল অপূর্ব দখল। তাছাড়া বংশ পরম্পরায় ত্রিপুরার রাজ-অন্দর ছিল কাব্য, ছন্দ ও সুরের ঝর্ণাতলের বিধৌত। প্রপিতামহ বীরচন্দ্রের শিল্প, কাব্য ও সঙ্গীতের অনুরাগ সেকালে বহু বন্দিত। এই অসামান্য শিল্পীস্বত্তা প্রবাহিত হয়েছিল রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের মধ্যে। রাজৈশ্বর্যের মধ্যে বড় হলেও এঁদের অনেকেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন সুর ও রঙের, শব্দ ও ধ্বণির সৃষ্টিশীল সাধনায়। এঁদের অসামান্য অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের মতো মণিষীকেও বারবার মুগ্ধ করেছে। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি ও শিল্পবোধের যে সুউচ্চ ধারণা একদিন চমৎকৃত করেছিল আগ্রহী বিশ্বকে, তার মূল স্রোতধারা কিন্তু প্রবাহিত হয়েছে রাজ-অন্দর থেকেই।

রাজন্যযুগের সংস্কৃতি সাধনার সেই অমূল্য ইতিহাস আমাদেরই অবহেলায় উপেক্ষিত রয়ে গেল। ইতিহাসের কাছে আমরা দায়ী রয়ে গেলাম।

রাজ অন্দরের বিভিন্ন উৎসব রীতি, পদ্ধতি, ভাষা আচার, অনুষ্ঠান, রাজকন্যা রাজকুমারদের জীবনচর্চার ইতিহাস ব্যতিক্রমধর্মী বলেই সাধারণ্যে এর পরিচিতির প্রয়োজন। অনুন্নত জনপদে অন্যত্র যেখানে মধ্যযুগীয় জিগীষা ও জিঘাংসার প্রবনতা রাজকুলকে ব্যস্ত রেখেছে — এখানে তার ব্যতিক্রম অবশ্যই লক্ষ্যনীয়। তমিস্রার বিস্তারের যুগেও সৃষ্টি-বীনা এখানে বেজেছে স্বয়ং রাজপুরুষের হাতে। তাই বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজকুলের চার পুরুষের আত্মার আত্মীয়।

খেলাঘরের 'ধুনুমুনু' আসলে রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবী স্বয়ং। রাজ-অন্দরে তাঁর বড় হওয়ার স্মৃতিকেই তিনি গল্পের ছলে বলেছেন।

ত্রিপুরার কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার বিস্তৃত কাহিনী এখানে পাওয়া যাবেনা। তবে তার নির্যাস অবশ্যই পাওয়া যাবে। নিজের জীবনের অসংখ্য স্মৃতি তিনি উজাড় করে দিয়েছেন এই 'খেলাঘরে'। যে কথা আগেই বলেছি 'খেলাঘর' তাঁর জীবনী নয়, তাঁর অনুপম জীবনবোধের কাহিনী।

ত্রিপুরার মানুষ কমলপ্রভা দেবীকে জানেন মূলতঃ চিত্রশিল্পী হিসেবে। কিন্তু শিল্প বা দৃশ্যপটকে তিনি যে শব্দের অপরূপ দ্যোতনায় প্রকাশ করতে পারেন তার অহরহ পরিচয় পাওয়া যাবে 'খেলাঘরে'র পাতায় পাতায়। শিলং, কার্শিয়াং, মুসৌরী ডেনমার্ক, লণ্ডনের ভ্রমন কাহিনী এমন জীবন্ত করে তোলা সত্যিকারের মহান শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। তার বর্ণনার অপরূপ ভাষা আজকের যুগের পর্যটন শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপনকেও হার মানাবে। অবলীলায় তিনি পাঠককে টেনে নিয়ে যান নিঃস্বর্গলোকে।

আমরা রূপকথার রাজকন্যার গল্প শুনে অভ্যস্ত। কিন্তু 'খেলাঘর' এমন এক রাজকন্যার সুদুর্লভ অভিজ্ঞতার নির্যাস--- যেখানে বিত্তের বৈভবকে ছাড়িয়ে চিত্তের বৈভবের অপূর্ব দ্যোতনাময় স্মৃতিমেদুর কাহিনী পরতে পরতে বিধৃত।

কমলপ্রভা দেবী সংস্কৃতিমনা ত্রিপুরার রাজকুলের প্রবীণতমা জীবিত সার্থক প্রতিনিধি। আজকের প্রজন্মের কাছে রাজকুলের ইতিহাস মানেই অন্তহীন মদিরার ফোয়ারা, জলসা আর বাঈজী নাচ, মৃগয়া আর রক্তলীপ্সু সম্প্রসারণবাদ। কিন্তু এই পার্বতী ত্রিপুরার গহণকুঞ্জে জীবন চর্চ্চার ইতিহাস বহুলাংশেই স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। এখানে বৈভবের বহিঃপ্রকাশ ছিলনা, স্খলন পতনের বিচ্যুতি ছিলনা, একেবারেই সেকথা বলছিনা। কিন্তু প্রাণের যে সম্পদ ছিল যা জনসংহতির ভিত্তি তাকে গৌণ করা ইতিহাসের প্রতি বিরাট অন্যায়।

রাজ অন্দরের ইতিহাস বর্ণনার জন্য কমলপ্রভা দেবী লেখনী ধরেননি। নিজের জীবনের বিচিত্র অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির কথা বলেছেন, মানুষের কথা বলেছেন। জীবনের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন। ঈশ্বর, প্রেম, ভালবাসা, দেহ, দেহাতীত রহস্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিল্প, সঙ্গীত সকল প্রসঙ্গেই তাঁর প্রথা বহির্ভূত অনন্ত জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিকোণে নিজের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন নিজেই। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও এক অদম্য মৌলিকতা তাঁর মধ্যে রয়েছে। তিনি ত্রিপুরার রাজ পরিবারে একেবারে ছেলেবেলা থেকেই এক বিদ্রোহী চরিত্র। কোন প্রকার বাঁধন তিনি মানেননি। তাই রাজকন্যা বলতে পারেন " রাজশক্তিতে আমি বিশ্বাসী নই। রাজরোষ আমার জন্য বৃথা, ব্যর্থ হয়েছিল। পৃথিবীটাই আমার কারাগার।" এই একলা চলার পথে অসংখ্য বাঁধা বিপর্যয়ের মধ্যে জীবন তাঁর জর্জ্জরিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখ সুখকে সমানভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা তিনি হারান নি। অবলীলায় বলতে পেরেছেন--- " মৃত্যু মানেতো একটি কাহিনীর পরিসমাপ্তি মাত্র।" অতএব ভয়কেই তিনি জয় করে নিজের পথে চলেছেন। বক্তব্যকে স্পষ্ট করে অকপটে বলার সাহস দেখিয়েছেন বার বার। " গানে আনন্দ, কিন্তু তাল কেটে যেত, তবু আমার কুঞ্জে আমি পাখী।" এই স্বকীয়তা সর্বত্র বজায় রেখেছেন।

ত্রিপুরার রাজবাড়ীর কথিত ভাষার রূপ নানা ভাষার সংমিশ্রনে একটু বিকৃত। তাই 'খেলাঘরে' এর প্রভাব দেখা যাবে, কিন্তু পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হবে না।

'খেলাঘর' তিনি লিখেছেন বই প্রকাশ করার জন্য নয়। এই অধম অপত্য স্নেহে তাঁর

কাছে মানুষ হয়েছি– জীবনের চরম সংকটের মুহূর্তে তিনি আমায় বিপথ থেকে পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাসেব প্রতি অনুরাগ তাঁরই কাছে পাওয়া। তাই আমার অনুরোধে তিনি শুধু সম্মতিই দিলেন না - অকৃত্রিম স্নেহপ্রবনতায বইটির সর্বস্বত্ত্ব আমার হাতে তুলে দিলেন। এমন কি প্রয়োজনে সম্পাদনার অধিকারও। আমরা তাঁর উপর কলম চালাইনি---- বাজ অন্দরে ব্যবহৃত বাংলা শব্দ বহুলাংশেই রেখে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও বানানেব বিভিন্নতা, শূণ্য বিভক্তিব প্রযোগ চোখে পড়বে। কি ন্তু বক্তব্য উপস্থাপনার স্বকীয়তায় এবং পুবণো দিনের বিবৃতিতে অসীম স্মৃতিশক্তির প্রখরতাব নৈপুণ্যে ঐসব তুচ্ছ ত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না বলেই মনে করি।

'খেলাঘর' বই আকারে প্রকাশ কবা আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন অপরিশোধ্য মাতৃ-ঋণ পরিশোধের বিনীত প্রয়াসও বটে। নানান জটিলতায় এই স্বপ্ন আমার ব্যর্থ হতে বসেছিল। পরিশেষে 'ত্রিপুরা দর্পণ' এর অনুজ প্রতিম সম্পাদক শ্রীমান সমীরণ বায এগিয়ে এসে আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা শুধু নয়, ত্রিপুরার ইতিহাসের প্রতি তার সুবিদিত অনুরাগ প্রদর্শণ করে আমাদের সকলের প্রশংসাভাজন হলেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থ প্রকাশে আরেক অনুজ-প্রতিম বন্ধু অশেষ দেব অত্যন্ত উদার সহায়তার হাত প্রসারিত করেছেন। আমি তাঁর কাছেও অশেষ ঋণী।

ভূমিকা আব দীর্ঘতর করলে পাঠকেব প্রতি অবিচার কবা হবে। এবারে তাব কথা তাঁরই ভাষাই বলা যাক্ - " অনেকে আমাকে প্রশংসা করেন, পছন্দ করেন, কিন্তু ভালবাসতে পারেন না। বুঝেছি এব পিছনে কারণ ছিল--- প্রচার ছিল। নিতান্তই যারা ভালবাসেন, তাঁরা কাঁদলেন, আমার জীবনসঞ্চয় মধ্যে তাঁবা চোখের জল রেখে গেলেন। ওদের বন্ধন ছিন্ন করার সাধ্য আমার হয়নি। ...... ক্রমাগত স্রোতে ভাসা মানুষ আমি, অনেক দিন পর আমার ঘুম আসছে।"

—বিকচ চৌধুরী

২৫ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ইং

৪/৪১, কুঞ্জবন টাউনশিপ,

কুঞ্জবন, আগরতলা।

প্রারম্ভ

তখনকার দিনের ত্রিপুরা রাজ অন্তঃপুরের পরিবেশে অনুকরণ প্রিয় শিশুদের খেলায় অতীত ত্রিপুরার উৎসবাদি ও বহুবিষয়, যা অন্তঃপুর সীমায় পর্দার আড়ালে ছিল, তা একজন রাজকন্যার খেলাঘর অবলম্বন করে, তাঁর জীবনধারায় প্রবাহিত হয়ে লিপিবদ্ধ হওয়াতে এই পুস্তকের নাম খেলাঘর। খেলার পর খেলা আর তারই মধ্যে বয়ে চলেছিল তাঁর জীবনধারা হাসি, গান আর নৃত্যের তালে তালে।

অতীত ত্রিপুরায় বহু উৎসব ছিল, যথা — বৈশাখী মেলা, বসন্ত উৎসব, দুর্গোৎসব, কেরপূজা বন্ধন, দেওয়ালী, কার্ত্তিকপূজা, মহারাস, বসন্তরাস, দোলপূর্ণিমা ইত্যাদি। শারদীয় বিজয়োৎসবে সারা আশ্বিনমাসে সানাই বাজত, ওস্তাদরা আসতেন, আসতেন সিদ্ধেশ্বরী আখতরী বাই প্রসিদ্ধা গায়িকারা। আসতেন প্রতিবছরই এনায়েত খান, অলকনন্দা তাঁরা নাচতেন কথক নৃত্য। যাত্রা, নাটক, ঢপকীর্ত্তন হতো। ফাল্গুন মাসে ঘরে ঘরে বাজত বাঁশী, এসরাজ। হোলীর জন্য হারমোনিয়ামে গান রেওয়াজ হতো। রাজ অন্তঃপুরেও নাটক হোলী গানের রিহার্সেল হতো। মহারাসের জন্য মণ্ডপ তৈরী হতো, খুপায়সৈ করতাল, মন্দিরা নৃত্য হতো মৃদঙ্গ বাজনার সাথে।

ত্রিপুরাতে মণিপুরী, বাঙ্গালী, নেপালী, ত্রিপুরী বহু জাতির মিলনে একটা নিজস্ব শিক্ষা, কৃষ্টি ও দক্ষতা গড়ে উঠেছিল — বিশেষত রাজধানী আগরতলায়। জাতি ধর্ম ভিন্ন হলেও বিদ্বেষ ছিলনা।

খেলাঘরে অন্তপুরীকাদের সাজপোযাক অলঙ্কার ও ধাইমা, দুয়ারিদের বেশভুষা বর্ণনা হয়েছে; তাঁরা কে কী কাজ করত, তাঁদের কর্তব্য কি ছিল— তা বিশেষভাবে লেখা হয়েছে। বহু জাতির মিশ্রণ ফলে ভাষা, খাদ্য রুচি, উল্লেখযোগ্য ছিল। বনভোজনে তা সময়ে সময়ে পরিবেশনে দেখা যায় কিন্তু এ পুস্তকে তা বাদ পড়েছে।

মহারাসে— মাণ্ডপ সেজে উঠে বিশেষভাবে, এর বর্ণনা খেলাঘরে আছে।

সেই রাজকন্যা, যাঁর মনের গতি ও শিক্ষা সংস্কৃতি, তাঁর জীবনপ্রবাহে ঘটনার সাথে জড়িত হয়ে কালের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেল। একে একে সব শেষ হয়ে ত্রিপুরার পট পরিবর্তন হয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, ভ্রাম্যমান জীবনপথে যেতে যেতে, যখন যা পেয়েছেন তাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর কবিতা পুস্তকের নাম ছিল কল্লোল, ওতে কলহ, কোলাহল থাকায়, উক্ত পুস্তক হতে তিন চারটা কবিতা খেলাঘরে রাখা হয়েছে। যে খাতায় নির্দ্দেশসহ নৃত্য পরিকল্পনা হয়েছে, ওটার নাম শিঞ্জন। সঙ্গীত পুস্তকের নাম— কুহরণ। তা থেকে তিন চারটা গান এই পুস্তকে আছে। নৃত্য পরিকল্পনা দু'চারটা আছে।

আজ পর্য্যন্ত তাঁর কোন পুস্তক ছাপার হরফে প্রকাশ পায়নি। ত্রিপুরার বিষয়-আসয় নিয়ে একখানা পুস্তক লিখেছিলেন ঐ পুস্তকের নাম ছিল - ত্রিপুরার গতকথা ও অন্তপুর স্মৃতি। তা ছাপাতে দেওয়া হয়েছিল, কোন কারণবশতঃ তা চাপা থাকল, জানিনা। এই পুস্তকে ছয়টি পরিচ্ছেদ আছে, শেষ একটা পাতা— সুপ্তসিন্ধু ; এখানে লেখা স্থগিত করা হয়েছে।

সে জন্মগ্রহণ করেছিল ১৯১৫ ইং সনে। তার পোষাকী নামের আড়ালে মিষ্টি একটা নাম ছিল, সেই প্রিয় নাম আমি ভুলতে পারিনি। অন্ধকার রাতের ছোট তারার মত ঐ নামটা জ্বলজ্বল করে।

সে একা একা পুতুল নিয়ে খেলত বলে——তার পালিকা ধাইমা তাকে ধুনুমুনু ডাকতেন। ভাইদের মধ্যে সেই একটিমাত্র মেয়ে ধুনুমুনু। তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ছিল রেশমের মত, তা কপালে পড়ে থাকত, বড় দুয়ারী তাকে ডাকতেন ঝাপুলী। পিসীমারা তাকেই তাঁদের ছোটবেলার সম্পত্তির অধিকারিনী করেছিলেন। পিসীমাদের অত্যধিক আদর ভালবাসার জন্যই বোধহয়, ধুনুমুনু অত্যন্ত অভিমানী হয়ে উঠেছিল, রোখা জেদ ছিল ; যার ফলে—সময়ে সময়ে খেলাঘরে প্রলয় ঘটতে দেখা যায়। তার পুতুল রাজ্যে - রাজা-রাণী, পুত্র-কন্যা, উজীর-নাজীর, মন্ত্রী, লোকলস্কর সবই ছিল, তারা রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী খেলাড়ীদের প্রাণ প্রাচুর্যে পরিচালিত হতো।

পুতুল রাজ্যে যদিও চাঁদ সূর্য্যের অদলবদল ছিলনা, ঘড়ির কাঁটাও ঠিকই চলে কিন্তু খেলাঘরে ওদের একটা বছর খুব তাড়াতাড়ি পূর্ণ হয়ে যেতো। পুতুল রাজ্যে বহু জাতি ভাষা মিশ্রন শোনা যায়। সময় প্রবাহিত হয় স্রোতের মত, খেলার পর খেলা চলতে থাকে।

তখনকার অনুকরণে, প্রথমে মালি এসে ঘন্টায় আঘাত করে, কলরবে খেলা আরম্ভ হয়ে যায়। একটি মেয়ে পুতুলদুয়ারীকে নিয়ে দরজা খোলে, জিজ্ঞাসা করে - কি কি এনেছ?

'মালি পুতুল হাতে' আর একটি মেয়ে ডালা নামিয়ে বলে - ফুলকপি, বেগুন, টমেটো, করুল, ঝিঙা, ঢেড়স, সিম, ...ওমা, একি! বার মাসের সব্জী এনেছ যে। পান সুপারি আননি? মালি পুতুলধারিনী বলে, আমি তা আনব কেন ? ওতো বাজার সরকার আনবে। দুয়ারী ডাকেন, ও পঞ্চলক্ষী— বাগানের সবজী এসেছে, দেখাও মাইদেবতাকে 'মাতা মহারাণীকে'। পঞ্চলক্ষী নামধারিনী পুতুল নিয়ে আর একজন এসে সব্জী নিয়ে যায়। পঞ্চলক্ষীর সাজ- ত্রিপুরী মেয়েদের মত ; হাতের কব্জীতে ছিল চওড়া বাউটী, নাকে ছিল কলি (নাকফুল) বালি (নাকের গহনা) কানে ছিল তয়া, তাখুম। গলায় টাকার মালা, খোঁপায় ছিল গাঁদা ফুল ; বুকে বাঁধা হয়েছিল রিয়া, খাটো করে পরা - হাতে বোনা পাসবা। বিজলী দুয়ারীর সাজ ছিল অন্তপুরীকাদের মত, তিনবের দুবরা পরেছিলেন ভাঁজ দিয়ে দিয়ে ; খাটো হাতা ব্লাউজ, চাদর গায়ে ছিল। কোমরে ঝুলান ছিল একগুচ্ছ চাবি। প্রতিদিন সকালে তিনিই অন্তপুরের দরজা খোলেন। ছোট ছেলেমেয়েরাই মালি দুয়ারী পঞ্চলক্ষী হয়ে অভিনয় মত কাজ করছে, এভাবেই রাণী ও সব্জী দেখেন, রাণী বলেন— রাঁধুনীকে ডাক। মনিপুরী মেয়ের বেশে রাঁধুনী আসেন। তার নাম - লৈপাকলৈ, কি চমৎকার নাম, 'মাটির ফুল'। ধুনুমুনু নাম শুনে খুশী হয়, ঐ লৈপাকলৈ পুতুল ধারিণীকে দেখে একটু হেসে, রাণী পুতুল বলেন— আজ কি কি পাক হবে? রাঁধুনী ঃ করুল পীঠালি, মাছ ঝোল, ইরম্বা— আরে, হয়েছে হয়েছে, আর বলতে হবে, না রাণী বলেন। রোজ রোজ ইরম্বা কেন? সিঞ্জু জাননা? আলু আচার কর, মাংস ভাজা কর, বলতেই রাধুনী বলে— মাইদেবতা, ওসবত আমরা ছুঁইনা, নেপালী ব্রাহ্মনী, বজেরা করেন। এরপর আসেন নেপালী ধাইমা, তাঁকে দেখে সবাই খুসী হয়। তিনি পাঁচিশ হাত লম্বা শাড়ী কুচিয়ে পরেছিলেন ; এমন

না হলে কি 'ফরিয়া' হয় ? ' (নেপালীরা শাড়ীকে ফরিয়া বলে) ঐ ফরিয়া সামাল দিতে পাঁচ হাত লম্বা পটুকা (কমরপেট্টি) জড়িয়েছেন। লম্বা হাতা চোল (জামা) সরু, কুচান চাদর কাঁধের দুদিকে ফেলা হয়েছে। গলায় ছিল সোনার তিলরী, তা পুঁতিমালায় গাঁথা, অনেক গুচ্ছে। কেমন চমৎকার বিনুনী, লাল সূতার ঝালর ওতে ঝুলছে। ধাইমা রাঁধুনীকে বলেন— সকাল সকাল জলখাবার আন, ছেলেমেয়েরা এল বলে ; আটটা বাজে যে।

ধাইমা নালিশ করেন, হজুর— সান কুমারীত স্কুল জান মানদৈন, (স্কুল যেতে চায়না)

রাণী বলেন- তেরো নানী (তোর খুকী) ফফায় ফুলাই লিয়ের যা (বুঝিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যা)।

জলখাবার এল, ঝি ললিতা নিয়ে এলেন। তার বেশ বাঙালী মেয়ের মত, সেমিজের উপর শাড়ী পরা হয়েছিল। মাথায় আঁচল ছিল, কপালে ছিল সিঁদুরফোটা, চুড়ী শঙ্খ বালা পরেছিলেন। খেলাড়ীরা নিজ নিজ পুতুলদের পীঠে বাঁধা বই, ফ্রক পেন্ট পরিয়ে এনে ছিল, খেতে বসল। তারপর ওদের —ধাইমা নিয়ে গেলেন। মষ্টারমশায় ক্লাসরুমে এসে চেয়ারে বসলেন। বললেন নামতা বল। কলরবে নামতা হয়ে গেল......... চলল পড়ার খেলা কিছু।

হয় সরস্বতী পূজা, কাসর ঘন্টা বাজল । একে একে পর্ব্বের পর পর্ব্ব হতে থাকে। দুর্গাপুজায় বাজল সানাই। কবিগান ও মাতৃপূজা সঙ্গীতে পুতুল রাজ্য উৎসবময় হল । পুতুলদের সিদ্ধেশ্বরী বাঈ, অখতরীবাঈ, অলকনন্দা, এনায়েৎখাঁ, এদের একটা বড় হলে এনে বসান হল। রাজা এলেন পারিষদ সঙ্গী সাথী নিয়ে। গায়ক- গায়িকা বাদকরা উঠে দাঁড়ালেন, কুর্নিস করলেন। চিকের আড়াল হতে রাণী-মহারানী কুমারীরা ও অন্তপুরীকারা দেখছেন, শুনছেন গান-নাচ। সিদ্ধেশ্বরী গাইলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, অখতরী গাইলেন গজল, এনায়েত বাজালেন সেতার ; খেলাট্বা বেশ জমে উঠেছিল। সানাই বেজেছিল। মুন্নাখাই বাজিয়েছিলেন রেকর্ডে । পুতুল ধারিণীরা হাবভাব করে গাইছিল, বাজিয়েছিল ; একটু অসুবিধা হল অলকনন্দাকে নিয়ে। কত্থক নাচ হয বটে কিন্তু মুশকিল হয়, পা ঠিকমত পড়ছেনা ; তা দেখে সবাই হেসে উঠে। অলকনন্দার মেজাজ বিগড়ে গেল, সে ঘুঙুর খুলে তবলচির দিকে ছুঁড়েছিল । ঝগড়ার উপক্রম হয়। ধুনুমুনু বলে ও কি, ও কি, মারামারি করবি নাকি ! খেলা নষ্ট হবে যে। ওরা হাসবে কেন ? দাও, আমার পুতুল। আমি তোমার রাজ্যে থাকব না। অলকনন্দা পুতুলধারিণী চলে গেলে আর এক খেলা ঘরে। আজ অলকনন্দার জন্য খেলা তেমন জমল না; মাঝে মাঝে ওরকম হয়।

এখন হবে দুর্গাপুজা। সবাই মহাব্যস্ত । দুর্গার কাঠাম সাজান হল। হল আরতী, চক্ষুদান ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা হল। বাজল ব্যাণ্ড ; রাস্তার ধারে সারি দিয়ে মেলা বসল। পাঁঠা বলি, মোষ বলি হল, দুর্গামণ্ডপে রাজাসন, তলওয়ার থাকে, শিবস্ত্রান থাকে, ওতে ধান দুর্ব্বা আশীর্ব্বাদি দেওয়া হল। এখন শোভাযাত্রা হবে, সবার আগে রাখা হল গুরুবাড়ীর দুর্গা, এরপর রাজ্যের দুর্গা, রাজপরিবার ও সর্ব্বজনীন দুর্গামূর্ত্তি সারি দিয়ে চলল....., দশমীঘাটে আরতী হয় উলুধ্বনী হয় ব্যাণ্ড বাজে । একশত এক, বন্দুক ফায়ার করে সেলামী দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিগুলো ফেলে দেওয়া হয়। তারপর সবমূর্ত্তি হাতী দিয়ে মাড়িয়ে দেওয়া হয়। সতিকার হাতী, দশমীঘাট, কোথায় পাবে ওরা, পুকুরে ফেলে বড় বড় পাথর দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। ভগ্ন মূর্ত্তি নাকি

দেখতে নেই, মাটির মূর্তি মাটিতে মিশে গেল, বিষাদ ব্যথা থাকল স্মৃতিতে। এত সাজসজ্জা এত আয়োজন, থাকল নাত? সবই ক্ষণকালের জন্য চমক দিয়েছিল। দশমীর দিন কারুকার্য্য করা মন্দিরাকৃতি সিংহাসনে বসবেন রাজা, বামুন পুরোহিতরা মন্ত্র আউড়ে ধান দুর্ব্বা দেবেন ওঁ শান্তি বলে। মন্ত্রী, উজীর, নাজীর, রাজপরিবার ও ঠাকুর পরিবার উপস্থিত হবেন, প্রজাদের সমাবেশ হবে। দরবার হলে জ্বলবে সেণ্ডেলিয়ার, রাজপথে সালুকাপড় বিছানো হবে। পান দান, আতর দান, মাল্যচন্দন থাকবে, অভ্যর্থনা হবে সমাগতদের। সব ব্যবস্থা হল, পুতুল রাজা, মন্ত্রী, পারিষদরাও প্রজারা এল, পুরুতরা আশীর্বাদ দিল। আরে— ভুল হল, ভুল হল; কৈ! পরশপদীত হল না, আসন ভোজনও হলনা। ধুনুমুনু বলল - খেলায় এমন দু চারটা ভুল হয়, এখন আবার আগে পিছে করে খেলব নাকি! যা হয়ে গেছে - হয়েই গেছে।

কার্ত্তিক মাসে গান গেয়ে গেয়ে, গরিব মেয়েরা কার্ত্তিক ঠাকুরের সাথে এল। বলল - উঠ, উঠ, কার্ত্তিক ঠাকুর কত নিদ্রা যাও

পশ্চিমেতে কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হইয়াছে........।

সকলে তীর ধনুক নিয়ে সারারাত জাগেন ঐ দিন। এক একটা লাঙ্গিতে চাল ডাল সাজিয়ে সারি দিয়ে রাখা হয়। এর অনুকরণ হল, হল বুড়া বুড়ি পূজা। " বুড়া-বুড়ী মূর্ত্তি গড়ে প্রদক্ষিণ করা হল। বুড়া-বুড়ী যে শিক্ষার সোপান।"

আজকের মত খেলা বিশ্রাম নিল। কাল বসন্ত পঞ্চমী মেলা বসবে; ধুনুমুনু অনেকগুলো কাপড় রাঙাতে বসল; সবাই বসন্ত পঞ্চমীতে বাসন্তি রংয়ের কাপড় পরবে, ফুল চন্দন পরবে, আতর মাখবে। সে কাপড়ে রং দিয়ে আতর মেখে রাখে। আজকে তার অনেক কাজ, এখনি সব গুছিয়ে রাখতে হবে যে।

সে আপন মনে তার সম্পত্তির বাক্স খুলে দেখল কত কিছু জমিয়ে ছিল। বেছে বেছে, আলাগা করে রাখল সে। ওতে ছিল সোলার একটা টিয়া পাখী, শিকল দেওয়া পায়ে। ধনুকের মত বাঁকানো বাঁশের খোলা পিঞ্জরায় বসেছিল; দানা রাখার জন্য ঐ পিঞ্জরার দুদিকে বাঁশের চৌখ-বাটির মত রাখা ছিল। ধুনুমুনু কিছুক্ষণ পাখীটার দিকে চেয়ে থাকল, তারপর সে - ফুল দিয়ে পিঞ্জরা সাজাল, তখন সে বুঝল না এ ফুল সাঝ বৃথা। যখন বুঝল - পাখীর পায়ের শেকল খুলে দিয়েছিল কি?

আজ বসন্ত পঞ্চমী, মেলা বসবে। ধুনুমুনুর খেলার সাথীরা সবাই এল, অলকনন্দা ও এসেছে। ধুনুমুনু বলল - ঐ যে, ঐ ঝুলাতে দেখ, ওতে সব আছে। নারকলের আংটী মালা দিয়ে তৈরী, নরুন দিয়ে ডিজাইন করা, কি চমৎকার পালিশ, কুচকুচে। লকেট দুলও হয়েছে। মালা দিয়ে গ্লাস, বাটি, ফুলদান, তা ধুনুমুনু তৈরী করিয়েছে। (প্রশংসা সে পেয়েছিল) ফুলের মালা, ফুলের পাখা, অলঙ্কার, বসন্তপঞ্চমী মেলায় এসবের প্রতিযোগিতা হত। কাগজে তৈরী কৃত্রিম ফুল বেরুল ঝোলা হতে, বেরুল- মাটির হাতী ঘোড়া। সোলার প্রজাপতি সোলার টিয়া - ও ওতে ছিল। কাঁথার মত সেলাই করা সুজনী, পদ্মঝালর মশারীর জন্য, যা অভিজাতেরা ব্যবহার করত, তা তৈরী করতে পারা যায়নি, এত ধৈর্য্য কৈ। যেন তেন প্রকারে মেলা সেজে উঠল। 'ত্রিপুরাতে ফুলের সাজ, পাখা, মালা, খুব সুন্দর হতো' প্রাণ গোপাল গোস্বামী যে বছর

ত্রিপুরায় প্রথম আসেন ঐ বছর সাতদিন ভাগবত পাঠ হয়। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে - ভাগবৎ পাঠ হয়েছিল। তখন ফুলের মালা যে কত ধরণে হল. ফুলের পাখার কারুকার্য্য ফুল দিয়ে হয়েছিল। ধুনমুনু বোধ হয় সে সবই দেখেছিল। বসন্ত পঞ্চমীতে. পুষ্পরথে ফুলের প্রতিযোগিতা হতো. মেলা হত, খেলাঘরে ও হল। মাটির পুতুলও বাদ পড়ে না।

এরপর হয় - হোলী উৎসব ; সুরে বেসুরে বাজল তাদের হারমোনিয়াম, ঢোলক বাজল- তালে- বেতালে। কুমকুম ছড়াছড়ি হল। এখন গানের আসর বসবে। 'রাজা রাণী' পুতুলকে সুজনী ঢাকা উঁচু আসনে বসান হল। সঙ্গীত প্রতিযোগিনীরা বসল ফরাসে। গাওয়া হল - যে সব গান তারা জানে।

বসন্ত আগত ভৈ আজ সখিরি.
বরণ কোমল দল কুসুম বিকাশে.
অতি মনোহর কোয়েলা বোলে।
চলত পবন শীতল,
মধুকর দল গুঞ্জত
ত্রিপুরনাথ নিরখত,
ফাগুন দিন প্যারী।।

ঢোল বাজল পুরাদমে আবীর খেলায় হুড়োহুড়ি হয়। কে জিতল, কে হারল. এ নিয়ে কিছু ঝগড়াও হল।

আজ সারাদিনের খেলায় ছেলেমেয়েরা ক্লান্ত ; এই পর্য্যন্তই খেলা হয়।

ত্রিপুরার বৈশাখীমেলা

'আরম্ভ হল বৈশাখী মেলা' খুবই জাঁকজমকে মেলা জমে উঠেছে। জুড়ী-গাড়ীতে আসছেন অন্তপুরিকারা, রেজদি কোচম্যান- ঘোড়া হাঁকাচ্ছে, গাড়ীর পেছনে সহিস দুজন দাঁড়িয়ে আছে। মোটর কারে রাজা এলেন ; সারি দিয়ে অনেকগুলো কার এল, রাণী, মহারাণী, রাজকন্যারা, কুমারীরা ও এসেছেন। ছোটবড় অনেকে - কেউ সাইকেলে, কেউ হেঁটে এসেছে। পাহাড় অঞ্চল হতে বাসে করে যাতায়াত হচ্ছে। অলিগলি রাস্তার দুধারে পানের দোকান, পানীয় সরবৎ' ঘোলের সরবৎ, লেমোনেড বিক্রি হচ্ছে। অনেক দূর হতে শোনা যাচ্ছে ত্রিপুরার প্রফুল্ল সেনের স্বর। ত্রিপুরার গঙ্গাপ্রসাদ - (রাজপণ্ডিত রেবতীমোহন কাব্যতীর্থের পুত্র), ত্রিপুরার প্রফুল্লসেন ; দুইজন মানুষ - সকলের অন্তরঙ্গ, খুবই পরিচিত ছিলেন। ছেলেমেয়েরা প্রফুল্লসেনের ম্যাজিক, প্রফুল্লসেনের সরবৎ, প্রফুল্লসেনের নাটক, প্রফুল্লসেনের অঙ্কনকার্য্য অবাক হয়ে দেখত। তাঁরা এঁর নকল করে দোকান সাজায়, হাক দেয় সরবৎ- ঘোলের সরবৎ। বৈশাখী মেলা জমে

উঠেছে। বড় রাস্তার উপরে দোকানগুলোর সামনে ভীড় জমেছে। মনোহারি মালপত্র এসেছে কুমিল্লা কলিকাতা ব্রাহ্মনবাড়িয়া ঢাকা হতে। ফেরিওয়ালাদের হাঁক শোনা যায়। ডুগডুগি বাঁশী, বাজছে....। ছেলেমেয়েরা এর নকল করে হাঁক দেয়। বেচাকেনার অনুকরণ হতে থাকে। যে বেচে - সে সস্তাদামে মূল্যবান বস্তু কিনতে গেলে - মানবে কেন? যে কেনে- ,সে, রংচঙে কাগজ মোড়ান সস্তাবস্তু বেশী দামে নেবে কেন?

নিজেদের তৈরী মালে- নিজেরাই ঠকছে, ঠকাচ্ছে, সত্যমিথ্যা বলছে, পুতুল রাজ্যেও সেই রকম দামদর হতে থাকে। একজন মেয়ে বলল - ওটা সতিকার সোনার হার নাকি? এত দাম দিয়ে নেব কেন? দাম কমাও।

তোর টাকাগুলো কি সতিকার? কাগজ বৈত নয়?

কাগজ কেটে কেটে দশটাকা বানিয়েছিস। সোনার টাকা দিয়ে সোনার জিনিস কিনগে যা; আমার দোকানে আসতে হবে না। আমি তো তবু ঝকঝকে সুন্দর হার তৈরী করেছি। তোর টাকাটা কি ময়লা দেখ্।

ওদের খেলায় মাঝে মাঝে, সত্যি সত্যি ঝগড়া হয়, কিন্তু সত্য হোক, মিথ্যাই হোক্, খেলাতে বেচাকেনাত হবেই। ওদের একজন বলে, নে, পরিষ্কার টাকা, দে ঐ সেন্টটা। আর দে- পাউডার নেলপলিস, লিপস্টিক। তা নে, তোর ঐ মিথ্যে কালো টাকা দিয়ে চাল ডাল কিনতে যাসনে। মিথ্যে টাকা দিয়ে মিথ্যে বস্তু কিন্।

ধুনুমুনু বলে - সতিকার টাকায় এ ফুলটা নিবি? এ কিন্তু সতিকার ফুল, ছুঁয়ে দেখ।

'কেন নেব, ওটা কালকেইত ঝরে যাবে।'

'তবে - এই কাগজের ফুল নে, ওটা ঝরবে না।'

এটা নকল, এটা সত্যিকার, কোনটা নিবি নে না।

মিছি মিছি ঝগড়া করে থাকবি নাকি ?

কোনটা কিনবে ভাবনায় পড়ল ওরা। বেচা-কেনা খেলা কিছুক্ষণের জন্য থামল। কেমন যেন হেঁয়ালীমত প্রশ্ন থাকছে, ওরা মন ঠিক করতে পারে না। তা বলে ওদের খেলা বন্ধ থাকে নি, দিনের পরদিন -খেলা চলল ...., কত রকম খেলায় মেতে থাকল ধুনুমুনু ।

মা বলেন-—, তুই তো সারাদিন পুতুল নিয়ে থাকিস, স্বাস্থ্য থাকবে কি করে ? যা না, তোব দিদিদের সাথে দৌড়াদৌড়ি করে খেল।

'ও আমার ভাল লাগে না।'

'তা হলে নাচগান কর, মহারাস নৃত্য শেখ। ওরা কেমন গায় , নাচে; বসন্তরাসে কি সুন্দর দেখায় তোর দিদিদের। সাজতেও তোর ইচ্ছে করে না?'

'তুমি তো পুতুল ছাড়া কিছুই জান না।'

ধুনু ঝেঁজে উঠে বলে- ' ওরা আমর মত কাজ করতে পারে?

দেখ, আমি কত কাজ করি, এমনি বসে থাকি নাকি?'

ধুনুমুনু মাকে দেখায় এক একটি করে তার সব কাজ।

মা- ঐ সব দেখে অবাক হন। বলেন- এসব তুমি করেছ!

এই ফ্রক, এই শাল, বেডকভার, সোয়েটার, এসব শিখলে কার কাছে? কেন, পিসীমারা বুনে না নাকি?

কিন্তু একি করলে? পড়ার বইগুলো নষ্ট করলে কেন ?

ধুনু বলে - আমি নূতন বই বানাচ্ছি যে। আমার ছেলেমেয়েরা পড়বে। এই দেখ - মহাভারত, রামায়ণ, আরো কত বই। মা বিরক্ত হয়ে বলেন - উপরের নামটাই আছে? না- ভেতরেও কিছু আছে?

আমি নাম দেখে দেখে লিখেছি; ভেতরে কিছু না হলেও চলে। মলাট সুন্দর হলেই হল।

" তাই নাকি, আন দেখি তোমার বইগুলো?

অনেক বইয়ের কতকগুলো পাতা জড়ো করে মলাট বাঁধন হয়েছিল - লাল-নীল-সবুজ কাগজে। উপরে লেখা, কোনটায় মহাভারত, কোনটায় রামায়ণ, গীতা ইত্যাদি।

মা বই খুলে পড়লেন - 'গীতাতে' পাখী সব করে রব...........।

রামায়ণে — বদর বদর বলে, পাল তুলে সবে মিলে..............।

মহাভারতে - রাখাল বড় দুষ্ট ছেলে........... .।

ধুনুমুনুর কাণ্ড দেখে - মা'র বোধ হয় হাসি্ই পাচ্ছিল কিন্তু গম্ভীর হয়ে বললেন- কাল থেকে তোকে গান শেখাব, তুমি রাধাকৃষ্ণ ঝুলনে গাইবে। শুধু পুতুল নিয়ে থাকলে চলবে না।

তারপর একদিন নাটক হল। প্রিয়তম কৃষ্ণ বাঁশী বাজালেন। নাচের ভঙ্গিমায় গোপিনীরা এলেন, ধুনু ও তাদের সাথে এল কিন্তু রাস আরম্ভ না হতেই রসভঙ্গ হয়ে গেল। রাধার স্বর হারমোনিয়ামে মিলছিল না। সা থেকে বাজালে রাধা গায় মা থেকে (তিন পরদা আগে)। ধুনুমুনুর যে- মাই একমাত্র ভরসা। অসহায় ভাবে সে তার মার দিকে তাকায়। ইতিমধ্যে কৃষ্ণবেশ ধারিণী দিদিটি ধুনুকে সরিয়ে দিয়ে, নিজেই রাধার গান গাইল, " চুরি করে কেন মন নিলে"। ধুনুমুনু অবাক হয়ে কৃষ্ণের কাণ্ড দেখে, 'রাধাকে বাদ দিয়ে' একাই ঝুলনায় ঝুললেন ; প্রিয় সখি ললিতা, বিশাখা, বৃন্দা, কারুর কথাই শুনলেন না, রাধাকে গ্রাহ্য করলেন না। তা দেখে রাধা মাকে অনুযোগ করে বলে- আমি ত আগেই বলেছি পারব না। কেন আমাকে দিয়ে নাটক করালে। ধুনুমুনু দর্শকদের সামনে- মাথার মুকুট, পায়ের ঘুঙ্গুর খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুক্তমালা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

কৃষ্ণ ঝুলতে ঝুলতে মজা দেখেন ; রাধা অভিমান করলেও মান ভঞ্জন করা হল না। রাধা কাঁদেন, কৃষ্ণ হাসেন, পিসীমা এসে রাধাকে কোলে তুলে নিলেন দেখে - দর্শকদের একজন ঠাট্টা করে বলে - যশোদারাণী রাধাকে কোলে নিলেন দেখ, (হাসির শব্দ উঠেছিল) তা কানে না নিয়ে পিসীমা ধনুকে বোঝান, তুমি সবচেয়ে ভাল গাইতে পারবে। তোমার সাথে পরদা মিলিয়ে বাজালেইত হতো। এবার থেকে আমি বাজাব, তুমি গাইবে, কেমন?

ধুনুমুনু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে - ' না',। এই 'না' যে কি, তা- মা মাসী, পিসী, সবাই জানত। পিসীমা বলেন - চল, চল, লক্ষ্মী। ধুনুমুনু চলে গেল রঙ্গমঞ্চ হতে।

'পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাগুলোর পর হতে' ধুনুমুনু রেওয়াজ করে, পুতুল নিয়ে নাটক করায় (আর এক খেলায় মেতে গেল সে)। পিসীমা তাকে একটা হারমোনিয়াম দিয়েছিলেন : ছোট্ট পুতুল রাজ্যে সেটা বেমানান হয়ে - বড় একটা অংশ দখল করেছিল। ধুনুমুনু তা বাজাতে বসে, নাটকে নির্দ্দেশিকা হয়- পিসীমাদের মত, রিহার্সেল কিছুদিন চলল।

আজ খেলাঘরে নাটক হবে, রবিবারের পাঁচালী মুখস্থ ছিল, ওটাই নাটকে রূপায়িত হয়। সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হল; মাসীমা, পিসীমারা, আরো অনেকেই এসেছিলেন। রাজারাণী পুতুলসহ অনেক পুতুল বসল নাটক দেখতে, এরাও আজ মূক-দর্শক। অভিনয় করবে ধুনুমুনু ও তার সাথীরা। প্রথমে প্রস্তাবনা গাওয়া হল, বাজল হারমোনিয়াম।

সমবেত সঙ্গীত - জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ..... । আরম্ভ হল নাটক; পাঁচালীর কথিকা অনুযায়ী। সদাগর যাবেন বাণিজ্য করতে, পত্নীকে বলে গেলেন - কন্যাকে যত্নে রাখ। বাবা চলে গেলে বড় কন্যাকে পাঠালেন সদাগর গৃহিনী - ছাগল চরাতে। বড়কন্যার ছোট বেলায় তার মা মারা গিয়েছিল। সৎমা তাকে ভালবাসত না। বনে বনে বড়কন্যা ছাগল চরায়, একদিন তার ছাগলটা হারিয়ে যায়, খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সে গাছের নীচে শুয়ে পড়ে, ধুনুমুনু র সরল অভিনয় দেখে অনেকে চেয়ে আছেন। মা মঙ্গলচণ্ডী স্বপ্নে এসে বলেন- বড়কন্যা ! উঠ, ঘট স্থাপন করে আমার পূজা কর, সব দুঃখ দূর হবে।

বড়কন্যার ঘুম ভাঙ্গতেই সে মানস পূজা করল - মাটি দিয়ে ঘট তৈরী করে। ছাগল ফিরে পেল, বাড়ী আসতেই মা তাকে বকল, হাঁড়িতে যা আছে খেতে দিল। ছেঁড়া কাপড় দিল পরতে। সদাগর ফিরে এলেন, কন্যার মলিন বেশ রোগা শরীর দেখে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার এমন অবস্থা হল কেন ? সে বাবাকে তার দুঃখের কথা, মা মঙ্গলচণ্ডীর কথা বলল। প্রতি রবিবার সে পাঠ করে- " নমঃ নিত্য মঙ্গলচণ্ডী নমঃ নারায়ণী, আদি অনাদি মাগো- শিব সনাতনী। তোমার মহিমা গুণ আমি নাহি জানি, পতিত পবনী মাগো জগত জননী"। নাটক শেষ হল. সকলে প্রশংসা করলেন।

" চমৎকার হয়েছে" বললেন মাসী; তাঁর প্রাণের খুব কাছে ধুনুমুনু ছিল। (মাসীর মেয়ে মারা যাওয়ার পর- ধুনুমুনুকে কোলে পেয়েছিলেন তিনি) মাসী বললেন- তোমার মেসোকে দেখাও (নাটক) খুসী হবেন।

পুতুলগুলোকে বসন্তরাস শেখাও, নাচতে পারবে।

পিসীমা বলেন- " ওসবই জানে, গাইতে পারে, নাচতে পারে, কত সুন্দর- আমার ধুনু"। একজন বলেন - তা বৈকি, কিন্তু - জয়ন্তীমঙ্গলা কখন স্বমূর্ত্তি ধরবেন ঠিক নেই। দেখতে কত শান্ত!!

নাটক শেষ হল, এখন বনভোজন হবে। ধুনুমুনু সবজী কুটতে বসেছে। মা বললেন- তোকে পড়তে হবে, খেলাধূলা করতে হবে। ধুনুমুনু হেসে হেসে বলে - এইত, রোজই খেলছি, কেন যে তুমি আমার খেলা দেখনা।

তোর খেলা যে বাপু গুরুগম্ভীর।

কেন ? সেদিন কত হাসলাম কত কাঁদলাম ! - কাঁদতে -তোকে কে বলেছে ?

-রাণীর মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে, তা আমি কাঁদব না?

-খেলায় কেউ তোমার মত কাঁদে না। খেলাঘরে কত রাজা যায়, কত রাজা আসে; রাজকন্যা গেলে - আর একটা রাজকন্যা আসবে এমন করে কেউ সত্যি সত্যি কাঁদে নাকি?

- ওরা যে সত্যি সত্যি নিয়ে গেল আমার পুতুল কন্যাকে।

না বাপু, ওসব কান্নাকাটি খেলা হবে না। পুতুল খেলা- বন্ধ কর, লেখাপড়ায় মন দাও।

সেদিন ব্যাপারটা হয়েছিল পুতুল নিয়ে, এরপর হল কনে বিদায়।

পুতুল রাজ্যে ভাল খেলোয়াড়দের পুতুল কন্যার খুবই সম্মান আদর দেখা যায়। বিয়েতে অনেক যৌতুক দেওয়া হয়। সুন্দর মেয়ে, কৌতুক লোভে, পুতুলবাজ্যে অনেকেই কন্যাগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। অনেক স্থান হতে বিয়ের প্রস্তাব আসে, কিন্তু মন না মিললে, (খেলুযাড়দের ভাব না হলে) বিয়ে হয় না। ভাব থাকা চাই, তা না হলে বাপের বাড়ী পাঠায় না ; মাঝে মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়ে যেত।

ধুনুমুনু একজন ভাল খেলোয়াড়, তাঁর সুন্দর মেয়ে, সম্পত্তি অনেক। নানা দেশ হতে বিয়ের প্রস্তাব আসে কিন্তু মন মিলে না, কি করা যায়; মহা ভাবনার কথা। সেই কলহকারি কৃষ্ণের ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে? তা হতে পারে না।

একদিন কৃষ্ণ নিজেই এলেন, চেষ্টা করেন ধুনুমুনুর সাথে ভাব করতে; সে বলে - আমি তোর মেয়েকে খুব যত্ন করে রাখব, তুইও আমার সাথে খেলবি। না, হবে না, বলে ধুনুমুনু। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র অবতারনা করে বলেন- কেন হবে না? আমি জোর করে নিলে - তুই কি করবি? বোধ হয় রুক্মিনী হরণ করতে চান। অগত্যা ধুনুমুনু ও যুদ্ধ ঘোষণা করে চণ্ডীকার মত। বলে - নিয়ে যা দেখি?

কৃষ্ণ ঃ ঐ ত শরীর, পারবি আমার সাথে?

ধুনুমুনু কথা না বলে সে তার ঝাঁকড়া চুল সরায়, সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তার চোখ স্থির হয়, ভ্রুকুঞ্চিত হল, শরীর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। ফর্সা গালে সেদিন বোধ হয় রক্তাভা দেখা দিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ভাবেন নাই শ্রীমতীর এমন রূপ দেখবেন। ধুনুমুনু বলে- এস, কি নিতে চাও, এই টি সেট? এই নাও ; সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় (শত চূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে)। এটা নেবে? এই নাও, এই নাও, প্রলয় কাণ্ড শুরু হয়ে গেল ; "কৃষ্ণ" মেয়েটি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। শান্ত আকাশে বৈশাখের ঝড় উঠেছিল সেদিন। ধাইমা তাড়াতাড়ি আসেন, কি হল, কি হল বলে থামাতে চেষ্টা করেন কিন্তু সামনে যাবার উপায় নেই ; পুতুল রাজ্যে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল -ধুনুমুনু। তাই ত বলেছি - খেলাঘরে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয় ; প্রলয় কাণ্ড হয়ে গেল। পিসীমা কৃষ্ণকে আগলে নিলেন, বলেন - ও লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটার সাথে ঝগড়া কর না। আমি তোমাকে সুন্দর রাজকন্যা দেব। দেখলে ত? ও কিছু দেবে না, রাখবে না ; গেল গেল সব গেল, এই ধুনু ! লাগবে যে, কি করছিস? কৃষ্ণ বলে - ছোট মা, ও ছোট মা, শিগগির দেখ ধুনুমুনুর কাণ্ড। ধুনুকে মা এসে থামালেন। ধুনুমুনু বলল, - মার কাছে লাগাতে হবে না ; যা, সব নিয়ে যা ; এক্ষুনি যা।

ছিঃ ধুনু, ও কথা বলতে নেই, ও যে তোর দিদি।

ধুনুমুনু তাই জোর করে নিয়ে যাবে? "কৃষ্ণকে" বলে - পাবলি নিয়ে যেতে? মা ধুনুমুনুকে ঝাঁকুনি দেন, ' চুপ কর বলছি'।

কৃষ্ণ ফুপিয়ে কাঁদে। সে বলে - ছোট মা, আমি আর কক্ষনো আসব না। 'কৃষ্ণকে' কাছে টেনে, মা ওর মুখ মুছিয়ে দেন আঁচলে। কোলে বসিয়ে লজেন্স, খেলনা, কত কি আনিয়ে - দিলেন কৃষ্ণকে ; কোলে বসিয়ে তুষ্ট করলেন। বললেন- তোর ছোটবোনকে আদর করে যা। কৃষ্ণ ধুনুমুনুর হাত ধরে চুমু খায়। বলে- তুমি ত ছোট মেয়ে, আমি তোমার দিদি ; আর কখনো ঝগড়া করব না। এবার ধুনুমুনুর গাল বেয়ে জল পড়ল। অনেক অনেক অভিমান ভর্ত্তি ছিল তার মনে। পিসীমা বলেন, কেঁদ না লক্ষ্মীটি!

কেন এমন করলে? দেখ, তোমার রাজা-রাণীর অবস্থা।

ধাইমা - স্তুপাকার মালপত্র হতে বাজা-রাণীকে উদ্ধার করলেন ;

এতক্ষণ এঁরা বৈভবের মধ্যে চাপা পড়েছিলেন। কৃষ্ণ বসে পড়ে মালপত্র গুছাতে ; ধুনুমুনু কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর সেও করুণা বিগলিত হয়ে ছেলেমেয়েদের ঝেড়ে মুছে রাখে ; মা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেন।

ঝগড়া মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। কন্যার বিয়ে ঠিক হল ফাল্গুনে হবে। বিয়ের লিষ্ট তৈরী হল ; জামাই বরণের জন্য আংটি, শিরপেজ, থেকে আরম্ভ করে কিছুই বাদ নেই।

ধুনুমুনু মহাব্যস্ত। বাঁশের ঝালর ঝাপড়ি দিয়ে বেদী সাজান হয় ; বিবিধ রংয়ের চাঁদোয়া পঁচিশটা খাটিয়েছিল। (যেমন রাজকুমার কুমারীর বিয়েতে রাখা হয়) বেদীর চারদিকে সবুজ পাতাযুক্ত দীর্ঘ বাঁশের খুটিতে চাঁদোয়াগুলো একে একে বাঁধা হল। বাজল সানাই, মেয়েরা জল ভরতে নদীতে যায়। সোনার লাঠি, রূপার লাঠি নিয়ে লাঠিয়ালরা আগে পিছে যায় - আয়াজুব পালকী সাথে। হাওড়া নদীতে আয়াজু জল ভরেন। আযাজু - আয়েস্তা মেয়ে, তাঁর পরণে লাল বেনারসী শাড়ী- চাদর, অলঙ্কারে সেজেগুজে সিন্দুর পরে জল ভরেন। ঐ জলে কনের স্নান হবে। অধিবাস হয় বিকেলে । বরপক্ষ হতে আসে - রিয়া, চাদর, গহনা। পাহাড়ী পুরোহিত লাম্প্রা পূজা করেন হাঁসের ডিম, মদ ইত্যাদি দিয়ে। পরদিন বিয়ে হবে, বর আসবেন হাতী পিঠে হাওদায় বসে। মিছিল চলবে সারি দিয়ে ; লোক লস্কর, আতস বাজি, বাদ্য বাজনা, ব্যাণ্ড বাজবে ; কিছুই বাদ পড়ে না, সবই নিয়ম মাফিক হচ্ছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বরযাত্রী হয়ে পুতুল রাজকুমারের সাথে আসে ; শাঁখ বাজে, জামাই (বর) হাতী হতে নামেন, আয়াজু বরণ করেন বেদী দ্বারে। তারপর পিঁড়িতে করে কনেকে আনা হল।

(বিয়ে হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মাটিতে পা রাখতে নেই বর-কনেকে)

দীর্ঘ পথ সালু কাপড় মোড়ানো ছিল বর কনের সম্মানের জন্য।

বিয়ে পর্ব আরম্ভে, কনে মালঞ্চ ভাঙ্গে, সই কামিনী গাছকে কোলদেয় ; একটা শাখা ভেঙ্গে মালঞ্চ হতে বিদায় নেয়। তারপর হয় শুভদৃষ্টি। বর কনেকে আনা হয়। সালু কাপড় মোড়ানো দুটা ডালায় পদ্মপাপড়ি সাদা কাপড়ে তৈরী হয়, ওতে থাকে রূপোর চাঁদ, সোনার - সূর্য্য। ঐ সাজানো ডালা দিয়ে আড়াল করে কনেকে আনা হয়। বর-কনের পিঁড়ি মুখোমুখি করে উঁচু

করে পিঁড়ি ধরে বলা হয় - দুজনে দুজনকে দেখ ; শুভদৃষ্টি হয়ে গেলে মালাবদল, ফুল ছিটান হয়, সিন্দুর পরান হয়। এরপর বেদীতে এনে কন্যা সম্প্রদান করার পর - জুয়া-পাশা খেলার জন্য একটা কোঠায় ব্যবস্থা থাকে ; আয়াজু পাশা খেলা সম্পন্ন করেন। কন্যাপক্ষ বরপক্ষরাও বরকনের সাথে খেলার আসরে বসে।

খেলাঘরে ধুনুমুনু কন্যা সম্প্রদান করেছিল, পুতুলকন্যা সাতপাক দিয়ে ফুলছিটা দিয়েছিল। বলেছিল আজ হতে আমার কন্যা তোমার হল। বেদীতে খেলার সাথী সকলে ছিল, মন্ত্র আওড়াল, কি বলল বোঝা গেল না। কৃষ্ণদিদিটি হাসি-খুশী মুখে কন্যা গ্রহণ করেছিল। দুজনে বসেছিল জুয়া-পাশা খেলতে; বিয়ের খেলাতে জুয়া-পাশা খেলাটাই ছিল মজাব।

আয়াজু রাখলেন আলপনা আঁকা একটা হাঁড়ী বরকনের সামনে ; কুলোর উপর ধানেব রাশিতে তা বসান ছিল। ধারাগতভাবে যা হয়ে এসেছে, খেলাতেও তা' ই হল।

বর-কনের হাত সবা দিয়ে চাপা হয়, বলা হয় - এখানে কড়ি আছে, হলুদ আছে, হরতকী আছে, আব একটা আংটী আছে, যে পাবে আংটী, সে জিতবে। " এক, দুই, তিন " বলার সাথে সাথে 'খেলাঘরে' বরকনে পক্ষের মাতব্বর হাঁড়ির ভেতর হাত পুরে যা পায় তা তুলে নিয়ে মুঠি খুলে দেখে - কে জিতেছে ; জয় হল কনের। (বরের হাত সরা দিয়ে চেপে রেখে)। কনেকে কী দেবে বল। বরপক্ষ হতে বলা হয়েছিল সোনার চুড়ি দেব- বর সেবার জন্য। বেশ, বেশ, হাত খুলছি কনে সেবার জন্য। অভিভাবকরা ঐ খেলা দেখে সেদিন হেসেছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন - এ খেলা।

তারপর নিমন্ত্রিতদের জন্য লুচি মাংস আসে, ওটা সত্যি সত্যি খাওয়ান হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা, অভিভাবকরা বেশ আনন্দেই রসগোল্লা, সন্দেশ, লুচি মাংস খেয়েছিলেন। এরজন্যই বিশেষ ঘটা যেন।

যখন কনে বিদায় পালা শুরু হল, কনেপক্ষের সবাই কাঁদল নিয়মমত ; ধুনুমুনুর চোখের জল নিয়ম মানল না, সে সত্যি সত্যি ফুপিয়ে কাঁদে। কনেকে বিদায় দিতে গেল না।

কৃষ্ণদিদিটি তার চোখ মুছে দিয়েছিল, সান্ত্বনা দিয়ে বলে এক সঙ্গেইত খেলব। মা মাসীও বলেন - মেয়ে বিয়ে দিলেত- পরের ঘরে যাবেই। খেলায় কি সত্যি সত্যি কাঁদে নাকি ! নূতন পুতুল দেব বলে - তার মাথায় হাত বুলান কিন্তু ওদের চোখও ছলছলিয়ে উঠেছিল কেন? ধুনুর কান্না দেখে?

মা সেদিনের বিয়ের খেলা মনে করে বলেন - এমন পুতুল খেলা খেল না। ধুনুমুনু মার কথায় রাগ করে তক্ষুনি উঠে পড়ল ; একটা ঝোলায় তার রাজপাট পুরে নিয়ে হনহন করে সে চলে গেল।

মাসী ধুনুমুনুকে আসতে দেখে খুশী হয়, বলেন - সোনামনি এলে? ওটায় কি এনেছ? ধুনু বলে - কি আর হবে, আমার সব তুলে আনলাম। আমি এখানেই খেলব। মাসী হেসে হেসে, মেসোকে বললেন - দেখ, দেখ, ঐ টুকু ঝোলায় রাজা সংসার তুলে এনেছে।

মেসো - বেশ ত, এখানে থাক্, খেলুক।

ধুনুমুনু দরজা জানালার পর্দা খুলে নিয়ে পুতুল রাজ্যের সীমা ঠিক করে ; আবার নূতন করে

সংসারপাতে। পুতুল রাজ্যে তখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান ছিল না। অখণ্ডভাবে রাজ্যের সীমা রাখা হল। প্যালেস কম্পাউণ্ডে ছাড়পত্র নিয়ে আসতে হয়। " হলট্, হু কামস দেয়ার" জন্য একটা পুতুল সঙ্গিন উঁচিয়ে রাখা হল। আর একটা পুতুলকে চেয়ারে বসান হল, এর সামনে অনেকগুলো পুতুল বসে। ধুনুমুনুর খেলা দেখে যাচ্ছেন মেসো, জিজ্ঞাসা করলেন ঐ যে চেয়ারে বসলেন - উনি কে? আর - এরা কারা? ধুনু বলে - পণ্ডিত মশায়, এইগুলো হল ছেলেমেয়ে। পণ্ডিতমশায় পড়াবেন, এরা পড়বে। কিন্তু পণ্ডিত পড়ান না, ছেলেমেয়েগুলোও পড়ে না, তারা বসেই থাকে। তা দেখে মেসো বলেন এরা পড়বে না? না- এমনি বসে থাকবে? গম্ভীরভাবে ধুনুমুনু বলে, তোমাকে ভাবতে হবে - এরা পড়ছে, পণ্ডিত পড়াচ্ছেন।

ঃ তাই না কি, 'মেসোর মুখে হাসি খেলে গেল যেন'।

ঃ তা নয়ত কি। আমি ওদের পড়াব নাকি?

ঃ তা হলে ত ভালই হয়, বলেন মেসো।

ঃ তুমি বলনা মেসো, আমি কি করে পড়াই!

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পণ্ডিত নিয়ে বসব, তুমি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বস।

আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি পড়াও- আমি শুনি। মেসো গীতা নিয়ে আসেন, বলেন - পড়, ধর্ম্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব.........বলতেই ধুনুমুনু অবাক হয়ে বলে, এসব তুমি কি বলছ, ক খ গ না বলে? মেসো বলেন- মহাভারতে কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধ হয়েছিল, তুমি তা জান না? গল্প শুনতে ভালবাস? ধুনুমুনু মাথা হেলিয়ে বলে, খু-ব ভালবাসি। ধাইমা কত গল্প বলে- নেপালের। দুদুমা বলেন- ডাইনী বুড়ীর, সে না কি -গোমতী নদীতে মন্ত্র পড়ে বাঁধ দিয়েছিল। শত্রুরা যখন ত্রিপুরায় এল - বাঁধ ছেড়ে দিল। তারা যে কোথায় ভেসে গেল। যুদ্ধ জিতলেন রাজা, ডাইনীকে অনেক পুরস্কার দিলেন। রাধুনী মা বলেন টিকেন্দ্রজীৎ যুবরাজের কথা।

তোমার মা মাসী কিছু বলেন না?

ওরা ত শুধু বলে—পড়, নাচ, গাও। তাই ত চলেই এলাম।

আমি তোমাকে অনেক গল্প বলব ; রোজ সকালে বিকেলে এসে সন্দেশ খাবে, গল্প শুনবে। জান? বাঁশিওয়ালা কৃষ্ণ পাওয়া যায়? ফেরিওয়ালারা তা বেচে । ও পুতুল কি বলে জান? বলে- আমায় নিবি কি গো- রাখবি ঘরে

আমি ফিরি সবার ঘরে ঘরে, দোরে দোরে।

ধুনুমুনু মেসোর ঐসব কথা বুঝল কি বুঝল না সে'ই জানে, বলল - পুতুল কি কখনো কৃষ্ণ হয়? তা নিয়ে খেলা যায়? কৃষ্ণের সাথে খেলা কেন হবে না? পুতুল রাজারাণী হয় ; কৃষ্ণ যশোদা হলে দোষ কি! মন্দির খেলা খেল। কৃষ্ণ যে তোমার খেলাঘরে আসতে চান।

আমি ত তার কথা জানি না, কি করে খেলা হবে। রবিবারের পাঁচালি পড়ে যেমন খেলেছ, কৃষ্ণকথা পড়ে খেল। রাজা-রাণী, সেত পুরানো খেলা ; নূতন নূতন খেলা খেল। আরো কত খেলা আছে, দেখ না, - তোমার ভাইরা কি খেলা খেলে। মেসোর কথায় ধুনুমুনু চুপি চুপি বলে- জান মেসো? ওরা চুরি করে। দাদা বড় কি সব এনে লুকিয়ে রাখে, ধরা পড়লে না কি

জেল হবে।

মেসো বলেন - তাই নাকি? আর কি করে?

ও আর কি করবে, ওকে দিয়ে নাকি কেউ করায়। তারা স্বরাজ- স্বরাজ বলে।

মেসো বলেন - তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার বুদ্ধি আছে। তোমার এতো বড রাজ্যে হাসপাতাল নাই, লাইব্রেরি নাই, স্কুল নাই, কেন?

তাই ত, ভুলেই গেছি। তুমি দেখেনিও কাল হতে সব হবে। হাসপাতাল, নার্স, ডাক্তার, রোগী সব হবে। ঔষধ রাখব। আমার বইগুলো লাইব্রেরিতে থাকবে। মেসো- নিউমার্কেট হতে তোমার জন্য নার্সের পোষাক, চিকিৎসা সরঞ্জাম সব আনিয়ে দেব।..... ..

খেলাঘরে, রাজপাট উঠে গিয়ে হাসপাতালে পরিণত হয়ে যায়। ডাক্তাররা রোগী দেখেন, নার্সরা শুশ্রূষা করতে থাকেন, কেউ গাছ হতে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙ্গে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়। বোতলে দাগ কেটে জলে গোলা কত রংয়ের ঔষধ রাখা হয়। থারমোমিটার, স্টেথোস্কোপ সবই ব্যবহৃত হচ্ছে। ডাক্তার বলেন, এ ঔষধ দিনে তিনবার খাবে। আর এক রোগীকে বলা হল - এই নাও বড়ি।

রাজরাণী আর নেই, তারা জুড়িয়ে গেলেন; এখন শুধু ডাক্তার, নার্স, রোগী। কর্মব্যস্ত ছেলেমেয়েরা খেলাঘরে ডাক্তার নার্স হয়েছে। রাজা-রাণী, লৈপাকলৈ, ধাইমা দুয়ারী ঐসব পুতুল রুগ্ন হয়ে রোগ শয্যায় আছে। রোগীতে রূপান্তরিত হয়ে পোষাক মাত্র তাদের বদলি হয়।

স্কুলের ক্লাসরুম এখন নীরব থাকে না; প্রভাত পাখীর কলরবের মত মুখর হয়ে উঠেছে। তৃতীয় ভাগ থেকে আরম্ভ করে নূতন নূতন পাঠ শুরু হয়।

এখন পণ্ডিত সেজে ধুনুই পড়ায়। ছেলেমেয়েরাও জুটেছে অনেক; ওদের প্রত্যেকের কোলে এক একটা করে পুতল থাকে। পুতুলের প্রতিনিধি হয়ে খায়, প্রতিনিধি হয়ে পড়ে; এইসব খেলায় বছর তিনেক কেটে গেল। গান গাওয়া ছবি আঁকাও হয়েছিল। আরম্ভ হল - বন্দেমাতরম খেলা, সকলের অজ্ঞাতে প্লট পরিবর্তন হতে থাকল; তারা নিজেরাও জানে না কি হতে কী হচ্ছে। খেলাঘর লাইব্রেরীতে ক্রমে ক্রমে সত্যিকার কাব্য দীপালী রামায়ণ, মহাভারত, সঞ্চিত হয়। ত্রিপুরার রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী তাঁর শোক গাঁথা, কর্নিকা প্রীতি, রাজকুমার বিমলচন্দ্রের লেখা 'গোপবালা', 'মেঘদূত', 'ওমর খৈয়াম', 'বৈষ্ণব পদাবলী' ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে জড়ো হয়। ঐ সব পুস্তকে ছিল ছবি (রংয়ের পরশ লাগল মনে) তুলি রং নিল, আঁকল ছবি ধুনুমুনু; অনুকরণ করে আঁকত। তার জন্য কত নূতন সামগ্রী এসেছিল, তা থেকে রং-তুলি নিয়েছিল সে। একদিন সহসা ছবির নীচে কবিতা লিখেছিল।

> যেন কোন যুগে, এ জনম আগে,
> মোর কুটির আঙ্গিনা পরে
> কতলফুল বাস বহিয়া আসিত
> সে দিনের ঘুমঘোরে।
> অচিন সে জন, তবুও আপন,

ফুলের সৌরভ সম পরাণে পরাণে
রয়েছে গোপন, সে যে কত প্রিয়তম।।
(এটা ছিল তার প্রথম কবিতা)।

ধুনুমুনুর খেলাঘরের কর্মব্যস্ততা ছন্দময় হয়ে উঠেছিল। রাজারাণীর প্রতি তার উদাসীনতা লক্ষ্য করে মা বলেন- " কি রে, তোর রাজারাণীব কি হল ! রাজার রাজবেশ নাই, রাণীর এমন অবস্থা কেন? ধুনু বলে - এ এক নূতন খেলা ; সময় পরিবর্তনের সাথে অবস্থা মাত্র বদলে যায় ; মুনষ্যাকৃতি, পুতুল পুতুলই থাকে। - ধুনুমুনু ধুনুমুনু ওদের ভাগ্য বিধাতা? ধুনুমুনুর ভাগ্য বিধাতা কে?

ধুনুমুনু এখন আর সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই। তার পনের বৎসরের জন্ম উৎসবে তাকে মা মাসী পিসীবা ধান দূর্বা দিলেন। প্রতি বছরই জন্মদিনে গ্রহপূজা হয, দান দেওযা হয। এবাবও প্রচলন মত সবই হল।

ধুনুমুনু এখন আর ফ্রক পরে না। দুবরা চাদর জড়িয়ে বাগান করে ফুল তোলে, মালা গাঁথে, ঠাকুর ঘরের কৃষ্ণকে পরিয়ে দেয়। পুতুলের মত সাজপোষাক পরে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িযে আছেন কিন্তু এ পুতুল নয়, প্রতীক। ধুনুমুনুর ভাগ্যবিধাতা ধুনুকে নিয়ে খেলা করে। পঞ্চপ্রদীপে মন্দির আলোকিত হয়, ভজন পূজন হয়। সারা কার্ত্তিক মাস জাগরণী গান গাওয়া হয। ধুনুমুনুও গায় - জাগহু জাগহু, বৃষভানু দুলালী......, কিন্তু ধুনুমুনুব কৃষ্ণের পাশে রাধা ছিল না। হাতে ছিল বাঁশী, কোমরে ছিল অসি। অনেক পরে রাধা স্থাপন কবা হয়েছিল।

পৌঢ়েলনী বজে নামে একজন ব্রাহ্মণী চণ্ডী পড়াতেন, তাঁব নিকট ধুনুমুনু ঐ পুস্তক পড়েছিল। সেই থেকে সে জানল হিন্দী অক্ষর। পিসীমাদের নিকট শিখল পাঁচালী, জেনেছিল বাংলা অক্ষর, ক খ গ সে পড়েনি। পণ্ডিত মশায় - এগার -বাব বছর বযসে তাকে পডান গীতা, হিন্দী পুস্তক (আদর্শ মহিলা নাম ছিল), পড়ালেন বাংলা। মাষ্টারণী মা পড়াতেন ইংরেজি। কিন্তু আশানুরূপ ফল হল না। এর কাবণ - যে সব বই আসত ক্লাস ফোর-ফাইভেব তা পডতে ভাল লাগত না। সে লাইব্রেরিতে বই বেছে বেছে পড়ত। পড়ত রামায়ণ, মহাভারত, রাজপুত জীবনপ্রভাত, রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, মোগল ঐতিহাসিক উপন্যাস ইত্যাদি। স্মরণ শক্তি ছিল অদ্ভুত। স্কুলের বইগুলো সে তুলে রেখে দিয়েছিল। ইচ্ছে হলে বোনদের সাথে যায় পড়তে, ইচ্ছে না হলে যায় না। মাষ্টার-মাষ্টারনী মা, তাকে ছাত্রীর মত ব্যবহাব করতেন না, অন্য মেয়েরা দুষ্টুমী করলে নালিশ করতেন। ধুনুমুনুর চালচলন খুবই বদলে গিয়েছিল। অন্তঃপুরিকারা সমীহ করত।

ছবি আঁকার ঝোঁক থাকায় সে লিখতে পছন্দ করত বোধ হয়। ছোট পিসীর বিয়ে হয়েছিল রাজপুতনায়। সে তাঁকে পত্র লিখত। অক্ষর তেমন ভাল হল না কিন্তু কবিতা লিখতে কসুর করেনি। গানও সে লেখে হোলীর জন্য।

ধুনুমুনু বাগান করে, চারা গাছে জল দেয়। সঙ্গিনীরা তাকে সাহায্য করে। ধুনুমুনুর মালঞ্চে ফুল ফোটে - মালতী, গোলাপ, কুন্দ ; তা দেখে সবাই খুসী হয় বোধ হয় মা ভাবেন - এ সত্যিকারের ফুল, সৌরভ ছড়িয়ে ফুটেছে। ধুনুমুনুর দিকে মার প্রশংসা-দৃষ্টিতে ধুনুর একটু লজ্জা হয়।

আজ তার সেই দুর্দ্দান্ত কৃষ্ণদিদির বিয়ে। দিদিটি তার টানা টানা চোখে কাজল দিয়েছে, কপালে দেয় টিপ। লাল ঘাগরায় তাকে কি সুন্দব দেখা যাচ্ছে। পিসীমাদের সময়ে নাকি সাদা ধপধপে পাতলা কাপড়ে রূপালী বুটি দেওয়া দ্‌ববা পরা হত বিয়েতে, চাদর নাকি নেটের, তা ও সাদা বুটিদার ঝক ঝকে ছিল।

কৃষ্ণদিদির চাদরে সবুজ বর্ডার দেওয়া, চুমকি সলমায় কাজ করা লাল চাদর গায়ে রাখা হয়েছে, ঘাগরা পরান হল, তা ছিল ঝকঝকে সোনালী। হাতে বাউটি, গলায় চম্পাকলি, আরো কত রকমের কণ্ঠহার ছিল। বাহুতে ছিল 'জড়োয়া' জোড়াকবজ বাজুবন্দ। কানে পরা হল চমায়। সিঁথিতে টিকাবন্দি কপালে শোভা দিচ্ছে, হীবাগুলো কেমন চমক দিচ্ছে। ফুলের লটকন কানের পাশ দিয়ে ঝুলছে; পায়ে পরান হয়েছে সোনার নূপুর।

ফুলমালা ও সেন্ট মিশে কেমন একটা নূতন নৃতন ভাব, কৃষ্ণদিদিকে ঘিরে মোহ সৃষ্টি করেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল ধুনুমুনু।

সানাই বাজল, আজ তা খেলাঘরে নয়; সশরীরে মুন্নাখা-ই বাজাচ্ছেন।

হাওদায় বসে বর এলেন হাতীর পিঠে। দীর্ঘ মিছিল এল। বাজল ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ। পুতুল বিয়েতে যা যা হল - তা সবই হল, আয়াজু বরণ করল বরকে। গোধূলী শুভলগ্নে শুভদৃষ্টি, মালাবদল হয়েছিল। কনে বিদায় দিনে - ভাই-বোন সবাই কাঁদল - যেমন করে খেলাঘরে কেঁদেছিল। আজ আবার ধুনুমুনুর গাল বেয়ে কখন যে জল গড়াল - সে তা জানতেও পারল না। কত ঝগড়া ছিল - এই দিদির সাথে, কৃষ্ণদিদি শ্বশুরবাড়ী চলে গেল।

একে একে সব বোনেবাই মালঞ্চ ভেঙ্গে চলে গিয়েছিল, ওদেব পুতুল সংসার ধূলায় পড়ে থাকে। রাজারাণী, বৃন্তচ্যুত ফুলের মত পড়ে থাকল। খেলাঘরের রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পতন হয়ে যায়।

ধুনুমুনু আজ আর সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই, দিনবাতের মিছিলে সে এগিয়ে এসেছে। পৃথিবীর শক্ত মাটিতে তার পা পড়ল, কিন্তু মধুমালঞ্চের কোমল আস্তরণ মাড়িয়ে আসতে পারেনি। আঁচল ভর্ত্তি ফুল এনেছে। বছরের পর বছর গেল, মেসোব গল্প বলা শেষ হয় না, ধনু তা শোনে, আর মালা গাঁথে। খেলাঘরের কৃষ্ণবিদ্রোহিনী বালিকা - কৈশরে কৃষ্ণলীলা সঙ্গিনী হয়ে - নাচে, গায়, আঁকে কৃষ্ণ ছবি। মহারাসের ব্রত পালন করবে।

বাঁশের ঝুপরিতে খিলান দিয়ে দিয়ে, গোলাকার করে মণ্ডপ তৈরী হল। ঘন করে সবুজ পাতায় ঝাপড়ি ছাওয়া হল; গোপিকাদের প্রবেশ পথ আলাদা রেখে, প্রতিটি খিলান নিয়ে সাদা কাপড় টেনে আলাদা আলাদা করে পার্টিসন দেওয়া হল। এর ভেতর পুরু পুরু গালিচায় ফরাস পেতে তাকিয়া রাখা হয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য।

রাজা মহারাণী, কুমার - কুমারীদের জন্য ও রাজ পরিবারের জন্য ' পদ্মাঙ্কিত' কারুকার্য্য করে সেলাই করা সুজনী বিছিয়ে দেওয়া হয়।

গোপীকাদের প্রবেশ পথ হতে আরম্ভ করে মণ্ডপদ্বার পর্য্যন্ত দীর্ঘপথ, নির্ম্মাণ করা হল রেলিং মত করে এক হাত উঁচু ঝাপড়িতে সালু মুড়িয়ে। ঐরূপেই মণ্ডপের ভেতরও সীমা রাখা হয়। মাঝখানটায় নির্ম্মাণ হয়েছে - রাধাশ্যামের সিংহাসন রাখার বেদী।

সিলিংয়ে ঘন করে পাতা ঝুলান হল, ওতে রাখা হল - পাতার আড়ালে আড়ালে, নানা রংয়ের ভাল্ব। পূর্ণিমাতে রাস আরম্ভ হবে। মনিপুরি শিক্ষকরা নৃত্য শিক্ষা দেন।

আজ পূর্ণিমা, গাঢ় নীলাকাশ আলো করে চাঁদ উঠেছে, তারাগুলো একে একে ফুটে উঠল ঝলমল করে। আর বেশী দেরী নেই মহারাস আরম্ভ হতে। চারিদিকে ভিড় রাসের জন্য। জ্ঞানীগুণীদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তারা স্ব স্ব আসনে বসলেন, নৃত্যশিক্ষক ও রাসধারিণীরা তাঁদের সাথে আসেন, নির্দ্দিষ্ট আসনে বসলেন।

বিবাহিতা রাজকুমারীরা রাজপরিবাররা, নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। রাজা- মহারাণীর সাথে কুমাররা ও তাঁদের রাণীরা এলেন। সবাই উঠে দাঁড়ান, রাজ-অভ্যর্থনা করা হলে পর, মাতা মহারাণীরা এসে স্ব-স্ব আসনে বসলেন। যথারীতি সকলকে ফুল চন্দন দেওয়া হল।

রাসধারিণীরা তাঁদের ঝকঝকে মন্দিরা তুলে নিলেন। ঝালর বাঁধা মন্দিরা দুলিয়ে দুলিয়ে গুরুবন্দনা গাওয়ার পর রাধার রূপ বর্ণনা করা হয় : মৃদঙ্গ বাদকরা পাঁয়তাড়া করে নৃত্যভঙ্গিতে মৃদঙ্গ বাজান - গোলাকার সীমার ভেতর আসেন।

গোপিকারা সারি দিয়ে দাঁড়ান ওদের পসোয়ান কুমীরের ঘুঙুর ও অলঙ্কার শিঞ্জন শোনা যায়। তাঁরা একে একে প্রবেশ পথে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করে মণ্ডপে প্রবেশ করেন নৃত্য ভঙ্গিতে, তালে তালে।।

রাসধারিণীবা গাইছেন-

কামিনী সঙ্গে, চলিল রঙ্গে
আওত ব্রজরঙ্গিনী রাধে।
তার-কটিতে কিঙ্কিনী, হার তরঙ্গিনী,
পীঠে পড়ে বেণী দোলনা
বন্ধুর নাম জপি, জপি রাইধনী
বাউরী মত।

রাস নৃত্যে ব্রতধারিণীরা প্রথম গোপী সাথে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন ছিলেন ; এদের সাথে ধুনুমুনুও ছিলেন। সবার মত সেও ফুলের মালা চূড়া করে বাঁধা চুলে জড়িয়েছিল, কানের পাশে তা দুলছে। মুখ ঢাকাছিল স্বচ্ছ কাপড়ে। তার পদক্ষেপ ভঙ্গিমায় সবার চোখ পড়েছিল। হীরার হারটা হৃদস্পন্দনের সাথে ধক্‌ধক্ করে উঠছিল ; এই প্রথম মহারাসে যোগ দিয়েছে। তার কানে গেল লতার মত নাকি তার শরীর। সে শুনল রূপের প্রশংসা.....।

পি[illegible] [illegible] দিয়ে দিয়েছিলেন, ভ্রূযুগল কামনার ধনু করা হয়নি, মানান সই করে আঁকা হয়েছিল। গালেও একটু-[illegible]প দেওয়া হয়েছে ; চোখে কাজল, ঠোঁটে ও কিছু রং ছিল। এত চেষ্টা করার পর প্রশংসা না হওয়া অন্যায়। পদ্ম-চক্ষু করার চেষ্টাও হয়েছিল। পায়ে আলতা, সোনার নূপুর, কানে দুল, বাজু, সাতনরি, সবই পরানো হয়েছে। ধুনুমুনুর ঝাঁকরা চুল পিঠ বেয়ে নেমে এসেছিল, আজ [illegible] করে বাঁধা হল যখন, বলেছিল - আঃ লাগছে যে, একটু কম করে লটকনগুলো দাও, চোখের উপর পড়ছে।

একটা ময়ূর পাখা পরিয়ে দিতে বলেছিল। ওটা সঙ্গে এনেছিল। পিসীমা বলেছিলেন - তুই কি কৃষ্ণ?

তার হাত থেকে পাখা নিয়ে ড্রেসিং টেবিলে রেখে দিয়েছিলেন। নাকের কেসরটা পীড়া দিচ্ছিল ধুনুমুনুকে, কিন্তু খোলা যাবে না ; মহারাসে সাজতে হয়, কোন অলঙ্কার বাদ দিতে নেই যে, এমনই নিয়ম। বাজুতে ঝালর ত থাকেই, তার উপর রস করে ফুলের লটকন বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

পাতার আড়াল হতে আলো আসছে, মাঝে মাঝে হলুদ লাল আভা এসে গোপিকাদের রূপে - তা মোহ সৃষ্টি করে রং খেলা খেলে ; আলো প্রবর্ত্তক চক্র যে ঘুরছে।

কৃষ্ণচক্র পৃথিবীতে আলো আঁধার সৃষ্টি করে। রাধা শ্যাম ত্রিভঙ্গ হয়ে - ত্রিকাল বাঁশী বাজান নাকি। তিনবার আরতি হয় মাতা বড় মহারাণীর মন্দিরে। ধুনুমুনুর বাঁশী ও অসিধারী কৃষ্ণও একবার মাত্র ধুনুমুনুর দর্শন পান। দেখাদেখির ঐ মুহূর্তই আজ ধুনুমুনুকে টেনে এনেছে রাস মণ্ডপে।

শঙ্খ বাদন হল, সারি দিয়ে দু লাইনে গোপিনীরা দাঁড়ালেন। উপস্থিত সকলে রাজারাণীর সাথে দাঁড়ায়।

রাধাশ্যাম আসছেন- সমারোহের সঙ্গে। ছত্র -চামর- ময়ূর পাখা ধরিণীরা সাথে সাথে আসছেন, ... করতাল মৃদঙ্গে রাধাকৃষ্ণের জয়গান হয়।

গোপিকারা গাইলা - জয় জগত বন্দিনী, হরি হৃদয় রঞ্জিনী,

ব্রজরমনী, মুকুটমনি, রাধিকে

শ্রী রাধিকে.........................

পুজারিণীরা যুগল মূর্ত্তি স্থাপন করলেন বেদীতে রাখা সিংহাসনে, আরতি হল, নির্মাল্য দেওয়া হল রাজাকে। প্রণাম করে সকলে আবার আসন গ্রহন করলেন।

গোপীদের সাথে ধুনুমুনু বেশ চমৎকার নাচছে..........।

মৃদঙ্গের বোল যখন উঠে, গোপিকাদের মধ্যে যখন যার ডাক পড়ে, সেই গোপী - নূপুর ও অলঙ্কারাদি শিঞ্জন অটুট রেখে আসে, শ্যামের মুখোমুখি হয়, প্রণাম করেন এরপর শিক্ষানুযায়ী মুদ্রা ও ভঙ্গিতে নৃত্য করেন বিবিধ ছন্দে - লাস্যাদি ভঙ্গিমায়।

ধুনুমুনুর ডাক আসে, উপরোক্ত ভাবে সে ও রুনুঝুনু শব্দ তুলে অগ্রসর হয়......................, মালা নেওয়ার ভঙ্গিতে নৃত্য করে দাঁড়াল। ঐ সময় যে ব্যক্তি একটু দূর হতে তাকে দেখছিলেন, তাঁর উপর চোখ পড়তেই তাঁর কোমল দৃষ্টিতে সে চমকে উঠল। অচেনা নয়, ওর সাথে ঝগড়া হত, তর্ক হত। তাকে ধুনুমুনু দস্যু বলে জানত। আজ এর চোখে সে কী দেখল! '

রাস শেষ হতে আর বেশীক্ষণ নেই ; তারাগুলো নিভে আসছে, নবোদয় সূর্য্যের সোনালী আলোয় স্নাত হয়ে রাধাশ্যামের বাঁশী যেন কলকাকলীতে বাজল। পুরাদমে নৃত্য উন্মাদনায় মৃদঙ্গ মন্দিরা বেজে চলেছে, ... দ্রুত তালে ঘুরে ঘুরে নৃত্য হওয়ার পর রাস সমাপ্ত হয়ে যায়। আরতি হল, শঙ্খ ঘন্টা বাজল, সবাই উঠে দাঁড়ালেন, এরপর নত হয়ে ভূমিতে মাথা রাখেন

সবাই। শ্যামসুন্দরকে নিয়ে পুজারিণীরা মন্দির পথে অগ্রসর হলেন।

ধুনুমুনু জিজ্ঞাসা করেছিল - তুমি এমন করে দেখছিলে কেন? সে বলেছিল - তোমাকে দেখতে নেই নাকি।

ঠাট্টা সুরে গেয়েছিল - বিদ্যাপতির দু'লাইন-

" আজ রজনী হাম ভাগে পোহায়নু,

পেখনু পিয়া মুখ চন্দা,.... ....

ঠাট্টা করেই বলেছিল - আমি বিভোর, তোমার রূপে গুণে বিভোর হয়ে দেখছিলাম। রণচন্ডী যে কি করে রাধা হলেন ভাবছি। আজ কিন্তু আমার ভুল ভাঙ্গল ; আমি ত অন্ধকারে ছিলাম, এনেদিলে নূতন আলো। তুমি -মন্দির, রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ দেখছিলাম যে। ধুনুমুনু ওর কথা শুনে অবাক হয়, সে বলে - তুমি ত ঈশ্বর মান না, রাধাকৃষ্ণ কথা বলছ কেন, বন্দেমাতরম বল। ও বলল - রাধাকৃষ্ণ দেখিনি, তাই মানিনি। আজত দেখলাম?

আমি কি রাধাকৃষ্ণ? ঈশ্বর?

বললাম ত - তুমি মন্দির, তোমাতে রাধাকৃষ্ণ। তোমাতে নেই?

আছে, আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। পৃথিবীটাকে আমার ভাল লাগছে। নিজেকেও মন্দ লাগছে না। বিচিত্র ঈশ্বরলীলা, বিচিত্র নিয়তি খেলা। ওব প্রতিটি কথা ভাল লেগেছিল ; এক অনুভূতিতে - দুজনে দুজনকে পবম বিস্ময়ে দেখেছিলাম। সে, ধুনুমুনুর ঘন চুলে পরিয়ে দিত বেলি ফুলের গুচ্ছ ; পল্লবে ঢাকা সুরভি - আজো চৈত্র হাওযায় ভেসে আসে। মনে হয় - একেই বলে মৃতসঞ্জিবনী।

অবিস্মরণীয় ফাল্গুন

ফাল্গুন এল, বসন্ত উৎসবেব আয়োজন হচ্ছে ; প্রতি বৎসর জলসার জন্য গানের রেওয়াজ হয় দস্তুরমত। পূর্বাপর হতে তা হয়ে এসেছে। পাপিয়া দল ও কোয়েলি দলের প্রতিযোগিতা হবে। আব এক নূতন দল হচ্ছে নৃত্যছন্দে। ঐ দলের নাম ধুনুমুনু বাখল ' কলাপী'।

বিভোর বাজাত - তবল, এসরাজ বাঁশী। খুব ভাল বাজাতে পারত ; গাইতেও পারত কিন্তু পুরোগান গাইত না ; বরাবর সে বদলে বাজায়। ধুনুমুনু যখন বলল - আমার গানের মাত্রা ঠিক করে দিতে হবে। সে বলেছিল - তোমার সঙ্গে বাজালে তো বেসামাল হয়ে পড়ি, তুমি বেতাল।

ধুনু বলে - ওদের সঙ্গে বাজিয়ে অভ্যেস কিনা, তা আমার গানে বাজাবে কেন।

তার বলার নমুনায় বিভোর হেসেছিল ; বলেছিল - গাওত চেষ্টা করে দেখি।

তাল কেটে গেলে রাগ করবে না কিন্তু , মাত্রা ঠিক করে দিতে হবে। বিভোর হো হো করে হেসেছিল। বলল দোষ দিতেও পারব না বোধ হয়। তোমার মেজাজ ঠিক থাকলে - মাত্রা লয় আপনি আপনি ঠিক হয়ে যাবে। গাও, আমি বাজাচ্ছি।

ধুনুমুনু গেয়েছিল নিজের রচনা। গানের সুর ছিল- বাগেশ্রী

সুদূরে ভালোবাসা লয়ে-' দিগন্তে আছ চেয়ে'
বসন্ত বিরহী দীরঘ নিশ্বাসে
বলে আজ কেহ নাই নাই কাছে।
ওরে ও অবুঝ বুঝেও বোঝনা,
ঝরাপাতায় নূপুর বাজায়ে যে গেছে-
সে তো ছলনা।
মরুপথে যেতে - দগ্ধ দিবসে,
কেন খোঁজ তারে, পরমা সে তো অন্তরে।
বাসা বেঁধে আছে ফাগুনের শেষে আখি পাতে,
নয়ন জলে মুছে ফেলো না, ফেলো না,
অপরূপ তার ছবি, মিনতি আমার
রাখ, রাখ, হে কবি।
ঝিল্লি সুরে বাঁধ বীণা, ছন্দে ছন্দে তুল ঝঙ্কার
সাধ তারে যে আছে তোমার বক্ষে লীনা।।

মোটামুটি তাল ঠিক হল, বিভোর বলল ওরকম গান গাও কেন? হোলীতে বিদায় সংগীত গাও তোমরা, তা জানি ; কিন্তু হোলী আরম্ভ না হতে শেষ গানে সঙ্গত দিলাম যে। বিভোরকে কেমন যেন একটু উদাস দেখায়।

ধুনুমুনু বলল আরম্ভটা শুনবে? বলেই সে অন্য একটা কথা তুলে বলেছিল - তোমাদের দলের গানের আরম্ভ কেমন, তা একটু বলনা।

"আমি ত গাইনা, কি করে বলি। তোমার আরম্ভটা শুনিনা কেমন। গাও, আমি কথা রেখেছি, রাগ করিনি। শেষ গান শোনালে ! আরম্ভটা গাইবে বলেও গাওনা তুমি? শেষটাই—আরম্ভ নাকি? "

গানটা তেমন ভালো হয়নি। সুর দিয়েছি —মালকোষ। .

" বেশ তো, ভালো করে নেওয়া যাবে"।

তুমি আমার সঙ্গে গাইবে?

হাঁ, গান ধর, (সে আবার তবলা নিয়ে বসল)।

তবহি আওত নবীন মধুমোহে
যব তুহু জাগত মম হৃদিমাহ।
তব সরস প্রণয় বানী,
যেন বিজলী মেঘের ঘনঘটা।।

বিভোর গান শোনার পর বলল এ গানে আর একটু জুড়ে দেব। সত্যিই সে আরো চার লাইন জুড়ে দিয়েছিল।

' তবহি আওত নবীন মধুমাহ'

কোকিলার কুহুস্বর আজি মম অন্তর-
অনুরাগে রাঙ্গাইয়া আবির ছড়ায়,
সুরভিত সমীরণ তার পরশ বহিয়া আনে,
হরষ জাগায়। তবহি আওত নবীন মধুমাহ...

ওদের গান দস্তুরমত রেওয়াজ হয়েছিল। ধুনুমুনু দলের দুজনে গাইল, দু'টাই মালকোষ ; গাওয়ার ধরণ মাত্র আলাদা।

বরাবর মত এবারও সেণ্ড্রেলিয়ার ঝলমল হয়ে আলো জ্বলল। আসর সেজে উঠেছিল, তর্কও উঠেছিল।

বিভোরকে অনুযোগ করে বলেছিল ধুনুমুনু, কেন ওদের দলে গেলে, কেন নিন্দা করলে !

ঐ ত, তোমার দলে যিনি বাজালেন, দেখলামত তার অবস্থা ; আমাকেও ওরমত বাজাতে হতো। তুমি কি বলতে চাও - আমার দল হেরেছে?

হার তোমার হবে কেন, আমিই হার স্বীকার করছি।

' ধুনুমুনু খুবই রেগে গিয়েছিল, বিভোর বলল - বলছিত- হার মানছি। ('সে ধুনুমুনুকে আবিরে রাঙ্গিয়ে দিয়েছিল')।

ধুনুমুনুর সাথে তাঁর কি সম্পর্ক লিখলাম না, ধুনুমুনু তাকে কি ডাকত, তাও লিখলাম না। সে তাকে বিভোর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি। আমি ও তাকে বিভোরই বলছি।

কোন অবস্থাতেই ভুলতে পারছি না - ধুনুমুনুও বিভোরকে। আমি তাদের স্মৃতি আলিঙ্গনে আছি। বিভোর - সে দুরন্ত ছিল, সংযত ছিল ; নিবিড় ছিল তার ভালবাসা। ধুনুমুনু, তেমনি ভালবাসে, তা ছিল ফল্গু ধারারমত। হোলী খেলায় ধুনুমুনুর দল ব্যস্ত করেছিল তাঁকে, কিন্তু পেরে উঠল না। মস্ত বড় একটা হাউস ছিল, সুইমিং পুল ছিল ওতে, হোলী খেলার দিন ওতে রং আবিরে জল ভরা থাকে ; ছোট বড় সবাইকে ওতে ফেলে দেওয়া হত। বিভোর বলেছিল - তোমাকে ফেলে দিই ? সে ভয় দেখাতে ছাড়ে না। তোমার বান্ধবীরা কেমন হাবুডুবু খাচ্ছে দেখ। ধুনুমুনুর হঠাৎ কি খেয়াল হল, সে বলেছিল এসো না - দেখ, আমি ওদের মধ্যে কেমন লাফিয়ে পড়ি।

কুহরণ

বসন্ত সঙ্গীত

ঋতু বসন্ত এলরে - কোথা শ্যামের বাঁশী বাজে,
ময়ূরী নাচে গায় কোয়েলিয়া
কোথা- শ্যামের বাঁশী বাজেরে (৩)
রাধা প্যারী নিয়ে পিচকারী
সখীগণ সাথে এল.
কো'থা শ্যাম সুন্দর, রসিক নাগর,
খেলিব হোলী কার সনে।

সখি হেসে কয় চতুর কানাই
মারে পিচকারী - গোপনে,
দেখ দেখ সখি বন উপবন
রঙে রঙে গেল ছেয়ে।
ঋতু বসন্ত এল, এলরে।।
(এগান দু ভাগ করে গাওয়া হয়েছিল, দু'জন গেয়েছিল)

শ্যাম সঙ্গে শ্যাম রঙ্গে
খেলিব হোলী।
ছাড় ছাড় বন্ধন এস প্রিয়তম
প্রেমের কারণ- ছাড় ছাড বন্ধন ;
খেল হোলী- প্রিয়া সনে।
দিন-রজনী মিলন ক্ষণে
বসন্ত বাহার এল ধরা অঙ্গনে
খেল হোলী শ্যাম সনে।।

পরদেশী বঁধু ফিরে এল,
কোয়েলিয়া মঙ্গলগীত শোনাল।
সখি এস এস রঙ্গীন আঁচল উড়ায়ে,
আজ বাজে বাঁশরী যেন মধুকরী,
সুরে সুরে মন হয় যে বাউরি
পরদেশী বঁধু এল ফিরে।।

কৃষ্ণ প্রেম সঙ্গীত

কানু বিনা এ প্রাণ কৈসে ধরব হাম
বিফল যৌবন, বিফল এ ফাগুন।
মধুঋতু এল ফিরে, পাপিয়া ডাকে নীড়ে, (৩)
সে শুধু এল না ফিরে সে ত এল না
পলাশের মত ঝরে রঙিন কামনা।
শুন প্রিয় সহচরী শুন প্রাণ সখি,
হৃদয়-পিঞ্জরে মোর কাঁদে প্রাণ পাখি।

কেঁদনা কেঁদনা সখি তুমি মুছে ফেল নয়নের জল
তুমি কাঁদিলে, বলিবে সকলে, শ্যাম সুন্দর নিরদয় হে (২)
সখি শ্যামসুন্দর তব নিরদয় হে (কেঁদনা কেঁদনা)
সে ত এল না ফিরে এলনা,
চির বিরহ শয়নে তুমি মুদিবে নয়ন, যবে মুদিবে নয়ন।
ধরার ধূলি পরে, যে ফুল গেল ঝরে,
তারি সুরভি লয়ে কাঁদিবে সে,
নয়ন জলে ফিরে আসিবে।
কেঁদনা কেঁদনা....।
(কৃষ্ণ প্রেম গীতিনাট্যে, শেষ পাতায় লেখা হয়েছে) - হে অসীম সুন্দর
ক্ষমা কর আমার দুরাশা,
সীমায়িত বন্ধনে বাঁধি বাহু ডোরে,
ক্ষমা কর এই ভালবাসা।

সূর্যতপা নাটকের গান

যদি মরম আমার কুসুম ছড়ায়,
দখিনা পবনে সুরভী বিলায়,
খসে পড়ে যদি অঞ্চল মম
ধরার ধূলী পরে ; ক্ষমা কর মোরে
ক্ষমা কর নাথ বিভোরতা মোর নিমেষের।।

স্বপন কুহেলী নাটকের গান

আমারে ভুলাইয়া প্রিয় কেমনে ভুলিলে,
আমি নিশিথ রাতের হতাশা পথিক
ভাসি চোখের জলে ; কেমনে ভুলিলে।
মন আমার মানেনা মানা, খুঁজে বারে বারে,
মন ভুলাইয়া প্রাণ নিলে দাগা দিয়া হায়রে।।
মরি হায়, হায়-হায় হায়রে,
মন ভুলাইয়া প্রাণ নিলে দাগা দিয়া হায়রে।

আলো ছায়া উপন্যাসে শ্যামলীর গান

হে আকাশ, হে আকাশ,
কেন তুমি এতই উদাস
প্রভাতের রবি পাখীর কূজন,
ফাগুনের ফুল সৌরভে মগন,
ঋতু বসন্ত, রাতের জোছনা,
সাঁঝের তারা মৃদু সমীরণ,
সবি আছে তবু কেন বিমনা।
হেরি দিকে, দিকে, নব নব
বিশ্ব বিমোহন রূপ তব
সুদূর তুমি, তবু বাহু প্রসারিয়া চেয়েছি আমি।
হে অরুণ বরণ সন্ন্যাসী, তোমারেই ভালবাসিয়াছি,
নহি আমি অপ্সরা মেনকা উর্বশী
শুধু নিজেরে বিলায়ে দিতে চেয়েছি।

জাগরণী সঙ্গীত

জাগো - জাগো - জাগো-
বনের সবুজে তুমি জাগো।
ফাগুন সমীরণে পাখীর গানে জাগো জাগো।
যমুনার নীল জল কর চঞ্চল, আমি গাগরী ভরিয়া নেব
হরষে আমার ; জাগো - জাগো - জাগো - বনের সবুজে............
নূতন সূর্য হয়ে জাগো।

আমি অঞ্জলী ভরে দেব চরণে তোমার
ফুল মালা দেব পরায়ে।
নবীন বসন্তে নুতন সূর্য হয়ে জাগো, জাগো (৩)
আমার আঁধারে আলোক পুলক আন
সুধারসে দাও ভরে প্রাণ,
আমি গাহিব গাহিব প্রিয় তব জয়গান।।

যে গেল - কাঁদায়ে গেল, দূরে বহু দূরে
আজ ফাগুন বাতাসে, কেন ভেসে আসে,
বাঁশরীর সুর তার মোহন সুরে।
কানে কানে বলে বারে বারে, ভুলনা আমারে প্রিয় ভুলনা আমারে।
সুমুদ্রের ঢেউ উঠে বালুচরে
তেমনি সে বুকে আমার আছড়ে পড়ে।
আঁচলে ঢেকে আমি রাখি তাবে
সে ত - নয়নের জল হয়ে ঝরে পড়ে।।

তোমারে ভুলিতে ব্যথা জাগে প্রাণে প্রিয়,
তুমি যে আমার সুখের স্বপন,
ঢাকা আঁখি পরে রয়েছে গোপন,
অশ্রু নির্ঝর ঝর্ণা কেমনে ভুলি বলনা
নিমেষ ফেলিতে, তোমারে ভুলিতে বিদরে পাষাণ হিয়া।
ব্যথা শিহরণে দুঃখ জাগরণে মরমে যাই মরিয়া প্রিয়।।
(কেমনে ভুলি বলনা)

(বাউল গান ভৈরবী সুর)

তোমায় ভুলতে পারলাম না - তোমায় ভুলতে পারলাম না,
সবাই বলে তুমি কৃষ্ণ কালো, রাধা কলঙ্কিনীর আলো।
তোমার বাঁশির সুরের টানে, মন ভরে যায় গানে গানে,
ঘর ছাড়া মন আমার নাই কোন বন্ধন, নাই সোনার পিঞ্জরা,
নীড় হারা পাখীরে -দিলে মুক্তামালা, মুক্তা বুকে রাখি আমি
রাখি - চোখে চোখে, ভুলে গেলাম সব জ্বালা। তোমায় ভুলতে পারিনা।

(সুর - বড় হংসিকা -)

আজকের বাত - ভুলতে পারবে না।
প্রতি রাতে ঘুম ঘোরে, আসবে সে স্বপ্ন ছলে,
আজকের রাত ভুলতে পারবে না।
আসবে সে স্বপ্ন ছলে, বলবে সে নয়ন জলে
কোকিলার কণ্ঠে তুমি   কান্না রেখে যেও না।(২)
কান্না রেখে যেও না।

(বেহাগ সুর)

হে হরি - হে হরি - হে হরি,
কত মধু স্বরে ডেকেছ বারে বারে
আমি যে আসিতে নারি,
আমি যে অবলা নারী,
আমি পরাধীনা নারী।
নূপুর আমার চরণ শৃঙ্খল
মণিহার কঙ্কন সবি যে বন্ধন
আমি যে খুলিতে নারি।
মোর গৃহবাস নির্জ্জন কানন
সঙ্গীত সুর বিরহে বিদুর
হে মহাভিখারীর কি দিব তোমায়
চরণ ধুলি রেখে যাও
সে হবে আমার সিঁথির সিন্দুর
ললাটে নেব মেখে ;
প্রণাম তোমায় হে হরি
মাটিতে মাথা রেখে
আমি যে অবলা নারী।

(ভীমপলশ্রী)

অনেক রূপে আছ বলে চিনতে তোমায় পারি না,
বনে বনে পাখীর স্বরে ডেকেছ বারে বারে,
কাছে আসতে পারলাম না.......।
বিরহে মন কাঁদে লয়ে শ্যাম নাম,

হায়রে, হায় - কেন শূন্য ব্রজধাম,
তবু মরম জড়ায়ে থাকে মধু কৃষ্ণ নাম,
তুমি যে প্রিয়তম- সবার পরাণ,
তবু চিনতে পারিলাম না।
নিঠুর কৃষ্ণপ্রেম, কাঁদে ব্রজবাসী,
যুগ যুগান্তর হতে কাঁদে ব্রজনারী তারে ভালবাসি।

('কুহরণের শেষ পাতায় ধুনুমুনু লিখেছে')
হে আমার অশান্ত হৃদয়ের প্রিয়,
সঙ্গবিহীন সঙ্গীতে, তুমি ছন্দ খুঁজোনা। একূল - ওকূল যার নেই, সাগরে মিশে গিয়ে ও তরঙ্গে যে আছড়ে পড়ে,যার বিশ্রাম নেই, তাব কুহরণ তোমার বজ্রহৃদয় ক্রন্দনে ডুবিয়ে দাও, ডুবিয়ে দাও।

সূর্য যখন ডুবে যাবে, পাখীরা নীরব হবে, তখন তুমি নিথর ঘুমের আলিঙ্গনে আমায় নাও।

নিবিড় হয়ে- এসো বন্ধু এসো - আমার দুকূল প্লাবিয়া এস।

আমি অসমাপ্ত, অতৃপ্ত, তোমার পূর্ণতায আমাকে নাও, সমাপ্ত কর, সম্পূর্ণ কর। মহামিলনে লয় কর।

আমার গানেব তুমি আদি, তুমি মধ্য, তুমিই শেষ বিন্দু।
পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বসিষ্যতে।।

ধুনুমুনু আজ আমার বুকে এলিয়ে পড়েছে, তাব ক্লান্ত মনে হাত বুলাচ্ছি সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিক্। আমি লিখছি সঙ্গীত ও সাহিত্য বিষয়। বাউল গানের কথাটাই - আগে উল্লেখ করছি।

বাউলদের জীবন সঙ্গীতময়। নিজস্ব ধরণে তাঁরা রসমাদুলি নিয়ে গান ও নাচেন, পায়রার মত পদচারণা করে ঘোরেন ; কোনরূপ আড়ষ্ঠতা থাকে না। এটাই তাদের বিশেষত্ব। বন-বাদারে, পথে প্রাঙ্গণে, তাদের প্রাণখোলা গান শোনা যায়। ধারাগতভাবে তাঁদের গানের কথা ও সুর বঙ্গবাসীদের অনেক অনেক কালের পরিচিত। এ সঙ্গীত পথচারীকে চকিত করে, সুর ও কথায় মাদকতা আছে। জনমন আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। যখন যেখানে সারিন্দায় সুর তুলে বাউলরা গেয়েছেন, সেখানে জন সমাবেশ হতে দেখা গেছে। এতে বাউল গানের জনপ্রিয়তা স্বীকৃত হচ্ছে। বৈরাগী প্রাণ সঙ্গীত চৈতন্য দেয় - এ সংসার শুধু ভোগের জন্য নয় তারা অনেকটা ফকির সন্ন্যাসীর মত। বোধ হয় ঐ রূপ মতবাদই পোষণ করেন।

ত্রিপুরাতে ক্ষিতীশ বাউলের গান শুনেছিলাম মোটর থামিয়ে। সারিন্দায় গাইছিলেন। তার দরাজ গলা - ভাববেশে অত্যন্ত মধুর ছিল। পূর্ণদাসের গানও শুনেছিলাম, তাঁর গান , নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করেছিল ; তাঁর জন্য মাইকের প্রয়োজন হয়নি।

পল্লীসঙ্গীত

পল্লীসঙ্গীত শিশুর হাসি কান্নার মত মাযাময়। এ সঙ্গীতের সরল আবেদন, অকৃত্রিমতা প্রাণরসে সিক্ত। অন্তর স্পর্শ করে। রাধাকৃষ্ণ ভাব মাধুর্য্যে, বিরহ মিলনে ভালবাসাই পল্লী সঙ্গীতের প্রাণ যেন। সুরে ছন্দে যখন ব্যক্ত হয়, তা সবার জীবনের সাথে জড়িত হয়ে উঠে বলে, মর্ম্মে মর্ম্মে ঐ সঙ্গীত বিশেষ স্থানে অধিকার করে আছে।

কীর্ত্তন

বৈষ্ণব কবিদের রাধাকৃষ্ণ প্রেম ব্যাকুলতা, অনুরাগ, বিচ্ছেদ বিরহ, অভিমান, ভাষা লালিত্যে অত্যন্ত মধুর। আশা আকাঙ্খা, কামনা বাসনা সবই রাধা দ্বারা সমর্পিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাৎসল্য ও রঙ্গরসে রস সঞ্চার করায় যখন খোলের সাথে গাওয়া হয়- নিজস্বতা রক্ষা করে, তখন ঐ সঙ্গীত জীবন্ত হয়ে উঠে। এর প্রভাব সকলের উপরই পড়ে। ক্লাসিক্যাল কীর্ত্তন ও ঢপ কীর্ত্তনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু নায়ক একমাত্র কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা। বহুভাষায় আলাপ বিলাপ হলেও বিষয় এক ; কৃষ্ণই কীর্ত্তনের প্রাণাধার ; সর্বজন - হায় প্রিয়, হায় প্রিয় বলে অন্তর যেমন কাঁদে, তেমনি কৃষ্ণ বিরহকীর্ত্তনে কান্না আছে। মানুষ যে প্রাণ খুলে কাঁদতে চায় !

লীলাময় সংসারে বৈষ্ণবরা কাঁদেন কৃষ্ণের জন্য। মহাভারতে যিনি গীতার বক্তা, সেই কৃষ্ণই রাধার প্রাণবল্লভ যে। সুখ দুঃখ, অভিমান, সর্বস্ব সমর্পণ করে কীর্ত্তনীয়ারা কাঁদেন রাধা ভাবাবেশে। কীর্ত্তন যেন কান্নার উৎস ; তাই হবি সংকীর্ত্তনে গাওয়া হয়েছে- " হরিনামের গুণে পাষাণ গলেরে....." হরিনাম শুনে জগাই মাধাই দস্যু বিগলিত হয়েছিল- মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কীর্ত্তন শুনে। কীর্ত্তনে মহিমা আছে, সমবেদনা আছে " প্রেম ভক্তি সমন্বয়ে কীর্ত্তনে প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

রবীন্দ্র সঙ্গীত

রবীন্দ্র সঙ্গীতের মন্দাকিনী ধারা - ভাবভাষায় সবার অন্তরঙ্গ হয়ে পরমাত্মীয়ের মত সুখ দুঃখে আছে। এখানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সার্থকতা নিশ্চয় স্বীকার করতে হয় ; যদিও রবীন্দ্র সঙ্গীত পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত ; নিজস্ব একটা গণ্ডীতে, কবির ধরণে বিশেষত্ব লাভ করেছে। তা শিক্ষা দেওয়া যায় না, যদিও অনেকে মাষ্টারী করেন, কিন্তু ক'জনে কবির ভাবাবেশে নিজেকে মেশাতে পেরেছেন? তা পারে না বলেই রবীন্দ্র সঙ্গীত কিছুটা আবৃত্তির মত শোনায়। বিশ্বকবির ছন্দোময় বাণীই অন্তরে বিশেষভাবে মূর্ত্ত হয়ে মোহিত করে রসসঞ্চার করে বলে - সহজেই শিক্ষিত সমাজে আদরণীয় । যে সব গান ভাষার প্রাধান্যে সুরেলা হয়, ঐ গানগুলো নিজের ভাবভাবনায় মিশিয়ে যাঁরা গান - তাঁরাই সঙ্গীতকে মধুরতা দিয়ে প্রাণবন্ত করতে পেরেছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতে সাড়া আছে, স্পন্দন আছে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিস্তৃত আকাশে সব পাখী উড়তে পারে না। গুরু কৃপায় কিছু দূর গেলেও অন্তর হরির কৃপা না হলে, ঐ সঙ্গীতের স্বরূপ প্রকাশ পায়না।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বাক্যাতীত সুরই ভাব সঞ্চার করে রাগ রাগিনীতে। ঐ সঙ্গীতে কল্লোল, উচ্ছ্বাস, ঝড়ের মাতন ও পরিব্যাপ্ত আকাশ প্রাণে ধরা দেয়। প্রাকৃতিক লীলায় অঙ্গীভূত হয়ে. সুরে সুরে অভিনব রূপ ধারণ করে সার্থক হয়।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ধাপ আছে, সঙ্গীত পরিবেশিত হলেও এর স্বাদ অনেকে পাননা, কিন্তু বীণা সরোদে, বাঁশীতে যখন সুর উঠে - কথা সেখানে থাকেনা, সুরে সুরে আলাপ বিলাপ হয় ; তা অত্যন্ত পরিচিত, পরমাত্মীয় হওয়াতে বাকাহারা ঐ সুব- আমরা মুগ্ধ হয়ে, নির্ব্বাকি হয়েই শুনি।

হাসি কান্নাতে যে কথা থাকে না, অভিব্যক্তি মাত্র থাকে, আত্মচেতনার দ্বাবা মানুষ তা বোঝে, বলার প্রয়োজন হয় না; শাস্ত্রীয় সুর সঙ্গীত সে রকম।

প্রথমে স্বরই সাধনীয় হয়। (কথা খুবই সংক্ষিপ্ত), অনুরাগ, অভিমান, অনুযোগ, বিলাপ-বিরহ প্রার্থনা, থাকে। নাদ-ব্রহ্ম শব্দ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত্তি বলে মনে হয়। ঐ সঙ্গীতের মূল অন্তরহরি বলে শুনেছি। সঙ্গীতারম্ভে সংক্ষিপ্ত শব্দে তা-না-রি-উচ্চারিত হয়, কেহ কেহ স্মরণ করেন।

অন্তরহরি- অন্তরঙ্গ লীলাময় ; জন্ম-মৃত্যুব লুকোচুরি খেলায় মিলন-বিরহ সুব সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে। সুর যখন গানের কথার আশ্রয় নিয়ে ব্যক্ত হয়, অন্তরহরির চবণেই লুটিয়ে পড়ে. মূর্চ্ছিত হয়। ঐ সঙ্গীতে সৃষ্টি হয় মূর্চ্ছনা, ভাবস্তব্ধ সমাধিতে শ্রোতা ও গায়ক এক অনুভূতিতে থাকেন।

দর্শন শ্রবন, মনন এই তিনের সংযোগে-সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীত সৃষ্টি করেন। এটাই শিল্পী জ্ঞানী-গুণী গায়কদের প্রেরণা দিয়েছে ; স্বভাবতই তাঁরা অনুপ্রাণীত হয়েছেন। বিবশ মনেব ক্রিয়াতে হাসি কান্না প্রকাশ পায়, এর ভাষা থাকে না, প্রত্যক্ষ থাকে। হঠাৎ জন্মমাত্র পাওয়া স্বরই, সাধনায় ক্রমে তা রাগ রাগিনীতে বিস্তাব লাভ করেছে, 'এ ধারণাতে' কান্নাকেই আমি সুরের উৎস বলছি।

ভাষা, বিন্যস্ত হয়ে- রূপ গুণ আত্মকথা কাহিনী বর্ণনা হওয়ার মত, স্বর নিজ অনুভবে (শাস্ত্রী সঙ্গীতে) সুরনাদ সৃষ্টি করে, প্রাকৃতিক শব্দ কণ্ঠে ধারণ করে। ঐ সঙ্গীতে আদি, মধ্য, শেষ আছে। প্রথমে আলাপ হয়, মধ্যে বিস্তার, অন্তে- মগ্ন হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে যায় (মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করে)। জন্ম, জীবন, মৃত্যু। এই তিন অবস্থার সাথে উল্লিখিত সঙ্গীতের সাদৃশ্য আছে। উদয, মধ্যাহ্ন, রাত্রি ও বলা যায় তা ক্রমাগত আত্ম অমৃত ধারায় যেন এর ঘরাণা রক্ষিত হয়ে চলেছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নাদ ব্রহ্ম যেন সঙ্গীতের ভিত্তি।

পৃথিবীতে যোগ বিয়োগ ভাগ পূরণ সর্ব্বদা আছে, অবশেষে মহাবিচ্ছেদের কান্না শোনা যায়। তেমনি গানের আরম্ভ দিয়েই গান শেষ হয়। সুর এর ভাষা থাকে না, যেমন প্রতিদিন ফুল ফোটে, ফুল ঝরে - সৌরভ হারায়, তা দেখার পর বলার আর কী থাকে! কবি, দার্শনিক, শিল্পী এরা বিশেষভাবে দেখেছেন ; আমরাও দেখেছি বুঝেছি - জন্মমাত্রই ভূমিষ্ট হয়ে কেঁদেছিলাম,

মা'র কোলে সান্ত্বনা পেয়ে হেসেছি, এরপর আবার কাঁদতে হয়। এমন কোন ব্যক্তি নাই যে কাঁদেনি। কান্নাতে যা প্রকাশ পায় যা মাথা খুঁড়েও বলতে পারে না বিচ্ছেদ যন্ত্রণা যে কি । তা ভাষাতে প্রকাশ করতে পারেনি, দৃষ্টির অন্তরালে কুণ্ঠিত বিরহ অসহায় কান্নাতে থাকে। কবি শিল্পী গায়করা কান্নাকে ভাষা দিয়ে, সুরের প্রলেপ দিয়ে সান্ত্বনা দেন, মুক্তি দেন। মূক পাথরের বুক চিরে শত ধারায় ঝর্ণা নিপতিত হয়, এর শব্দ মাত্র শুনি। কবি এর ভাষা দেন ; সুরসঙ্গীতে মুক্ত করেন পাষাণ কারা থেকে। সমুদ্রে ধাবিত করে মুক্তি দেন।

আত্মীয় স্বজনের প্রিয় স্মৃতি বিসর্জ্জন দিতে দিতে আমরা যখন মরুভূমিতে এগোতে থাকি...... মরুপথে শিল্পীরা কোমল আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে গানের কলি ফোটান ; তাঁদের এই অবদান ধুনুমুনু গ্রহণ করে । কিছুক্ষণ হলেও শিল্প ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করে মন - শতধারায় স্নাত হয়ে অন্তরহবিকে স্মরণ করে।

লিখেছিলাম - ধুনুমুনুব বিগত জীবনের দিকে চেয়ে দরবারী সুরে একটা গান ; তা এখানে লিখছি । নিশ্চয় সে শুনতে পাবে ।

অন্তরহরি - অন্তরহরি - অন্তরহরি,
আও প্রীতম জীবন সাথী জিয়া ঘবড়ায়
তুম সঙ্গ জনম জনমকি বন্ধন,
ফিরভি কিঁউ মেরে শুনি পড়ি জীবন,
জীয়া ঘবড়ায় মেব জীযা ঘবড়ায।
লোগ কহে মুঝে ম্যাঁয় পরনারী,
ম্যায় মৈঁ তো তেরি, ম্যায়তো তেরি,
জীয়া ঘবড়ায়।
নীল গগন অপার সমুন্দব,
ঐ সেহী তুমহো হে শ্যাম সুন্দর,
তুম পে ম্যায় হুঁ লহেরি সমান
রহা হৈ আঁসু - ছলক ছলক কর।
আও প্রীতম জীবনসাথী
জীয়া ঘবড়ায়, জীয়া ঘবড়ায়।

ধুনুমুনু ও তার সঙ্গীত অবতারণা করার পূর্বে লিখেছে - সঙ্গীতের ভাষা কবিতার ভাষা থেকে কিছু আলাদা। সুর অবলম্বন করে যারা লেখেন, তাঁদের রচনা সুরে সুরে মোহময় হয়। ফুল মত নির্য্যাস বহন করে নিবেদিত হয়। সুর - আসঙ্গ, মোহনীয়া মরমিয়া। মেঘের মত অন্তর আকাশে যতক্ষণ থাকে - এর বন্ধন থাকে না; যখনি পুঞ্জীভূত হয়ে মাটির আকর্ষণে নেমে আসে, মর্ত্তভূমির সংস্পর্শে ভাষার সমাবেশে ছন্দায়িত হয়ে আবদ্ধ হয়ে যায়। তখন সেখানে আনন্দমাত্র কেবল থাকেনা, বিলাপও থাকে।

সঙ্গীত রচয়িতাদের গান পড়বার জন্য লেখা হয় না । সঙ্গীতের স্থান সীমিত থাকায় সঙ্গীত

পুস্তক খুব কম লোকে নেন। শিশিরসিক্ত শিউলী যেমন ঝরে, তেমনি গান পড়ে থাকে মনের সমাধিতে ; ঐ সঙ্গীতগুলোতে প্রাণসঞ্চার করেন গায়করা। সর্ব্বসাধারণ থেকে শিল্পীরা কিছু আলাদা, তাঁদের কার্য্যাদি, রংয়ের খেলা, সকলকে আকৃষ্ট করে কিন্তু আড়ালে থেকে গেছেন অনেকেই। গায়কের কণ্ঠে, তাঁদের দরদে, যাঁদের রচনা প্রকাশ পায় তাঁরা আমার মত নগণ্য নয় কিন্তু সুরকাররা, গায়করা, কণ্ঠে ধারণ করে সুখ্যাতি লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, গেয়েছেন বিশ্বের গান, তিনি মুক্তকণ্ঠ। আমার গান নীড় হারা পাখীব রব মাত্র। ধুনুমুনুর কথা মাঝে মাঝে আমার মনে উঠে ; তার কবিতাও পাঠ করি - আর হাসি। কবিতা পুস্তকের নাম কল্লোল ওতে পরিচ্ছেদ আছে। কলহ কোলাহলে নাম বজায় রেখেছে। ছন্দোমিল দিয়ে লেখা হলেও আবৃত্তি করার মত নয়। তবু বলতে হচ্ছে সে কবি ; তা না হলে রাগ করবে যে । সাহিত্যের পুষ্পিত ভাষা, ভাব, তেমন দেখা যায় না।

দীপ্তি নায়িকাটি যা লিখেছে - তা নাটকীয় ঢঙে পড়তে হয়। কলহেব নমুনা রাখছি, কেন হসলাম তা বুঝতে কষ্ট হবে না। আরম্ভ ঠিকই ছিল, ক্রমে ক্রমে বদলে গেল বিষয় ও ধরণ, শেষটায় দেখছি আত্মসমর্পন করল।

কল্লোলে দার্শনিক মত ছিল আরম্ভটা, তারপর কি হতে কি হয়ে গেল। কালের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কোলাহল সৃষ্টি হয়েছে ; বেচারা ধুনুমুনুকে এরজন্য দোষী করা যায় না।

ধুনুমুনুর গানের খাতায় দেখলাম তার সঙ্গীত শিক্ষার নমুনা, সে লিখেছে - প্রথম পর্ব্ব আমার বয়েস তখন ১০/১২ ঐ সময় দিদিরা ব্রজবিহারী দেববর্মার ('লেবুকর্ত্তা দাদু') কাছে গান শিখত। আমি কিছু দূরে বসে থাকি, কারণ- বেসুরা বেতাল যে ; কিন্তু ত্রিপুবাব গানেব প্রভাবে প্রভাবিত ছিলাম । দাদুর স্বর মিষ্টি লাগত, তিনি অনেক বাদ্য বাজনা বাজাতেন ; আমাদেব বাবার বন্ধুব্যক্তি ছিলেন, বাবও বাদ্য - বাজনা, সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ছিলেন।

দিদিরা যখন গাইত আমি হাসতাম কিন্তু যাতীদি, মল্লিকাদি গাইলে হাসতাম না। মল্লিকাদিদিটি আমার সমবয়সী, তার স্বর খুবই মিষ্টি, দরদ দিয়ে গাইতে পারত ; তালও রাখে দেখলাম।

অন্যদিদিরা আমাকে একদিন ধরে বসল, ওরা গাইলে আমি হাসি কেন? কারণটা কী? ওরা আমার উপর বিরক্ত হল , বলেছিলাম কাঁদব না কি? দাদুর মত স্বর যে তোমাদের বেরুচ্ছে না। মল্লিকাদি গাইলে ভাল লাগে, যাতী দিদির মতও তোমরা গাইতে পারছ না। আমার কথায় ইন্দিরাদি বললেন - তুমি ত গাওনা বসে বসে গল্প কর, নিয়ম মতও আসনা। গান বাজনা ভাল না লাগলে যাওনা, কে শুনতে বলছে আমাদের গান। ঐ দিদিটা কিন্তু দু-একটা যন্ত্র বেশ ভাল বাজায়।

ও আমাকে যাও বলাতে - সত্যি সত্যি গেলাম।

(দ্বিতীয় পর্ব) একসময় রাধাশ্যাম মন্দিরে কীর্তনীয়া দলে যোগ দিলাম। আমাদের দাদা অরুণ সেখানে গান শেখান । পিসীমারা ও আরো অনেকে গাইত, দোহার ধরত ; আমিও ওদের দেখাদেখি দোহার ধরলাম।

অন্তঃপুরে অনেকের চেয়ে আমার স্মরণশক্তি খুবই বেশী ছিল, কিছুদিনের মধ্যেই সবগান মুখস্থ হয়ে গেল। ভাবপ্রবণও ছিলাম বোধ হয়।

যখন আমি কীর্তন গাইলাম, দাদার চোখে জল দেখেছি ; পিসীমারাও শেখাতে লাগলেন ওদের নাটকের গান, যা ওঁরা একসময় গেয়েছিলেন। আমি ওসব গান আজও ভুলতে পারছিনা। ওঁরা তাঁদের গান আমাকে দিয়ে গাইয়ে শুনতেন। আমি নাকি গানের মানুষ, নিজের মত করে গাই।

(তৃতীয় পর্ব) ক্রমে ক্রমে, অন্তপুরে হোলী দল হল। দাদা হেমন্ত আমার দলে শিক্ষা দিতেন। বাইমনা যাতী আমাকে উৎসাহিত করতেন। আমি যাতীদিদির দলে ছিলাম, মল্লিকাদি ছিল দলনীদির দলে। দিদি পুলিনা, দিদি দলনী- মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্রের নাতনী। তাঁরা কলিকাতায় বেথুন কলেজে পড়াশুনা করতেন। আগরতলায় যখন তাঁরা দাদু নবদ্বীপের সাথে আসতেন, আমাদের সাথে অন্তঃপুরে থাকতেন। বাইমনা পুলিনা সুশিক্ষিতা ছিলেন, বেথুন কলেজের অনেক গল্প আমাদের বলতেন ; তাঁকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল। অন্তঃপুরে আমাদের নাটকে যোগ দিতেন, হোলীতেও ছিলেন কিন্তু গাইতেন না। আমাদের দাদারা অনিলকৃষ্ণ দেববর্মার নিকট সঙ্গীত বাদ্য শিক্ষা পেয়েছিলেন, ত্রিপুরাতে অনেকেই ঠাকুর অনিলকৃষ্ণের ছাত্র। দাদা হেমন্ত কিশোর বরাবর আমার পক্ষে - থাকতেন, সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, বাইমনা যাতী আমাকে উৎসাহিত করতেন। দাদা হেমন্ত সেতার বাজান, তিনি যখন সঙ্গীতে আড়ি লাগিয়ে দিতেন - আমি ঝগড়া করতাম ; এমনিতে আমি বেতাল, তার উপর ঐসব আড়াআড়ি, আমি গাইতে পারব না। আমার আপত্তি শুনে রথীন্দ্রকিশোর বলেছিলেন - যাওনা কীর্ত্তনীয়াদের খোল কর্তাল নিয়ে দল কর।

একে দিয়ে ক্লাসিকেল সঙ্গীত চেষ্টা করনা হেমন্ত, ঢোলক বাজাক- ব্রজলাল।

কিন্তু ঐ যে বললাম স্মরণ শক্তি ? কোন গানে কোন শব্দে ফাঁক তাল পড়ছে, তা মনে রেখে দাদা হেমন্তর গান গেয়েছি ; দাদার সুরের জন্য আমার দলের গান ভাল হতো।

শচীন্দ্র কর্ত্তা ও দু চারটা গান শিখিয়েছিলেন ওসব আমি নিজের ইচ্ছেমত গাইতাম. তিনি তা শুনতেন।

(চতুর্থ পর্ব) দাদা মহারাজ আমাদেব গান শেখালেন নাটকের জন্য ; আমরা রিহার্সেল দিতে লাগলাম। অল্প সময়ে গান সুর শিখে ফেলতাম। বলিন্দ্রকিশোর বলেন- এর নিজস্ব ধরণ আছে। বলেছিলাম - ধরণ-টরণ কী, যেমন শিখিয়েছেন তেমনি গাইনি ? আড়ি দিতে হচ্ছে না, বেশ আরামে গাইছি। তুমিও সহজে বাজাচ্ছ ; আমার কথায় তাঁরা হেসেছিলেন।

(পঞ্চম পর্ব) প্রথম যেদিন আব্দুল করিমের গান শুনলাম - রেকর্ডে ; এমন ভাল লাগল - এ যেন অন্তর নিংড়ে গাওয়া । আমি গাইতে চাইলাম, কথা দিয়ে সুর ধরতে চেষ্টা করতাম। শুনলাম ভজে বুয়ার গাওয়া বৃদ্ধকালের গান। বুঝাতে পারব না এ যে কী। অনেকে বলল ওরকম করে গাইবে নাকি ? 'তাঁরা হাসল' আমি হাসতে পারলাম না। তাঁর মত গাইতে পারলেও জন্ম সার্থক হতো মনে হল।

(ষষ্ঠ পর্ব) গান গেয়েছিলাম, তারপর- যে রাম - সে রাম হঠাৎই একদিন তা, না, রি ব্যাখ্যা শুনলাম। তারপর ঐ অন্তরহরির 'সংক্ষিপ্ত শব্দ' আমার কণ্ঠে দরবারী সুরে এসে বসল। দাদা হেমন্তকে আমার গান শোনাতে চাইলাম কিন্তু আজ আর কেউ নেই আমার গান শোনার জন্য।

আমি বুঝতে পারছি অন্তরহরির কৃপা।

শতবর্ষ আগে যেসব গান গাওয়া হয়েছিল - তা নূতন শব্দে, নূতন চেহারা নিয়ে আমার স্মৃতিতে সুর তুলল। যাবার বেলায় গানগুলো আমি রেখে যেতে চাই, ইতিমধ্যে কণ্ঠ যদি রুদ্ধ না হয়।

হে অন্তরহরি, হে সর্ব্বাত্মা, তুমি আমার গান শুনছ! বিদেহীরা কি গান শুনতে পায়?

আমার সঙ্গীত মহাকাশে মিশে যাবে, অশ্রুত থাকবে, এ দুঃখ নিয়ে সমাপ্ত হতে চাইনা। আমি যে রেখে যেতে চাই কিন্তু কার কাছে, জানি না।

আমি যে হারানিধি হঠাৎ পেয়েছি; পাষাণ কারা দীর্ণ করে ঝর্ণা নামল যে! অন্তরহরি কৃপায় পাষাণী - উদ্ধার হল। হঠাৎ গাইতে পারছি - মালকোষ, বেহাগ , ললিত, দরবারী.....। কেন ভুলে গিয়েছিলাম? গাইতে পারলাম না কেন? মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল কি আমার অন্তর আত্মা? আজ ধুনুমুনু গাইছে, আমি শুনছি -

আমি যে তোমার, আমি যে তোমার
মরমের মরমিয়া আমি যে তোমার।
কেন কর অভিমান হে ব্রজনারী
ছাড় ছাড় অভিমান সবি যে তোমারি
আমি যে তোমার, আমি যে তোমার
বহে যমুনা ধারা তোমারি তরে,
নাও নাও প্রিয় গাগরী ভরে।
কমল নয়ন খোল, শুধু একবার বল -
আমি যে তোমার বল
আমি যে তোমার।।

কল্লোল

অন্তহীন আকাশের নীরবতায়
সাগব কল্লোল তুলে কত কি বলে।
উদয়ালোকে সোনালী প্রান্তরে খাটি
তরঙ্গে তরঙ্গে এগিয়ে আসে
যেন ব্যকুল উচ্ছ্বাসে।

উদ্বেল হয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠেছে
মহাশব্দে ভেঙ্গে পড়ে কুলেতে এসে।
অসহ্য যেন সীমাবন্ধন, সাগরে উঠিছে ক্রন্দন,
দিশাহারা পাগলপারা, জানিনা কিসের তরে ।
আছাড়িয়া পড়ে বালুচরে।

দেখি প্রখর আলোকে নীলের খেলা অবিরাম,
কোথাও যেন নাই তার বিশ্রাম।
ভয়ঙ্কর সুন্দর উন্মাদ সাগর
আকাশ ছুঁইতে চায়, বৃথা প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়,
তাই যেন হাহাকার তার শোনা যায়।

আঘাতে সংঘাতে গর্জ্জন উঠিছে ক্রমাগত,
মনেরে- আচ্ছন্ন করে ঘুমের মত.
দিবা অবসান প্রায়, সাগর লোহিত করে
অস্ত যায় রবি, লীলা রং মুছে যায় সবি।

নিশুতি রাত, শুনি দূর হতে যেন অশান্ত বিলাপ
আরো নির্জ্জন করে বিনিদ্র রজনীরে।
বাক্যহারা বিদেহী চেতনা জেগে থাকে,
চেয়ে থাকে অগণন তারাগুলোর দিকে।

পৃথিবীতে সারারাত সারাদিন, আছে কোলাহল,
আছে উত্থান, পতন, আছে বহু যুগের ইতিহাস,
সাগর তা ব্যক্ত করে - যেন দীর্ঘশ্বাসে।
চুপি চুপি বলে এসে, মনের খুব কাছে।

ছড়িয়ে দিয়ে ঝিনুক শঙ্খ কত কি....
খুলে দেখায়- পৃথিবীর জন্ম ইতিহাস
ছায়া ছবির মত, বিচিত্র চিত্র কত ;
সাগর তরঙ্গে দেখি- রঙ্গ শত শত।

অহরহ শব্দ তার বিস্ময় জাগায় ;
ঐ শব্দে, ঐ তরঙ্গে, মন যবে গেল ডুবে,
বিলাপ বলে মনে হল ; তখনি স্বর (-)
সঙ্গীতে পরিণত হয়ে গেল।

ভাষার বন্ধনে সুর খাঁচার পাখী মত,
ডানা ঝাপটিয়া - কত কথা বলে বিলাপিয়া।
স্মরে পাখী নীলাকাশ, সবুজ বনছায়া,
বুঝি, তার অভিব্যক্ত মানস যন্ত্রণা,
বুঝি- কত সে যাতনা।
অনুভব দেয় স্পন্দনে, আত্ম জাগরণে।
যবে গান শেষ হয়ে যায় - থাকে আবেশ
এ যেন মেঘে ভারাক্রান্ত আকাশ।

আমাদের হাসিকান্না -জীবন তরঙ্গে উদ্বেলিত,
ভাষাতে প্রকাশ তা হতেছে সতত ;
সাগর রত্নাকর, এত সম্পদ, এত বিশাল,
এত শব্দ যার, - কথা নাই তার।
অশ্রুত কান্না-হাসি চিত্রে পরিস্ফুট হতে দেখা যায়,
দেখা যায়- স্বপ্রকাশ। তোমার আমার ভাষাতে-
জানাজানি, কানাকানি, মাত্র হয়।

মধুর বীণার স্বর শ্রবণ রমিয়া যবে-
প্রবেশে অন্তরে, অশ্রু কেন ঝরে ?
আকুল কেন করে ?
সৌরভ ছড়ায়ে ফুটে যবে কলি,
কেন গুঞ্জন তোলে অলি ?

দেখি বিশ্বময় সুরের অমোঘ ব্যঞ্জনা,
সেখানে থাকে না কোন প্রতারণা
সুমধুরে বাণী যবে বলে ভালবাসি,
ঐ একটি কথা, বিশ্বেরে মোহিল কি ?
যমুনা ধারা - অন্তরে বহাল কি ?

দেখি বিন্দুতে পরিতৃপ্ত সিন্ধু,
তোমাতে, আমাতে, অপাব আনন্দে
এ যেন অমৃত এক বিন্দু।

বিশ্ব কি রূপ পেল - ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাকারে ?
পরিতৃপ্তি তরে ? সঙ্গীত কি তাই
রূপ পেল মধুরে ?

সমুদ্রের বিশালতা - অসহ্যতা,
সেও নিজ বিশালতা হতে
বিন্দুতে পরিণত হতে চায়
শত চূর্ণ হয়ে তাই যেন
আছড়ে পড়ে, বালুচরে।

অশ্রুকণা মত মুক্তা বিন্দু শত শত
থাকে তা ঝিনুকে। তেমনি এ ধরিত্রী
বড় একটা ঝিনুকের মত।

আমরা বিশ্বের বুদবুদ, বিশ্বেতে হতেছি বিলীন ;
অনেকে বলেন - তা নির্ব্বাণ। তা কি নিভে যাওয়া ?
অথবা বিশ্ব অঙ্গে পরিশূণ্য হওয়া ?
দর্শন বলে - আমি অনন্তধারা, অনির্বান আলো,
চেয়ে দেখ - বোধি বৃক্ষ, দেখ এর জীবনচক্র,

অমৃত সন্ধান দেয় নাকি তা ?
তবে কেন কাঁদি ? জান কেন কাঁদি ?
আমাদের ঘর ভেঙ্গে যায়, ভেসে যায় বলে ;
ওটা যে প্রেমের আধার, প্রিয় পরিজন বেষ্টিত চেতনা ;

তাই কান্না শোনা যায়।
আমাদেরও বুকে থাকে মুকুতা সঞ্চয়।

কলহ

"ভালবাসি" আমি বুঝিনা ওসব কথা ।
"অবুঝ তুমি, সোনার খাঁচায় আছ নিজ কারাগারে,
আমার ভালবাসা বুঝবে কি করে।"

তুমি নিরাধার, তোমার ভালবাসার কথা -
সঙ্গীত - মত শুনি, তুমি একজন গুণী
তা আমি মানী।
"শতরূপে ভালবাসি, কাছে কাছে আছি,
তবু অবিশ্বাস? এ কি পরিহাস!"

তোমার শতরূপের ছলনা,
আমি তা ভালবাসি না,
বহুরূপী হয়ে - আমায় ভালবাসতে এসোনা।
"বেশত, তুমি আমি এক হবো, এক কথা কবো,
এক সুরে গাইব, ব্যবধান আর থাকবে না,
খাঁচার বন্ধনও আর রবে না।"

বা রে, কি অনাসৃষ্টি কথা......... !
তোমার আমার বলে থাকবে না কিছুই?
তা হলে ভালবাসবে কাকে, নিজেকেই?
স্বার্থপর! ভালবাসায় মিশে যেতে চাও,
তাই এমন চালাকির কথা কও।
যারা তোমায় চায় যাওনা তাদের কাছে,
থাক এক হয়ে, আমার কাছে এসো না,
ওসব কথা আমি পছন্দ করিনা।

'জানি জানি, আমার হতে তুমি চাওনা,
আমাকে বিশ্বাস করনা, ভালবাস না।
আমার অশ্রু মুক্তমালা রাখ তোমার বুকে,
থাক তুমি সুখে, একবার শুধু বল -
আমায় ভালবাস ; কোন দুঃখ রবেনা।

ওরকম যদি বল, আমি হাসি কেমন করে,
আমি কি তোমায় ভালবাসিনা?
ধনজন -মনে সবই দিতে চাই ; শুধু এ খাঁচাটি
আমার নিওনা। এ তোমার যোগ্য নয়,
তাইত দূরে দূরে রই, আমায় ভুল বুঝো না।
চিরবসন্তের পাখী তুমি, থাক নিকুঞ্জ কাননে ;
তোমার কুহরণে ভাঙ্গবে যবে ঘুম সুখ শিহরণে-
সেদিন আমায় নিও তুমি সত্যের সন্ধানে।।

মাঘ চতুর্দ্দশী

আজ জন্মোৎসব সেই রাজকন্যার ।
ওরা জানে না, ধান দূর্ব্বা আশীর্ব্বাদ-
সব ব্যর্থ হবে, জমাট বাঁধা চোখের জল শুধু
ওর জন্য রবে।

দুর্বার যাব গতি, স্নেহ মমতা বন্ধন ছিন্ন করে দেয়,
যে- শোনে না পথের বাধা কোন অনুনয়,
দেখেনি পিছু ফিরে - ফেলে গেল কারে,
ধান দুর্ব্বা আশীর্ব্বাদ তার তরে?

শ্রাবণ রজনী কাঁদে মনের গহনে যাঁর,
যে শোনে কান্না, শুধু কান্না অনিবার,
জন্মোৎসব পালিত হয় তার।
যে ভুলে গেল হাসি গান, যার মুষ্টিতে কৃপাণ,
ছিন্ন করে দিল সমাজ -শৃঙ্খলা, ফেলে দিল -
মন্ত্র পড়া বিবাহের মালা।

নারীর নম্রতা যার নাই, দৃষ্টি যার আকাশের দিকে,
আশীর্ব্বাদ শুভেচ্ছা কেন জানাও তাকে !
সার্থক হল কি জন্ম, তোমাদের রাজকন্যার?
উত্তর কেউ দিল না ; অবাক্ হয়ে তারা চেয়ে থাকে
আমার দিকে।

যে নিষ্ঠুর পরিহাসে, জীবনকে ভালবাসে,
তার জন্য এতো আয়োজন?

সে ত ফিরেও তাকাল না, ছিল না যে কোন প্রয়োজন।
কাঁদাল অনেকেরে তার খেলাঘরে,
নিজেও কেঁদেছিল স্বপন ভাঙ্গার পরে,
ছিল রূপের বাহার, মনিমুক্তা - হার,
যা বুকের তাপে গলে গেল - পাথর গলা জলে।
তবু শোনা যায় তার খল খল হাসি- নির্ঝরের মত।
সবার আড়ালে - ছিল তা অশ্রু বিগলিত।
একদা ছিলাম মুগ্ধ আমি - তার রূপে,
তাই তাকে ভুলিতে পারিনি, আমায় যেন গ্রাস করেছিলো।
তাকে অনেকেই বলেন - গল্পের রাজকন্যা রূপকথার মতো
হাসলাম আমি, বললাম তাঁদের, আমার মত নযত?
তখন তারা চুপটি করে আমার দিকে চান,
চেনা - অচেনা আলো- আঁধারে অবাক হয়ে যান।

বন্দী নারী

স্বাধীনতা কারাগারে লৌহ শৃঙ্খলে রাখে বাঁধিয়া আমারে ;
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ঘেরা আমার জীবন, কেহ নাই
সঙ্গী সাথী বন্ধু পরিজন।
অজ্ঞাত দুর্গম পথ, চিন্তা স্রোত বহে নিরন্তর,
কলঙ্ক পৃথিবী ——ছায়া ——গ্রাস করে আমার অন্তর।
শুনি- শক্তিধারী মানুষের উন্মত্ত চিৎকার,
ক্ষীণতর করে দেয় দূর্বলের চিত্ত হাহাকার,
চোখের জলেতে তাই সমুদ্রের ঢেউ লাগে,
তিমির তরঙ্গে আজ আত্মা মোর জাগে
অশরীরী হয়ে স্পন্দনে জেগে আছি,
নিশিদিন বাজে - অন্তর্যামীর বাঁশী।
রাত্রি অন্ধকার, ক্ষণে ক্ষণে
অসির চমক্ লাগে অন্তরে আমার।
অসি ও বাঁশীর মায়ায়, জন্মমৃত্যু আলো ছায়ায়
চলিয়াছি আমি ; হে সুন্দর, হে মৃত্যু
তোমারে প্রণমি।।

যাঁরা নিবেদন করেছিল প্রাণ
আমি, আমি একটি পিঁপড়ে। বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে
আমার একটা ছোট ঘর, ছোট জানালা,
তা থেকে দেখছি, শুনছি, ভাবছি অনেক কথা ..,
ভারত মাটির স্তরে স্তরে পড়ে আছে দেখলাম
পবিত্র সজল ব্যথা।

যারা প্রাণ দিল, শেষ বার কেবল বলেছিল
বন্দেমাতরম্। তাদের ছিলনা অন্য কোন কথা।
"বন্দেমাতরম্" ঐ শব্দ তাঁদের কণ্ঠে
অমূল্য রত্ন, চোখে তাঁদের ছিল মুক্তির স্বপন।

'আমার বলে - কিছু ছিল না তাঁদের,
ছিল অতুলনীয় আত্মত্যাগ,
মিটিয়ে দিল মহাক্ষুধা হিংসার।
সমর্পণ করেছিল প্রাণ - ভারত মাতার কোলে,
তারাই সার্থক ভারতরত্ন, সার্থক তাদের প্রয়াণ।

ভোলা যায় না, ভোলা যায় না, ভুলে যেতে আমি চাই না,
রাখি অঞ্জলী শতধারা অশ্রুজলে,
এ নয় পুরস্কার, নয় ভক্তি অর্ঘ্য, এ যে
স্নেহ ভালবাসা মা ও বোনের। এখানে বিচার তর্ক নাই,
নাই কোন যুক্তি, নাই নিন্দা প্রশংসা। আছে কেবল
অন্তর বেদনা ভেজা মাটি জলে। ওরা আমাদের
আপন জন, ভারত মাতার ছেলে।।

কোলাহল

প্রগতি

চলতে গিয়ে পড়লাম ফাঁদে
বদলে গেল জীবনটা, মনটা তখন কাঁদে।
কোথায় গেল দেশের বাউল, কোথায় কীর্ত্তনিয়া,
মোদের জন্য রইল শুধু তাঁদের চোখের জল,
অরকেষ্ট্রা বেজে উঠল, এল নূতন দল।

যাক্ গে, কি হবে আর ওসব কথা ভেবে,
গেলাম দাবাখেলা ক্লাবে। দেখলাম -
অনড় হয়ে যাচ্ছেন রাজা, নড়বার উপায় নেই।
বোড়ের চালে ধরা পড়লেন মন্ত্রী মহাশয়।

রইল কেবল হাতী ঘোড়া, তবু চলছে খেলা
ছলে বলে ; আমি দেখছি তা কৃতুহলে.....,
না, আর বসা যায় না। চললাম যখন বাড়ীপথে,
দেখা হল বন্ধুর সাথে ; বললেন তিনি
ওরে ভাই, কোথাও শান্তি নাই।

কেন, কী হল আবার ? ভাঙ্গল কপাল কার !
বললেন - ধস্তাধস্তিতে ভেঙ্গে গেল ঘর সবার।
তাই নাকি ? ভাঙ্গল কে কার ?
চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন বন্ধুবর,
আমরাই ভাঙ্গলাম - আমাদের ঘর।

বেশ, বেশ, ওতো খুব ভাল কথা ;
নূতন করে গড়তে হলে - ভাঙ্গতে হয় নাকি,
একেই বলে নাকি 'রিভল্যুসন' এ অর্থ হল
পরিবর্তন, ঘোর পরিবর্তন।

বন্ধু বললেন, মরে গেল যারা, ফিরে ত আসবে না তারা,
হিংসার আসনে বসে - শ্মশান রাজত্ব চাইনা।
অমঙ্গলে হবে কি আনন্দ স্থাপন ?
'রিভল্যুসন' রাখুন রাখুন ওসব বিদেশী কথা,
আমরাই হচ্ছি এখন বলির পাঁঠা।

বললাম ঐ কথাটা মনে ধরল না বুঝি ?
পরুন গিয়ে অহিংসার টুপী সোজাসুজি।
বন্ধু বললেন - আপনার কথা আমি শুনছিনা,
দাবা খেলা ত মোটেও জানেন না।
কোনটা রাজা, কোনটা মন্ত্রী, তাও তো বোঝেন না ;
মন্ত্রীকে বুঝছেন রাজা, বলছেন - বাদ পড়ে গেল,
খেলা দেখতে দেখতে আপনার সময় বয়ে গেল।

নাই বা চিনলাম রাজা-মন্ত্রী; রাণীকেও অনেকে
মন্ত্রী বলেন, হাতীকে বলে ক্যাসেল। রাজারাও
আজকাল মন্ত্রী হতে চান, কিছু সুযোগ পান,
দেখলাম ত মগজের খেল।

'দাবা খেলা, খুব মজার খেলা'
তাই খেলার নেশায় ওদের বয়ে যায় বেলা।
বোর্ডে দেখলাম - রাজার মাত্র এক পা ;
এদিক সেদিক নড়েন চড়েন, আত্মরক্ষা করেন ;
মন্ত্রীর সর্বত্র গমন। মাঝে মাঝে বোড়ের চালে
যখন ধরা পড়েন - তখন বাদ পড়েন।

রাজাকে করতে হবে বন্দী, চলতে থাকে ফন্দি,
দু একটা বোড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে,
মন্ত্রীর স্থানে বসে মন্ত্রী হয়ে যায়, দাপট খাটায়।

আর এক রাজার পিল ক্যাসেল যখন থাকে না,
তড়াক করে রাজার সামনে এসে পড়ে ঘোড়া,
রাজা পড়ে যান ধরা। দীর্ঘকাল ধরে এ খেলাটা চলে,
শেষ হয় রাজা মাত হয়ে গেলে।
এখন ভেবে দেখ - বোড়ের চালটা,
কেমন করে মন্ত্রী হয়ে বসল ওটা।
আমার সময় নষ্ট হল বটে, কিন্তু -
যাঁরা খেলেন, তাঁরা তামাক টেনে বলেন,
" চেক্" আত্মরক্ষা কর - যদি পার।

রক্ষা করতে চেষ্টা হতে থাকে....... ;
'শেষটায় ড্র হল নাকি খেলাটা ?'
তুমি ভাব - বসে বসে, সেটা ;

আমি বাড়ী ফিরছি - নিয়ে অভিজ্ঞতা।
দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা কথা বলে যাও ;
কোন দিন কি খেলনি? মাত করে দাওনি?
খেলেছিলাম, নিজেই মাত হয়ে গেলাম।
হাতী ঘোড়া সবই আছে, রাজাটা আমার নাই ;
এরি দুঃখে প্রাণটা আমার যায়।
কোনমতে মনে রাখছি - মুখে হাসি টেনে,
কি আর হবে বল আমার কথা জেনে।।

দশ অবতার নৃত্য

তাকধিন তাকধিন বাজে, নাচে সবে মিলে এক সাথে,
তাকধিন তাকধি বাজেরে।
রাজা-মন্ত্রী একসাথে করি মন্ত্রণা,
তবুও গেল না কেন পেটের যন্ত্রণা।

১ম জোকার ঃ মৎস কুর্ম্ম বরাহ, নরসিংহ- অবতার,
ক্রমেতে প্রকাশ দেখ - বিবিধ আকার,
জল সাপ্লায় দেবার তরে, মিন রূপে কেলি করে,
কাজের বেলায় হন কুর্ম্ম অবতার।

২য় জোকাব ঃ লেকচার দেবারকালে নরসিংহ রূপ ধরে,
ভোটের বেলায় হন 'বামন' খর্বাকার।
পিতৃসত্য রক্ষা তরে, এয়ারকণ্ডিসন গাড়ী চড়ে
যান বনবাস, ঐ দেখ তাহার নিবাস।

৩য় জোকার ঃ রাম রাজত্বে বাস করি, কারেও নাহি ডরি,
কিন্তু হায়রে কপাল ! গরিবী হটাতে গিয়ে
বাড়িল জঞ্জাল।

৪র্থ জোকার ঃ আমি হাল ছাড়া হলধর চালাই ট্রাক্টর,
তবু ফসল ফলাতে নারি এ দোষ কার
বিমুখ হলে দয়াল হরি, কি আর করতে পারি,
অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষে হাহুতাশ করি।

৫ম জোকার ঃ এত বিধির বিধান, কারুর দোষ নাই,
আমাদের আছে যথেষ্ট সুনাম।
অহিংসায় বুদ্ধ মোরা কিন্তু কল্কি অবতার,
ছারখার করিয়াছি ভবিষ্যৎ সবার।

সকলে ঃ রাজা মিছে, মন্ত্রী মিছে, মিছে সর্বজন,
একমাত্র সত্য দেখি - মানুষের মরণ
তাক্‌ডুম তাক্‌ডুম বাজেরে।।

সম্ভবামি যুগে যুগে

বার বার এসেছিলে আমাদের মাঝে;
তোমায় পরিয়ে দিলাম কাঁটার মুকুট,
হত্যা করলাম মহাত্মাকে।
নিষ্ঠুরভাবে সমুদ্রগর্ভে ভাসিয়ে দিলাম
মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে। তাবপবও স্মরণ করি,
তোমার চরণে শত দুঃখ নিয়ে, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি।

ছিল অনেক ঝগড়া, ছিল অন্তর কোলাহল,
আজ নীরব হয়ে গেল যে সব, শুধু থাকল চোখের জল ;
আমরা যে - সর্ব্বহারা দল।
কাঁটাগাছে যদি ফুল না ফোটাও, চরণে তোমার কি দেব,
বল - কি দেব!
আছে অশ্রু, আছে মর্ম্ম ব্যথা, সর্বস্ব যে তা,
তাহাই কি তুমি নেবে?

না, না, তা যে আমার সহিবে না, সহিবে না,
কাঁদায়ে কেঁদে যেওনা, যেওনা,
তোমারেই ভালবাসিয়াছি আমি সর্বরূপে, সর্বনামে,
ছিল তোমার সাথে আমার ঝগড়া কারণে - অকারণে।

অসহায় আমি, অসহ্য জীবন, বিচ্ছেদ ছিল তোমা সনে,
তুমি ত জান -হে প্রিয়তম, কি ব্যথা ছিল মনে।

বুঝিতে পারিনি, সর্ব্বদা ছিলে কাছে,
ভেবেছি দূরের বন্ধু, অপার সিন্ধু,
ভেসে গেল আমার তরণী
ভেসে গেল বক্ষলগ্ন মনি।

বিশাল বিশ্বে আমি - একফোঁটা অশ্রুকণা,
রচিলে -দুঃখময় জীবনকাহিনী ;
তব সিন্ধুসম ভালবাসা, বুঝিতে পারিনি।
উল্লাস বিদ্রূপ - জেগেছিল হৃদয়ক্ষতে,

তুমি কেঁদেছিলে শত চোখে, অভিমানে ফিরে দেখিনি।

অপমান-লাঞ্ছনা, অবহেলা গঞ্জনা,
শেষ হল কি আজ?
আকাশ ছেয়ে বিপুল আকারে
ভৈরব নাদে কেন কাঁদ, কেন কাঁদ হে হৃদয় বল্লভ!
আমায় আলিঙ্গন করে।

তোমার আমাব মিলন স্পন্দনে, অশ্রু সঙ্গমে,
ফুটবে কি সেই ফুলগুলো - ধরা অঙ্গনে?
নব কলেবরে ধরণী হবে কি মনোহরা?
জননী হবে কি যশোধরা?

প্রত্যাবর্ত্তন

নিঃস্ব দিনে ফিরে এল পাখী গাহিতেছে গান,
সহসা হরষে শিহরিল মন, জুড়াইল প্রাণ।
ফাগুন এল ফিরে - স্মরিয়া কারে
মনবনে কেন গুঞ্জন তুলে অলি?
রঙে রঙে ছেয়ে গেল আমার ভুবন,
কে - গোপনে বাজায় বাঁশী, রচে - মধু স্বপন।
চাতকিনী আশা, মিটেনা মিটে না তৃষা,
পিচকারী দেয় শুধু রঙের নেশা।

ফুলেতে বাহার এল কি? মধুসে আবার পেল কি?
বিকশিত ফুলবনে শিশির কেন ঝরে?
প্রজাপতি কাঁপে কেন থরথর !
সমীরণ কেন বহে ধীরে ধীরে!
একি স্বপ্ন, এ কি মায়া, সবুজ এই বনছায়া,
ফাগুন যাবে কি বৃথা ফিরে?
না না যাবে না, যাবে না ফিরে,
যতনে রাখিব আমি - সেই পাখীটিরে।।

শিঞ্জন

নৃত্য পরিকল্পনা

ধুনুমুনু নৃত্য বিষয়ে যা লিখেছে, তা উদ্ধৃত করছি। শিঞ্জন হতে অন্তত তিনটা নৃত্য পরিকল্পনা রাখছি। ভারতীয় নৃত্যে সাবেকী বেশভূষা ও পৌরাণিক বিষয় দেখা যায় ; তা গতানুগতিক ধারায় আছে। নৃত্যে এমন অনেক মুদ্রা দেখান হয় কিন্তু সকলের বোধগম্য হয়না। যথা - ত্রিপতাকা, অঙ্কুশ চাঁদ সূর্য। প্রজাপতি, হরিণ, পদ্ম, শঙ্খ কিছুটা বুঝা যায়। শিব দুর্গা মুদ্রা বুঝতে হলে দস্তুর মত আগে থেকে ইঙ্গিতার্থ জানা দরকার হয, সর্ব্বসাধারণের জন্য তা সম্ভবপর নয়; একাবণে আনন্দ বিধানের জন্য বিষয় বর্ণনার সঙ্গে বেশভূষা ও দৃশ্যাদি রেখে নৃত্য পরিবেশন করছি।

যারা প্রকৃতি উপাসক, নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন - নদনদীর বিবিধ গতি, সমুদ্রের আলোড়ন, উড়ন্ত পাখীর পাখা সঞ্চালন, ঝড়ের মাতন, ঝর্ণার গতিবেগ, প্রজাপতির চঞ্চলতা। এসব, ছন্দে ও ভঙ্গিমায় নৃত্য বিষয়েভুক্ত করে এবং বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বেশভূষা ও দৃশ্যাদি দ্বারা বোধগম্য করার জন্য শিঞ্জনে বিশেষভাবে রেখেছি। বাদ্যযন্ত্র, বেশভূষা, নৃত্যের বিশেষ অঙ্গ। নৃত্যমঞ্চে দৃশ্যাদি বর্ণনা অনুযায়ী রাখা হলে নৃত্যবিষয় সুস্পষ্টভাবে আনন্দ দিতে পারে। আমি আশা করি কোন শিল্পীর পদক্ষেপে চরণ নূপুরে, আমার পরিকল্পনাগুলো শিঞ্জিত হবে। কবিতা ছন্দে ও আবৃত্তিতে, তদানুযায়ী দৃশ্য ও আলো এবং সঙ্গীতে শিঞ্জন তোলার চেষ্টা করেছি। নৃত্য তালিকা সূর্য্যতপা, সমুদ্রউল্লাস, মরুউদ্যান, সমুদ্র অভিসারিকা, ঝরাপাতা, ফুল ও প্রজাপতি, বাঁধনহারা বসন্ত, বাঁশী বাজে বনমাঝে, না মন মাঝে ? পৃথিবীর জন্ম ইতিহাস, লীলাময়, কৃষ্ণরূপা 'মহারাস' তুফান বিদ্যুত, সাপুড়ে ও সুপ্তকামনা, সাবরী গীতিনৃত্য, বাউলনৃত্য, কুমারসম্ভব, উর্ব্বশী। উল্লেখিত তালিকা হতে কিছু নৃত্য এই পুস্তকে রাখছি, কারণ - এই পুস্তক 'খেলাঘর' বোধ হয় আমি ছাপাব , আর সব পুস্তক ছাপা হবে কিনা জানি না। অন্ততঃ কিছু হলেও থাক্ এখানে। অতীত কাহিনী মত, ভবিষ্যতে কেউ হয়ত নাচবে, গাইবে, আমার নৃত্য সঙ্গীত ; এ আশা করা যায় নাকি ?

সমুদ্রউল্লাস

নির্দ্দেশনা ও দৃশ্য

সাদা ঝকঝকে বেশভূষায়, মণিমুক্তা অলঙ্কারে সেজে, দিগন্ত রেখা মত শিল্পী থাকবেন দুবাহু বিস্তার করে। একটা পেছনে একটা সামনে সোজা রেখে ; বুক দিয়ে মাটি স্পর্শ করে বসবেন। নেপথ্য হতে বীণার সুরে সুরে চাঁদ যখন উঠবে, রূপোলী প্রান্তরেখাটিতে তরঙ্গ উঠবে। শিল্পীর বাহু দুলবে ঢেউয়ের মত অঙ্গভঙ্গি দেখা যাবে, ঐভাবে উঠে দাঁড়ালে পর - নৃত্য দ্বারা সমুদ্র বিস্তার ও উল্লাস প্রকাশ করে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে, সমুদ্রের মাতন নৃত্যে প্রকাশ করবেন। নেপথ্য থেকে শোনা যাবে কল্লোল, ঐ সময় বাদ্যযন্ত্র তুমুল হয়ে উঠবে।

বিবিধ ছন্দে, অধীব আনন্দে নৃত্য হবে , মণিমুক্তা ছড়িযে দিযে শিল্পী পেছনে হটতে থাকবেন। ভীষণ সুন্দব সমুদ্রেব বিলিযে দেওযা আনন্দ প্রকাশ কবাব পব - আবাব সেই পূর্ব্বেব মত, আস্তে আস্তে বাহুবিস্তাব কবে, ধীবে ধীবে সঞ্চালন কবে, প্রান্তবেখায এসে স্থিব হযে যাবেন। শিল্পীকে পূর্ব অবস্থায দেখা যাবে।

(নেপথ্য থেকে নৃত্যাবস্তকালে নৃত্য বিষয আবৃত্তি কবা হবে, দৃশ্য দেখা যাবে)

বাতেব আঁধাবে ঢাকা বিস্তৃত পৃথিবী, গভীব ঘুমে যেন মগ্ন, কোথাও সাড়া শব্দ নেই, শোনা যায নিশ্বাসেব উত্থান পতন, দেখা যায - অভিনব স্বপ্ন, সমুদ্রেব জাগবণ। কৃষ্ণপক্ষে চাঁদ উঠেছে - অধো হাসি নিযে , দূবে - বহু দূবে - রূপোলী প্রান্তবেখা দেখা যায, তবঙ্গ উঠে সেথায , তা ক্রমে ক্রমে এগিযে আসে ফেণিল উচ্ছ্বাসে, ক্রমে তা সাগবে পবিণত হযে যায। যেন - অসহ্য পুলকে কল্লোলিত হয, ঢেউযেব পব ঢেউ উঠে, ঝাঁপিযে পড়ে , ছড়িযে দেয ঝিনুক শঙ্খ কত কি ।

দেওযাব আনন্দে সুরু হয মাতন , এ খেলা সুন্দব ভীষণ। তাবপব উন্মাদনা শেষে শান্ত পরিশ্রান্ত, ধীবে ধীবে যেতে থাকে বেলাভূমি থেকে দূবে - বহুদূবে, সেই পাবে , ক্ষীণ বেখায রূপায়িত হযে যায।

কালেব বিচিত্র গতি বিবর্তনে সাগবেব বিশালতা বিলীন হতে দেখা যায দেখা যায সমুদ্র প্রয়াণ , চাঁদ ডুবে গেলে সব খেলা হয অবসান।

মরু উদ্যান

নৃত্য পরিকল্পনা

ঝিনুকে ছিল - ফোঁটা ফোঁটা জমাট বাঁধা জল ,
সাগব বিলুপ্তি পথে যা ফেলে গেল,
তা মুক্তা বিন্দু হযে, বামধনু প্রতিচ্ছবি নিযে,
সব হাবানো দুঃখ যেন বযেছিল।
'সেই মুক্তা' রূপসী কণ্ঠলগ্ন কবে,
শোভা পায তাব মণিহারে।

কতবঙ্গ কত ভঙ্গিমায দেখে রূপ দর্পনে,
সমুদ্রেব পবশ যেন লাগে তাব মনে,
ঢেউ খেলে গেল - তাব জীবনে যৌবনে।
উচ্ছল আনন্দে নূপুব বণিত হল,
নৃত্যছন্দে মন তাব ভবে গেল।

ঝন্ ঝন ঝন বাজে নূপুব, বীণায বাঁশীতে উঠে সুব,
শিঞ্জন উঠে অলঙ্কাবে, হাসি দেখা যায অধবে।
'সহসা ছিঁড়ে গেল মালা, শূন্য বক্ষ অনুভব কবে,

খোঁজে মুক্তা ধূলি পরে.....
এক ফোঁটা করুণ বিন্দু ঝরা ফুল মত,
ছিল ধূলিতে আচ্ছাদিত, আঁচলে তা তুলে নিল ;
অশ্রু শোধিত হল। তৃষিত হয়ে আকাশ পানে চায়,
বৃথা চাতকের আশা, মেঘ ছলনা করে ভেসে যায়।

মাটির সমুদ্র একান্ত আপন, সে করে ছিল গাহন,
ভালবেসেছিল সমুদ্রের সজলতা, আজ রূপসী হল যে বিক্তা।
উঠে ঝড় বালুকার, এ যেন হাহাকার,
ফুল ফোটে কাঁটা গাছে মরুতে ,
তা কি দুঃখ যন্ত্রনায় ? না - স্মৃতি সোহাগেতে ?
এ প্রশ্ন থাক্। মহাকাশে ফুলের সুরভি মিশে যাক্।

ক্যাকটাসের মত ভঙ্গিতে রূপসীকে দেখা যায়,
সে ফুল ফোটায়, বিভোর হয় - অন্তর ভালবাসায় ;
মরুভূমি উদ্যাণে পরিণত হয়ে যায়।

আবৃত্তি সহ নৃত্য

সমুদ্র অভিসারিকা
ঝর্ণা, এ যে ঝর্ণা ; ঝরঝর ঝরে, অঝোরে সে ঝরে,
কোন বাধা আজ মানে না।
নীরব নিথর যা ছিল, উদ্বেলিত করে কে দিল ?
রুদ্ধ আবেগে উচ্ছসিত হয়ে শতধারায় সে নেমে এল।
'ঝর্ণা, এযে ঝর্ণা, কোন বাধা আজ মানে না।

কোন স্বপ্ন ছিল কি মনে, প্রিয় বাহু বেষ্টনে ?
আঘাতে আঘাতে, ভাঙ্গল কি ঘুম ?
নির্দ্দয় জাগরণে ?
'ঝর্ণা, সে ঝর্ণা, কোন বাধা আজ মানে না।

(তবলের বোল সাথে দ্রুত তালে নৃত্য হবে)

আজ উন্মাদিনী প্রায়, স্রোতস্বিনী ধায়,
কুলু কুলু স্বরে হাসিয়া - কাঁদিয়া, দুকুল প্লাবিয়া,
কিছুই সে ভ্রুক্ষেপ নাহি করে।
কে গেল, কে এল, কারে সে হারাল, বুঝেও বুঝেনা কি রে ?
কারো কথা সে মানে না, খরতর বহে ঝর্ণা।

মরুপথে যেতে যেতে, সহসা বাজিল বাঁশী,
উন্মাদিনী হল কি বিমনা? হল কিরে নীল যমুনা?

ওরে ঝর্ণা, বিরহিনী ঝর্ণা,
অভিসার রাতে হারালি কি তুই নিজেরে?
অসীমের সাথে মিশে গিয়ে - জুড়ালি প্রাণের যাতনা।
ঝর্ণা, ওরে ঝর্ণা, সরিৎ সাগর বিলীনা।।

(ঝর্ণাতে প্রতিবার গম পড়বে)

সাদা ঝকঝকে ঘাগরায়, গাঢ় নীল ওড়না গায়ে থাকবে।
অলঙ্কারআদিতে সুসজ্জিত হয়ে কবিতা ছন্দে নৃত্য করবে।

তুফান ও বিদ্যুত খেলা

ঘন ঘোর অন্ধকারে বিদ্যুত চমকে উঠে, ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ দেখা যায়। নেপথ্যে সরোদ বাদন হয় মেঘমল্লার সুরে। এরপর ঝরের বাদন হবে; তুমুল হয়ে উঠবে ঝড়, গুরু গুরু শব্দ শোনা যাবে। রঙ্গমঞ্চের পরদা উড়তে থাকবে........ বনভূমি এলোমেলো হতে দেখা যায়। বিদ্রূপহাসিব মত ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকে উঠে ; খেলা আরম্ভ হয়।

চকিত হয়ে বিজলী থমকে দাঁড়াল, ঘূর্ণি হাওয়ায় তুফান ছুটে আসে। বিজলীর রূপের চমকে, ঈষৎ হাসিতে কামনা বহ্নি যেন জ্বলে উঠল ; তুফান অধীর আবেগে তাকে প্রেম নিবেদন করে....., বিজলীর খরতর ভ্রুভঙ্গি দেখা যায়, সে ঘনয়মান অন্ধকারে নিজেকে গোপন করে কিন্তু শোনা যায় তার নূপুর শিঞ্জন, দেখা গেল রাঙা চরণ, 'নেপথ্যে তবলের বোল শোনা যায়' তুফান ও বিদ্যুৎ খেলা চলতে থাকে কত্থক নৃত্যে ; (তবলের বোল - তেরে কেটে কেটে তাক্, তাক্ তাক্ , কেটে তাক্, গধিন ধানে ধা ধা তে)
চপলা - ছলাকলা বিস্তার করে বিভ্রান্ত করে তুলল তুফানকে, হাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু ধরা সে দেয় না। তুফান ধাবিত হয় চঞ্চলা চপলাকে ধরতে.... তড়িৎলতা নিমেষে হারিয়ে যায় মায়া মৃগ মত।
হতাশায় তুফান ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে ; তার দীর্ঘ নিশ্বাস উঠে, আকাশ ব্যপ্ত হয় ; উঠে ঝড়, উঠে চিৎকার, (বাদ্যযন্ত্রে তা প্রকাশ পাবে) তুফান রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করে। শান্তিময় বনে - প্রলয় লীলা শুরু করে দেয়........ পুষ্পরাজি পদদলিত হয়। নির্ম্মম আঘাতে, আঘাতে বৃক্ষ ভেঙ্গে পড়ল ; লতা বেষ্টন ছিন্ন হয়ে যায়। অন্তর ব্যথায় রাত্রি রাঙা হয়ে উঠে ; তুফান নিজ শিরে আঘাত করে। উদ্বেল বক্ষ চেপে ধরল সে, চোখে নামল শ্রাবন ধারা।
বৃষ্টিপাত হতে থাকল......, সারাটা রাত অঝোর ধারায় যে কাঁদল সে যেন তুফান নয় ; একজন হতাশ প্রেমিক যেন।

অতল জলের কাহিনী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধঘোষণার পর, ঐ যুদ্ধ যখন ভারতের দিকে এগিয়ে এল , ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেমেয়েদের স্থানান্তবিত করা হয়েছিল ; ধুনুমুনুকেও যেতে হয়েছিল। যাবার বেলা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল - তার মন। সে বার বাব উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের দিকে পিছু ফিরে চেয়েছিল।

একদা - ঐ প্রাসাদ, অন্তপুরটিকে সে খাঁচা মনে করত, সেই পিঞ্জরার শূন্য বাথায় আজ তার মন কেঁদেছিল, (আত্ম ক্রন্দন শুনেছিল সে)। সেখানে সুখ দুঃখের কত স্মৃতি মগ্ন হয়ে আছে, কত বসন্ত এসে গেছে। ঐ সোনার খাঁচায় ধুনুমুনু জন্মগ্রহন করেছিল যে ; আমি তা ভুলতে পাবিনা। ধুনুমুনু যে আমার বুক জুড়ে থাকল, প্রাণ চেতনায় সে যে ফল্গুধারা। আর যারা থাকল অবিস্মরণীয় হয়ে, তাঁরা আমার জীবনকে স্রোতস্বিণী করে রেখেছে। নূতন সূর্য্যালোকে আমি ধুনুমুনুর জন্মপত্রিকা খুলেছিলাম, তার জীবনে ছিল - অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা, কৈশোরে বীজবপন হয়েছিল যেকাবণে, এর পরিণাম আমি জানতে চেয়েছি । তাই ত খেলাঘর থেকে তার পিছু নিয়ে চলে এসেছি। দেখছি, সে খুবই ভাবপ্রবণ, জেদও কম ছিল না; নিরিবিলি থাকতে ভালবাসত। দেখেছি - সঙ্গীতে, নৃত্যে খুবই অনুরাগ ছিল। সবার মত সেও হোলী খেলেছে, বিপক্ষকে হারাতে চেয়েছে, হার স্বীকার করতেও বাধেনি।

ছোটবেলায ডবভয় কমছিল বোধ হয়, জোর জুলুম সহ্য করতে পারত না। মহারাসের সময় ভেবেছে - কৃষ্ণ তার দিকে চেয়ে আছেন শতশত চোখে ; দেখতে পেলাম সেই বীজের অঙ্কুর ; ক্রমে ক্রমে কল্লোলে কুহরণে দেখলাম কচিপাতা। কলহে লিখেছে এখাচা তোমার যোগ্য নয়। ধুনুমুনুব ঐ কথা আমায় বিঁধেছে ; দেখতে পেলাম ভাগ্যের অদৃশ্য আকর্ষণ, দুর্দ্দান্তের অসহায় বিভোরতা । যাঁর আত্মত্যাগ, সংযম, ধুনুমুনুকে আকৃষ্ট করেছিল। ধুনুমুনুই বিভোরকে বেসামাল করে হোলীর দিন ফেলে দিয়েছে সুইমিং পোলে ; একটুও ভাবল না কে কি বলবে, ভাববে । অতল জলের কাহিনীতে দেখলাম - বিভোরের লেখা ২৯ শে শ্রাবণ। এরপর ধুনুমুনুর লেখা কঙ্কালে কমল প্রাণের সন্ধানী, সুখের ঘর, ভ্রমণ কাহিনী ও কিছু দেখেছি। তার ডায়েরীর পাতাগুলো ছড়িয়ে ছিটিযে ছিল, এমন কি - হিসাব খাতায় ও দু চারটা কবিতা, গান পেয়েছি, যথাসম্ভব গুছিয়ে নিয়ে পাঠোপযোগী করে মিল রাখতে চেষ্টা করেছি। কিছু এলোমেলো হলেও বুঝতে পারছি এর উৎস কোথায় ।

বিভোরের ভাষা ও লেখার ধরণ ধুনুমুনুর মত নয় ; চমৎকার লিখতে পারে।

১৩৪১ ত্রিপুরাব্দের ২৯শে শ্রাবণের প্রতি সে যা লিখেছে তা ধুনুমুনু কি বুঝেছে জানিনা, আমি বুঝেছি এ সান্ত্বনা দেওয়া।

(১৩৪১, ২৯শে শ্রাবণ)

'বিভোরের লেখা -১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ, ২৯ শে শ্রাবণের প্রতি ' আজ শে শ্রাবণ, বর্ষা যে· বিদায়ের অপেক্ষায় ম্লানমুখে শরতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে আলো আঁধারের মিলন সময়, - অবেলায় বিরহের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, তাই আজ সুনীল অম্বর ম্লান, বিশ্বপ্রকৃতি স্তব্ধ নিশ্চল অবস্থায় মোহন সুরে বলিতেছে - হে শরৎ, তোমার জ্যোৎস্না প্লাবিত সরলতা ও মমতা জড়িত হাসিভরা মুখ দেখিবার প্রয়াসী হইয়াও ব্যর্থ মনোরথ বর্ষা আমি আজীবন কাঁদিয়া আসিয়াছি।

যদিও তোমায় ভালবাসি, তথাপি নিষ্ঠুর বিধাতার নির্ম্মম বিধানে তোমাতে আমাতে মিলন সম্ভাবনা নাই।

হে শরৎ, কি দিয়া তোমায় অভার্থনা করিব, যা কিছু ছিল সব ধুইয়া গিয়াছে। আছে শুধু চোখের জল, তাই তোমার শুভাগমন পথে - জয়যাত্রা অভিনন্দন স্বরূপ - আমার অশ্রুবারি শত সহস্র ধারায় বর্ষিত হউক।

দেখিতে দেখিতে বিরহী প্রকৃতি কাঁদিয়া বিদায় লইলেন, ধীরে ধীরে নিশীথিনী গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের করুণ ছবি বক্ষে চাপিয়া ২৯ শে শ্রাবণ ধরাধাম হইতে বিদায় লইতে আসিল। কেহ কেহ বলেন - বিচ্ছেদই ভবিষ্যত মিলনকে দৃঢ়তর করে বলিয়া বিরহই মধুর। অবশ্য যেখানে মিলনের সম্ভাবনা আছে। আজিকার বিচ্ছেদ চিরবিচ্ছেদ ভাবে বিরাজ করিবে বলিয়াই এত দুঃখ, তাই বুঝি এত অশ্রুজল।

ভাই ২৯ শে শ্রাবণ, সত্য সত্যই কি তুমি আমাদের সহিত চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া যাইবে? বিধাতা তোমার প্রতি নিষ্ঠুর বলিয়া - আমাদের প্রতি অভিমান করিয়া চলিয়া যাইও না। দাঁড়াও, দাঁড়াও, নিশিথ রাতের হতাশ পথিক, তোমার শুভযাত্রা কালে আমার দুঃখের ধারাকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবাইয়া যাও।

হে ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দের ২৯ শে শ্রাবণ, কাল প্রভাতে ৩০ শে শ্রাবণ আসিবে, ক্রমাগত বর্ষার পর শরৎ এবং শরতের পর হেমন্ত, ঋতুর পর ঋতু, পরস্পর বর্ষা, আবার তোমাকে দেখিতে পাইব, কিন্তু হে চিরস্মৃতি জড়িত ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দের ২৯ শে শ্রাবণ, তুমি আর ফিরিয়া আসিবে না, তোমার সহিত বিচ্ছেদে বুঝি এত দুঃখ, তাই বুঝি অশ্রুজলে বিদায় নিতে আসিয়াছে।

হে ২৯ শে শ্রাবণ, আর কাঁদিও না, কাঁদিয়া ব্যথা দিও না, যদিও এ বিচ্ছেদের পর মিলন নাই তথাপি কোন দুঃখের কারণ নাই। এই চির বিচ্ছেদেই তোমাকে যথার্থ লাভ করিয়াছি।

এই বিচ্ছেদের পরিবর্ত্তে লাবণ্যে ঢলঢল তোমার মধুর মূরতীর সহিত সর্ব্বদা মিলনের সুযোগ থাকিলে - চিত্রকরের স্পন্দন বিহীন প্রাণহীন চিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। এই বিচ্ছেদের করুণ স্মৃতিপথে - হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছ বলিয়া এই বিচ্ছেদেই আমার হৃদয়ের নিভৃত কোণে আমরণ রহিবে।

তোমার মহাযাত্রাকালে দুই ফোঁটা অশ্রুজলের সহিত স্মৃতি ডোরে আবদ্ধ রহিয়া গিয়াছ - , ইহাই যথার্থ তোমাকে পাইয়াছি, ইহা বিচ্ছেদ নয় ইহাই যথার্থ মিলন।

কঙ্কালে কমল

(ধুনুমুনুর লেখা)

(কাহিনীটা আজকের নয়) - প্রবাদ আছে তার নাম মোহিত, সে প্রতিদিন হ্রদের ধারে বেড়াতে যেত, হ্রদটি ছিল সুদূর প্রসারিত নীল সমুদ্র যেন। একদা দেখল পদ্ম কালিকাটি, সুরভিত হয়ে ফুটেছে ; তা অনেক অনেক দূরে, প্রান্তরেখার সাথে মিশে, সূর্য উপাসনায় যেন আছে। ফুলের জন্য সে জলে নামল, সাঁতরে চলল, দূরত্ব যেন ফুরাতে চায় না, শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে, ফিরতেও পারে না, ভেসে যায় অগাধ জলে........। ভাগ্য যখন ফুলের কাছে নিয়ে এল তাকে, সে চমকে উঠল, একি ! এ যে সাপ, অথবা শাপ ; বিধাতার নির্ম্মম অভিশাপ যেন। হতাশায় তলিয়ে গেল সে। তার ফুল নেই, সেও নেই, ছিল মাত্র ভুল, একটা মহাভুল ; অবুঝ মনের ভ্রান্তিতে মোহিত ডুবে গেল। দুপারের ব্যবধান সৃষ্টি করে থাকল কেবল জল, দিগন্ত ব্যাপী জল তাকে গ্রাস করে নেয়, সে আর উঠল না।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর গেল....., কালক্রমে হ্রদের জল শুকিয়ে গেল, এপার-ওপার ব্যবধান থাকে নি ; এ পার বলে ঐ পার কোথায়? ঐ পার বলে ওপার আর নাই। এমন একাকার বিস্তৃত ভূমিতে দেখা গেল কঙ্কালকে জড়িয়ে কমল ফুটে আছে - জলস্থলের বাইরে ; সৌরভ তার মোহ সৃষ্টি করে। কঙ্কালে ছিল সোনার মাদুলি। ওতে লেখা ছিল মোহিত।

সেই স্থানটি, যেখানে নীল হ্রদ ছিল, এর বিষয় আজ আর কেউ জানে না। একদা প্রবাদ মত ছোট রূপকথা ছিল মাটির গভীরে ঐ কঙ্কালটিতে।

অতল জলের কাহিনী এমন সংক্ষিপ্ত যা প্রারম্ভেই শেষ হয়ে যায় ; কিন্তু মনে করিয়ে দেয় পল্লবে ঢাকা ফুলের সুরভি ও অশ্রুপূর্ণ চোখ মত নীল হ্রদের কথা।

পদ্মের মৃণালে কাঁটা থাকে, তাই কি সে চমকে উঠেছিল?

ভেবেছিল - সাপ বা অভিশাপ?

মৃণালযুক্ত পদ্মকলির সাথে সাপের সাদৃশ্য আছে ; পদ্মের শতদল বিস্তার - এ ও ফণা বিস্তারের মত দেখায় কিন্তু প্রেয়সীর বাহু বেষ্টনে তাকে দেখা যায় নি কি?

যে ডুবে গেল, সে ছিল সলিল সমাধিতে ; প্রশ্ন উঠে - সে কি নৈরাজ্যে ডুবে গেল - না - ভালবেসে ভালবাসায় ডুবল?

জলের ফুল কঙ্কালে সৌরভ হারাল না। তার ভালবাসা মৃত্যুকে অমৃতময় করেছে কি? অথবা যে ডুবে গেল, তার আত্মস্থ অমৃত অবিনাশি প্রেমে প্রাণপদ্মকে সুবাসিত রেখে - পরিতৃপ্ত ভালবাসায় ডুবে থাকল?

'পরিসমাপ্তি' পদ্মকলিতে সাপ, রবারের একটা খেলনায় তা দেখতে পাচ্ছি। এর ব্যাখ্যা হতে পারে পদ্ম ও সাপ - জীবন মৃত্যুর প্রতীক ; খেলনায় তা রূপ পেয়েছে। জন্মের সাথে মৃত্যু থাকেই, তাছাড়া কার জীবনে কমল ফোটে না, প্রবাহিত জীবনধারায় এক একটা কাহিনী থাকেই, যা মনের গভীরে চেতনায় বেষ্টিত হয়ে স্মৃতিতে নিরন্তর থাকে, তাই কঙ্কালে কমল - সুরভিত করেছি। ঐ নাম, (কাহিনীর) হেঁয়ালীর মত দ্বিঅর্থে স্রোতস্বীত হওয়াতে সহজে বোধগম্য না হলেও সর্বদা সত্য, গল্পাকারে সত্য কথার জন্য আমি প্রাইজ পাব।

সব প্রাইজ আমার জন্যই থাকে, তা তো শুনতেই পাচ্ছি যে খেলনার কথা উল্লেখ হয়েছে, তা বৈশাখী মেলার নজর পেয়েছিলাম, ছোটভাইরা (মাসীরছেলেরা) সেদিন পালিয়ে বেঁচেছিল। তাদের পেছনে যার দুষ্টুমী ছিল - তাকে সায়েস্তা করার জন্য ঐ খেলনা মেসোর হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

তখনকার দিনে খেলার নজব দেওয়া হতো, দীর্ঘকাল ঐ রেওয়াজ ছিল রাজধানী আগবতলায়। রেকর্ড সঙ্গীত, কবিতা পুস্তর 'বুকমার্ক সাথে', সেন্ট দেওয়া হয়, ওতে সেন্টিমেন্টাল নাম ছাপার হরফে এঁটে দেওয়া হতো। কোনটায় আশীর্বাদ, কোনটায় ফরগেট মি নট, মাই লভ ইত্যাদি।

অনেক রকম দুষ্টুমি ও স্নেহ ভালবাসায় উপহার দেওয়া হতো।

আমি যখন ঐ খেলনাটি কে দিয়েছে বললাম, মেসো একটু হেসে বলেন - কি চমৎকার বুদ্ধিমত্তায় তৈরী হয়েছে দেখ, সুন্দরভাব বাঞ্জক। সাপ থাকে সত্য সুন্দর শিবের মাথায়, পদ্ম থাকে নারায়ণের হাতে।

আমার রাগেব কারণ ছিল, এর ধার দিয়েও মেসোর চিন্তা গেলনা। বললেন - সাপ ও কমল এ নিয়ে লিখতে ; যার লেখা ছোট হবে, বিষয় সম্পূর্ণ হবে, তাকে প্রাইজ দেবেন। সেই তখন থেকে আমার ঐ অভ্যাস। কোন পুস্তকই বিস্তারিতভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রসসঞ্চাব কবতে পারিনি। কোন কোন সময় মাঝপথে এনে ছেড়ে দিযেছি। অনেকে এটাকে একটা ফ্যাশন মনে করেন কিন্তু তা আমার ফ্যাশন নয় ; যা এক পৃষ্ঠায় শেষ কবা যায় অল্প কথায় মনোজ্ঞ করে, তা দশ পৃষ্ঠা করা কেন, এ হল আমার মত। মাঝপথে ছেড়ে দিই যখন মনটা আর কথা বলতে চায় না।

আমি এখন ঐ দুষ্ট লোকটার কথা লিখছি।

সে আমার লেখা পড়েছিল ; বলল - আমি যদি লিখতাম - আমার কলমের মুখে বেরুত - কমলে সাপ দেখাচ্ছি, তা খেলনায় বটে। কোন কোন মানুষের মধ্যে ও সাপ লুকিয়ে থাকে, ওটাতে ছুঁতে গেলে, বা অসাবধান হলে ছোবল দেয় বৈকি।

সাপের বিষে মৃত্যু হলে জলে ভাসান হয় - দৈবাৎ যদি বেঁচে যায়? এমন একটা ক্ষীণ আশায় বুঝলে? সাপুড়ে ছাড়া সাপ নিযে কেউ খেলা করে না। 'শিব - নীলকণ্ঠ লক্ষীছাড়া, ঘরছাড়া, শ্মশানচারী। নারায়ণের হাতে পদ্মটদ্দ দেখা যায় ; ঐ বিষ্ণুই নাকি কৃষ্ণ ; সাপুড়ের মত ভাল বাঁশী বাজাতে জানতেন। তোমার মোহিত ত - মোহিত হয়ে ডুবেই গেল ; বেচারা কি আর করবে ! কী সান্ত্বনা দেওয়া যায় বল? বৃথা প্রশ্ন তুলে, একটা মাদুলি পরিয়ে, তারজন্য পুরস্কারের মত তিরস্কার রেখেছ। আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমার সদ্‌গুণের জন্য। ভাইদের পীঠে দু একটা বেত পড়লে বোধ হয় খুশী হতে ; আমি ত ভাগ্যপুত্র, ঘর থেকে বের করে দেন নি এই যা রক্ষা।

সে ধুনুমুনু ও মেসোকে, এই কথায় কঠিন আঘাত করেছিল। আজও ঐ কথাটা মনে এলে বাজ পড়ে।

সুখের ঘর

১৯১২ ইং সনে টাইটানিক নামে একটা জাহাজ ডুবে গিয়েছিল আটলান্টিক মহাসাগরে, তা আমি জানলাম ১৯৪২ ইং সনে। মনে পড়ে আমার ও একটা সুখের ঘর নামে জাহাজ ছিল, টাইটানিকের মত বৈজ্ঞানিক কল কব্জা আমার জাহাজে ছিল না। চন্দ্র-সূর্য আলোয় সুখের ঘর ভাসত কৃষ্ণ সাগরে রাজহংসীর মত ; আনন্দে ভেসে চলেছিল ...., বাঁশী বাজত সুখের ঘরে।

অলক্ষ্যে কে যেন এর চারিদিকে স্বপ্নতন্তু রচনা করেছিল ; নিমেষহারা ছিল আমার কেবিনের জানালাটা। উদয়াস্তের আলোয রেঙে উঠত আমার সুখের ঘর। সন্ধ্যা নেমে এলে দেখতাম তারা গুলোব দিকে, ওরাও মিটমিট করে যেন চেয়ে থাকত। সন্ধ্যা তারাটি, অগণন তারার মাঝে হারিয়ে যেত সীমাহীন আকাশে ; তখন - চাঁদের আলোয় আমি তাকে খুঁজতাম। ক্লান্তিতে মন বিশ্রাম নিত রাতের নিরিবিলিতে কিন্তু ঐ জানালাটার বিশ্রাম ছিল না ; ওটায় ফ্রেমে আঁটা ছবির মত কত চিত্র যে ফুটে উঠত -, ঋতুর পর ঋতু এসে দেখা দেয়, বিমুগ্ধ হয়ে দিন রাতের খেলায় ভেসে চলেছিলাম........ সহসা একদিন বাঁশী থেমে গেল, আমি ও দূর্যোগের আভাস পেলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল ; একটা ঝিলিক দিয়ে বজ্রপাত শোনা যায়, কেঁপে উঠে আমার সুখের ঘর। মহা অন্ধকারে - চাঁদ ডুবে গিয়েছিল, যেন নয়নের মনি হারিয়ে সাগর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। সেদিন তার দুর্দ্দমনীয় আশা-আকাঙ্খা আছড়ে পড়েছিল। সাগরের আর্তনাদে অধীর হয়ে, সুখের ঘর - পুঞ্জীভূত অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে, আঘাতে, আঘাতে ঘর ভেঙ্গে পড়েছিল ; ভাঙ্গা ঘরের একটা ফালি আঁকড়ে ভেসে থাকলাম। ক্যাপটেন ফিলিপস্, ইঞ্জিনীয়ার স্মিথ, এঁদের মত ডুবে যেতে পারিনি, 'পাড়ে উঠেছিলাম' লিখেছিলাম অন্তরঙ্গ বন্ধুদের - আমার দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনার সংবাদ।

কেই বা মনে রাখে, ঐ একটা ছোট জাহাজ ডুবলেই বা কি : আমি ভুলতে পারলাম না, কিছুই ভুলতে পারলাম না যে।

দেখলাম চিত্ত বিশ্রাম হারিয়ে সেই সুখতরঙ্গ আর সাগরে নাই ; বিগলিত ধারার একটা রেখা, মাঝে মাঝে আমাকে বিমনা করে। মনে পড়ে সেই ঘরের কথা, মনে পড়ে - সাথীদের।

একলা ছিলাম না । যে ছিল প্রাণের কাছে, - অতি বাস্তব কর্ম্ম ব্যস্ততায় তাঁকে ভুলতে হয়েছিল, ভুলেই ছিলাম।

আমাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়ে গেছে, তবুও জীবন - ডুবেও ডুবে না । মানুষের প্রাণ এমনি কঠিন - তার তুলনা নেই। লোহা গলতে দেখেছি, আগুন ভস্মসার হয়, অগাধ জল শোষিত হয়, পাহাড় ধ্বসে পড়ে, প্রাণের বিনাশ কিছুতেই হয় না। এর বিরাম বিশ্রাম নেই, এর শেষ কোথায় ? সর্বস্ব হারিয়ে খেলা ফুরিয়ে গেলেও ক্লান্তি আসে না কেন? খুঁজি মাটির সংসারে আমার সেই ঘর। বালুকণায় খুঁজি একফোঁটা জল,...... পেলাম না, জলের জন্য মনটা ছটফট করল ; আমি যে জলচর সমুদ্রযাত্রী, জল ছাড়া বাঁচি কি করে! জল যে জীবন, আমার জন্য জীবন কোথায় ? তবু প্রাণ থাকে, আমি যে -অফুরন্ত। অচল দুঃখে অশেষ হয়ে আছি।

প্রাণের সন্ধানী

কে তুমি ! এমন নির্জ্জন নিশুতি রাতে, বিদ্যুৎ দাহ নিযে অঝোর ধারায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছ?

তোমার নীলাম্বরিতে রাত্রিযে আরো গাঢ়তর হযে উঠেছে ; অবগুন্ঠনের প্রয়োজন ত আর নাই।

দেখি দেখি, ও মুখ একবার ভাল করে দেখি?

হে সজল বরষা! আঁধাবে মুখ ঢেকে কেন কাঁদ, সে কি আর ফিরে আসবে না ?

তুমি কাঁদ — স্মৃতির চমক নিয়ে, আমি কাঁদি - নিজেকে খুঁজে, খুঁজে ; এমনি রাতে হারিয়ে গিয়েছিলাম, আমার প্রাণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে ছিল সেদিন, সবার দৃষ্টির আড়ালে নিজেকে রেখেছিলাম ; আজ তোমাতে আমার অশ্রু উছলে উঠছে।

তুমি নিরন্তর কেঁদে এসেছ, আমার অশ্রু তোমাতে অফুরন্ত হয়ে থাক, অমৃতময় হয়ে বেঁচে থাক।

জানতাম - গতানুগতিক ভাবে জলছবির মত সবই মুছে যায়, ভুলে যায় কিন্তু জেনেছি - মনের নিভৃতে অতীতেরা চুপিচুপি এসে, চেতনায় সঞ্জিবীত হয়।

মনে করি ভুলে গেছি, বাস্তবে নিজেকেই ভুলি।

আত্মবিস্মৃতির দারুণ অন্ধকারে বিগতেরা দীপ জ্বেলে দেয় ;

আলোকিত হয় অন্ধকারে নিমজ্জিত দিনগুলো।

প্রিয় মুখ সব নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করে আমার দিকে চেয়ে থাকে ; আমি থাকি তাঁদের নিবিড় আলিঙ্গনে। ওরা আসে স্বপ্নময় হয়ে; ভাল লাগে ওদের হাসি গান ; যদিও বর্ত্তমান আমাকে অবলুন্ঠিত করে ভবিষ্যত দিকে ধাবিত কবেছে, আমার স্মৃতিতে তাঁরা সম্পদ, আমার পাথেয়। তারা চির নবীন, চির মধুর, আমার সবুজ বনের পাখী।

তারা সঞ্জীবিত, আমি স্তব্ধ, তারা আলোকিত, আমি লুপ্ত, (মৃত নই)। নিরন্তর ওদের নিয়ে আছি। স্বস্পন্দনে অনুভব করি তাদের স্পন্দন। আলো-ছায়া ঢাকা কাহিনীতে তারা রূপ পাচ্ছে ; তখনকার সেই ধুনুমুনুকেও আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের বাদ দিলে চেতনা বিলুপ্ত হয়, নিশ্চল পাষাণ হয়ে পড়ি (জড়ত্ব প্রাপ্ত হই)। ধুনুমুনুর সে কবিতা, সঙ্গীত, নূপুর শিঞ্জনী। সে স্বর্ণ সূত্রে বাঁধা বিহঙ্গিনী। একান্ত আমার পিঞ্জরার পাখী।

সে মহাশূণ্যে মিশে যেতে চেয়েছিল কিন্তু ধুনুমুনু, ধুনুমুনু সেই কুহকিনীকে তুমি মায়ার বাঁধনে বেঁধে রাখলে।

আশ্চর্য্য হচ্ছি, সে আজো আমার কোলে মাথা রেখে কাঁদে, কিন্তু তুমি - হে বরষা, তাকে সান্ত্বনা দিতে পারলে না, অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছ ; তাই কি সে, আবার নীড় ছেড়ে চলল?

বিহঙ্গী

আমি তার সঙ্গ নিয়ে চলেছি, আজ তার দিকে চেয়ে কবিতা না লিখে পারছি না। আমিও কবি হয়ে উঠেছি যে।

আমার কবি হওয়ার কারণ তার হিন্দীতে লেখা 'রাহি' পড়ে। মাঝে মাঝে হিন্দীতে গান লিখত ; যতটুকু বাংলা জানে, হিন্দীও কিছু জানে বোধ হয়। আকার ইকার ভুল ত থাকেই, এজন্য তাব বা আমার কোন ভাবনা - চিন্তা নাই। এটাইত স্বাভাবিক, ভুল ভ্রান্তির মধ্যেই ত চলেছি পথে-বিপথে। কতবার হোঁচট খেয়েছি এর ইয়ত্তা নেই।

আজ আমি লিখছি -

ঝড়ো হাওয়ায় দিগ্বিদিকে উড়ল একটা ঘুড়ি,
অদৃশ্য সূতা থাকল ভাগ্যের হাতে, কি দিন কি রাতে ;
ঘুড়িটি গেল অনেক অনেক দূরে, মহাশূন্যে একটা বিন্দু বলে
মনে হল তারে।
সারারাত তা থাকল মিষ্টি হাসি নিয়ে, দেখলাম-
তার ভবিষ্যত স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে।
বিন্দুতে দেখলাম - সিন্ধুর আলোড়ন,
দেখলাম আলোর উন্মেষ জাগরণ।
ভোর হল, নূতন সূতোয় নূতন ঘুড়ি উড়ে,
নূতন প্রভাতে চারিদিক আলো করে।

আমি কবি হচ্ছি, ধুনুমুনু কিন্তু গদ্যময়ী হয়ে উঠেছে ; তার চালচলনও বদলে গেছে। সে তার খেলাঘর হতে তখনকার দিনের পরিবেশ ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল। পারিবারিক চক্র-চক্রান্তে মন বোধ হয় ভাল ছিল না, সুস্থ ছিল না ; সবাইকে উপেক্ষা করে মাড়িয়ে যেতে দ্বিধা করেনি ; ন্যায্য দাবী বলে যা মনে করেছে, তা আদায় করে নিতেও ছাড়েনি ; 'সম অধিকার নিয়েছিল— সে'।

মা মাসী পিসীদের আদুরে ধুনুমুনুকে এখন আর সহজে চেনা যায় না। অন্ধকারের একটা দিক থাকেই, তারও একটা দিক অন্ধকার ছিল কিন্তু ঝিমিয়ে সে থাকেনি ; এইত আমি, চিনতে পারছ ? বলে - সে হেসে উঠে, চমকে উঠলাম আমি।

তারও আমার উপর শনির দৃষ্টি আছে, সে ভুলে গেল ঘরে ফেরার পথ, আমিও ফিরতে পারছি না (একেই বলে ভাগ্য)। তার সাথে আমার অগস্ত্যযাত্রার বিরাম ছিল না। জীবন পরিচ্ছেদের, এক একটা স্টেশন পেছনে ফেলে সে চলল, আমিও তার ট্রেনের যাত্রী হয়ে চলেছি......, ধুনুমুনুর ডায়েরী খুলে পড়ছিলাম, তুফান মেলের এত ঝাঁকুনি - অক্ষরগুলো ঝাপসা দেখায়, কাটাকুটিও অনেক। কোন কোন বিষয় বাদ দিতে চেয়েছিল বোধ হয়।

স্রোতের মত মানুষের জীবনধারা, কার কীভাবে প্রবাহিত হয়েছে এর একটা গতি দেখা যায়। মাঝে মাঝে মনের গভীর দাগগুলো ঝলসে উঠে। মনস্তত্বের দিক দিয়ে তা ভাবি। সে লিখেছে

- আমার ধারাবাহিক জীবনবোঝা তোমাকে দিতেছি। সুখে -দুঃখে যা কিছু পেয়েছি আজ তা রেখে যেতে চাইছি।

আমাকে দিতে পারে এমন সুখ দুঃখ সম্পদ বোধ হয় আর নাই, যখন যা পেয়েছি - তাই তুমি নাও। শুনেছিলাম - দেওয়া জিনিষ কখনো হারায় না। আমি দিয়ে রেখে গেলাম হারিয়ে ফেলিনি। এ দুনিয়াতে যে যা দিয়েছে হিসাব নিকেশ করে মুক্ত হচ্ছি। তোমাকে পরিয়ে দিচ্ছি চিন্তামনি হার। অবহেলায় যদি ছিঁড়ে যায়, রয়ে যাবে মাটির ভালবাসার ধুলি আচ্ছাদনে।

আমার নাম হয়তো তুমি জান ; পরিচয় বোধ হয় জান না। এখন মৌখিক পরিচয় হওয়ার কাজটা সেরে নিই, কি বল! প্রথমে আমাদের মোটামুটি পরিচয় হয় - নাম ধাম নাক চোখ মুখাদি আকৃতিতে ; ক্রমে সে সব পরিচয়ে রীতিমত পরিচিত হচ্ছি।

জন্মের পর আমরা নাম রূপেই পরিচয় বহন করি, তাই রূপের কথাই আগে বলছি।

নিজের ব্যক্তিগত মতে আমি তেমন রূপসী নই, তবে চলন সই বলা যায়। ফর্সাই ছিলাম, কিন্তু দুষ্ট লোকেরা মিছিমিছি শ্যামলী বলত ; তা চোখের ভ্রম লেগেই আছে। তুমিও যদি কালো মনে কর, দুঃখিত হব বই কি। হলফ করে বলতে পারি — একসময় আমি খুবই ফর্সা মেয়ে ছিলাম। এমনভাবে চেয়ে আছ কেন? এস, এস, আরো কাছে এস, গোপন কথা - কানে কানে বলি এস। আমাকে দেখলে কারু কারুর চোখে পলক পড়ত না, আমি হাসতে জানতাম, তুমি আমায় দেখে যদি চিনতে না পার - আমি গাইতে পারি, যদিও আমার স্বর বসন্তের হাওয়ায় আর ভেসে আসে না ; শরতের জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ স্বর তা আমার নয়। শিশির স্নাত পুষ্প পরাগে যে সুর গুঞ্জন উঠে তা আমার নয়।

বর্ষার অবিরাম বিলাপ, গ্রীষ্মের উত্তপ্ত, বেলা শেষে অবসাদ ক্লান্ত ক্লিষ্ট স্বর— আমার নয় ; ঘুম পাড়ানীয়া গান আমি গাইনা। আমার মর্ম্ম সঙ্গীত শুনতে পাবে গভীর রাতে, ঘুম তোমার থাকবে না। আমার প্রাচীর ঘেরা জীবনে কোন ঋতু সাড়া দেয়নি, সীমিত পরিবেশ নিজের মনে রাঙিয়ে তুলেছিলাম আমার স্বপ্ন জগৎ। সেখানে একটা সুর সঙ্গীত আছে, প্রতিধ্বনি নেই। ছন্দও গানের আড়ালে তা তরঙ্গ তোলে।

একটা আলোকবিন্দু আমাকে মুগ্ধ করেছিল, সে আমার তমসা রাতের ধ্রুবতারা। আমি তার গান গাই ; আমার সুরছন্দে সে থাকে।

সুখ দুঃখেও নাকি পরিচয় হয়। আমার শ্রেষ্ঠ সুখ ও চরম দুঃখের কথা শোন ; আমি ও একজন সুখীর পর্যায়ে পড়ি। আমার মান- সম্মান, সম্পদ, স্বাস্থ্য, বন্ধু-বান্ধবী সবই আছে বললে অত্যুক্তি হয় না, নেই কেবল প্রয়োজন। শরীরের প্রয়োজনও আছে কিনা সন্দেহ, অথচ শরীর নিয়েই জীবন প্রবাহিত হচ্ছে, শরীরই চেতনা বহন করে। এই শরীর প্রাণের আধার কিন্তু কেউ প্রাণের কথা জানে না। অনেকে কোনমতে প্রাণ ধারণ করে আছে, আমিও আছি। সময় আমাদের হাসিয়ে কাঁদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রূপ-যৌবন, ধনমান, গৃহপরিজন সব ফেলে যেতে হয়, সৌর্য্যবীর্য্যও থাকে না ; ওসবই চাক্ষুস সত্য, ইতিহাস তা বলে, কিন্তু নিরন্তর ধারায় পরমায়ু নিরবচ্ছিন্ন থাকে নাকি। সৃষ্টিতে যা ক্রমাগত, তা কিন্তু মৃত্যুতে এক একটা কাহিনী বিয়োগান্তে শেষ হয়ে যায়। আবার পুনরাবৃত্তি হয় কিনা জানিনা।

আত্মবাদীরা বলেন - নূতন পৃষ্ঠা আরম্ভ হয়। পূর্বজন্মের সংস্কার নিয়ে ; এ সব হল - ওদের কথা। আমি বুঝি - সময় সব কিছু মুছে দিয়ে জীবন যৌবন শুধু নিয়ে যায় না, বিস্মৃতিতে নিক্ষেপ করে দেয়। আত্মবাদ মানলেও মৃত্যু-বিচ্ছেদ নিরন্তর, এ ও মানতে হয়। সময় আমাকে প্রতিদিন পরিত্যাগ করে গেলেও নিঃস্ব করে গেলনা, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

সেই মধুর দিনগুলো আমার কুঞ্জে থাকে ; সুন্দর কাহিনী সৃষ্টি করে, লোকালয় স্থাপন করে, সকলকে নবজন্ম দিচ্ছে। প্রার্থিত সুন্দরকে দেখতে পাচ্ছি। একটা আলোকবিন্দুর রূপময় প্রকাশে, বাঞ্ছিত পথরেখা দেখতে পাচ্ছি। স্মৃতিতে যাঁদের নিয়ে আছি, তাদের নিয়েই আমি সমর্পিত হচ্ছি।

আমরা শরীর নিয়ে বেঁচে থাকি, তাই না ? বেঁচে থাকাটাই কঠোর সাধনা হয়ে উঠে। সে চেষ্টা কি আমরা করি না ? আজ আমি ব্যর্থ জন্ম-মৃত্যুর জন্য দুঃখ বোধ করছি- মরবার শ্রেষ্ঠ অবকাশ পাচ্ছিনা বলে।

রেখে যাব এমন সুকীর্তি আমার নেই, কিছু থাকেও যদি তা গ্রস্ত হয়ে খোসার মত নিক্ষিপ্ত হয়েছে ; চৈতন্য মহাপ্রভুর মত বলতে পারছি না - " মেরেছিস কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দের না!" না, এ আমি বলতে পারব না। আমি অত্যন্ত সাধারণ যে। চিন্তামণি হার, যা আমার বুক জুড়ে আছে তা'ই তোমাতে আলোকিত থাক। কিছু আলাপে, বিলাপে, তোমার সাথে আমার পরিচয় হল; তুমি আমার লেখনীর বন্ধু।

ভ্রমণ কাহিনী শুনতে ভালবাস ? আমি অনেক অনেক ঘুরেছি, তবে সে সব বর্ণনা করে লিখতে তেমন উৎসাহ নেই। এইমাত্র বলতে পারি - আমি কটি ষ্টেশন পেছনে ফেলে এসেছি। আচ্ছা, না হয় তোমার খাতিরে ভ্রমণ কাহিনী লিখতে চেষ্টা করব।

পত্র লিখতে হলে তোমাকে কিছু একটা সম্বোধন করতে হয় ; কোথা থেকে কবে পত্র লিখছি, তাও লিখতে হবে নিশ্চয়। ভুল চুক হলে মাপ করবে আশা করি। তোমারত ভাই— ধৈর্য্য কম নয় ; আমি মাঝে মাঝে অবান্তর কথা লিখলে তুমি শুধরে দিও।

প্রিয় অনুপ, **এলাহাবাদ**

মাঘ, ১৯৩৪ ইং সন

আমি এলাহাবাদে এসে পৌঁছেছি। কুম্ভমেলায় সাধু সন্ন্যাসীদের সমাগমে জনসমুদ্র কল্লোলিত হয়ে উঠেছে। এক সময় তাঁরা সর্বোচ্চ শিখরে আদর্শ স্বরূপ ছিলেন, এখনও তাঁদের প্রভাব দেখা যায়।

গঙ্গাস্নানে গেছি, ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করলাম। দেখলাম গঙ্গা যমুনা ধারা একসাথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, দেখা যায় - অর্দ্ধেকটা সাদা, অর্দ্ধেকটা নীলাভ; এর মধ্যে সরস্বতী আছে, কিন্তু তা দেখা যায় না।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বিষয়টি মনে পড়ে কি ?

যিনি গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিত করেছিলেন, যার জন্য গঙ্গার আর একনাম ভাগিরথী। সরস্বতীর ক্ষীণধারা বরাবর ছিল, সেই ধারায় প্রবাহিত হয়ে প্রথম যেদিন গঙ্গা-যমুনা বিপুলাকারে সরস্বতীতে

মিলিত হল- সেই বিশেষ দিনটিতে সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে শত শত লোক পূণ্যতীর্থ ভগিরথী তীরে সমবেত হয়েছিলেন ; সেই তখন থেকে, বার বৎসর অন্তর ঐ স্মরণীয় তিথিতে (সূর্য্যগ্রহণের সময়) আজও জনসমাবেশ হয়। সাধু সন্ন্যাসী দর্শনের জন্য দূর -দূর থেকে বহু লোক আসেন, স্নান দান করেন। এই কুম্ভমেলা সুদীর্ঘকাল থেকে চলে এসেছে। গঙ্গা যমুনা, ও সরস্বতী , এই মিলিত ধারাকে ত্রিবেনী বলা হয় । উক্ত কুম্ভমেলা সুদীর্ঘকালের ইতিহাস বহন করে আসছে। বহুকাল পূর্ব্বে প্রয়াগ রাজধানী ছিল বলে জানা যায়। হর্ষবর্ধন প্রয়াগে এসে সব কিছু দান করতেন, এবিষয়ে হিউএন সান তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন। তা ইতিহাস থেকে জানতে পারছি।

রামায়ণে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বিষয়টি মনোযোগ দেবার মত ; সংক্ষেপে তা লিখছি। অনেক সময় ঋষিরা রূপকের আড়ালে পূরাণ কথা বলতেন। তা ভাবতে আমার ভাল লাগে, তোমারও ভাল লাগবে। কারণ রূপক খুব মজা করে লেখা হয় যে। তাই লিখছি। হিমালয়ের উচ্চ শিখর থেকে প্রচণ্ড বেগে গঙ্গা যখন অবতরণ করলেন - পর্ব্বত প্রমাণ ঐরাবত ভেসে গেল, তার গর্ব্ব থাকল না। এখন গঙ্গার সেই ভীষণ প্রপাত কে ধারণ করবে ? মহাদেবকে আরাধনা করলেন, তপস্যা করলেন ভগীরথ। গঙ্গাদেবী মহাদেবের জটাজালে আবদ্ধ হয়ে যান, ভগীরথের দীর্ঘ সাধনা ও স্তবে, গঙ্গা আবার জটা জঞ্জাল হতে মুক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়,হরিদ্বারে প্রবেশ করে সে স্থানে গঙ্গা -যমুনা একাকার হয়ে যায়। একধারায় শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বহু নামে বহু স্থানে ধাবিত হয়ে চলেছে। যে স্থানটায় গঙ্গা নামানো হয়েছিল সে স্থানের নাম হল গঙ্গোত্রী ; যমুনা নামানো স্থানটির নাম হল যমুনোত্রী। বদারি-কেদার হয়ে বরফ গলা জলে হিমালয় থেকে নেমে এসেছে। স্থানে, স্থানে ভয়ঙ্কর আলোড়ন দেখা যায়। হরিদ্বারেও এর প্রবল স্রোত আছে। এলাহাবাদে ও স্রোত কম নয় ত্রিবেণী সঙ্গম স্থানে। বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিতে যমুনাধারা- শান্ত ; নির্জ্জনে বিরহিনী যেন। এই যমুনাই প্রয়াগে গঙ্গার সাথে কলনাদিনী হয়ে স্রোতস্বিনী হয়ে আছে। স্থান বিশেষে নদ নদীর রূপ বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়েছে।

কুম্ভমেলা, সে এক এলাহি সমাবেশ। সাধু মহাত্মারা শিষ্য মণ্ডলী নিয়ে আসেন। তাঁদের অন্নদান, ভোজনপর্ব ও পাণ্ডাদের পুণ্যকর্ম্মাদি , গৃহীদের গোদান, দক্ষিণাদান দেখবার মত। এক একটা ছত্রছায়ায় গঙ্গাতীরে ওসব হয়। সম্পদশালীদের দানছত্রও কম নয়। উক্ত মেলায় কুম্ভ স্নানের জন্য লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসেন, তা গণনা করা হয়। শুনলাম তিন লক্ষাধিক হয়েছে। এদের সামাল দিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভলান্টিয়াররাও থাকে, যাতে কেউ দলছুট না হয়ে যায়, এর জন্য সুব্যবস্থা করা হয়। যাত্রীরা দলে দলে ত্রিবেণী সঙ্গম স্থানে স্নান, দান করতে আসেন ; এত ভীড় হয় - তা না দেখলে অনুমান করা যাবে না। ভারতের কুম্ভমেলা এও একটা অষ্টম আশ্চর্য্য বলা যায়।

দেখলাম সাধুদের বহু সম্প্রদায়। গুরু স্থানীয়রা হাতীর পীঠে- হাওদায়, বহু সম্মানে আসেন, তাঁদের জন্য ঐ ব্যবস্থা বিশেষ ভাবেই রাখা হয়েছে। গুরু মহারাজদের মণ্ডলেশ্বর বলা হয়। তাঁরা নিজ নিজ শিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে আসেন, জাঁকজমকের সহিত মেলায় পদার্পণ করেন। দেওঘরের হংস মহারাজকে দেখলাম হাতীর পিঠে। তিনি ত্রিপুরার বীর বিক্রম মাণিক্যের

সময় একদা এসেছিলেন, তাঁকে কৃষিক্ষেত্রে একটা চা বাগানে সুব্যবস্থা করে সম্মানে রাখা হয়েছিল। মাতা মহারাণীদের সাথে আমরা প্রতিদিন তাঁকে প্রণাম করতে যেতাম।

শিষ্যরা গুরুকে মহারাজ বলেন, সর্ব্বসাধারণরাও তা-ই বলে, কেহ কেহ বাবাজীও বলেন। বুঝলাম- আধ্যাত্মিক ধর্ম্মবাদ ব্যাখ্যা বিবিধভাবে হলেও ঈশ্বর স্বীকৃতিতে দ্বিমত নেই ; বিভিন্ন চিন্তাধারায় অগ্রসহ হয়ে তাঁরা সমুদ্রেই মিলিত হচ্ছেন।

সন্ন্যাসীরা বলেন- আমি ব্রহ্ম হতে অভিন্ন, (আমি ব্রহ্ম) বৈষ্ণবরা বলেন - ব্রহ্ম ঐশ্বর্য্যময় (ঈশ্বর) প্রভু ; আমরা তাঁর দাস। বৈষ্ণবদের নামের সাথে দাস যুক্ত থাকে ; সন্ন্যাসীদের নামের সাথে থাকে - আনন্দ। তাঁরা গেরুযা বস্ত্র ধাবণ করেন ; বৈষ্ণবরা সাদা বস্ত্র ধারণ করেন। সন্ন্যাসীদের মস্তক মুণ্ডিত করা হয়, বৈষ্ণবদের থাকে জটা, যাঁরা জটা রাখেন না তাঁরা শিখা রাখেন। বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসীর বহু সম্প্রদায় আছে। গুরুকূল দিয়ে তাদের সম্প্রদায় পরিচিত হয়। যথা - 'বৈষ্ণবের' শ্রীসম্প্রদায়, দিগম্বর, নিম্বার্ক, শাশ্বত, রামানুজ, গৌড়ীয় ইত্যাদি। 'সন্ন্যাসীদের নাগা নামে আলাদা সম্প্রদায় আছে। ' এরা মহন্তের অধীনস্থ শিষ্য সম্প্রদায়। সাধু সন্ন্যাসীরা গঙ্গাচরে বস্ত্রাবাসে আছেন, গৃহীরাও অনেকে কল্পবাস করছেন - 'গঙ্গাচরে কম্বলে তিনরাত থাকছেন।' শত শত দর্শনার্থী মহাত্মাদের প্রণাম করতে যান। জ্ঞানীগুণীরা তাঁদের বহু প্রশ্ন করেন, প্রশ্নগুলোর মীমাংসা হল কিনা জানিনা, সাধু সন্ন্যাসীরা উত্তর দিচ্ছেন, উপদেশ দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে শুনছি, মাঝে মাঝে শুনছি না, মানছি না, কোন কোন বিষয়ে মন ভাবিত হচ্ছে ।

এলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনাব পৃথকধারা দেখা যায় বললাম না? অনেকে তা দেখে অবাক হন। বুঝেছি- এতে আশ্চর্য্য হবাব কিছু নেই। যমুনার গভীরতা গঙ্গার চেয়ে অধিক ; এরজন্য জলের অর্দ্ধেকটা নীল দেখায়, একসঙ্গে প্রবাহিত হয়েও এক হচ্ছেনা বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসীর মত। কিন্তু উভয়ে একই প্রভুর সন্ধানী। হরিদ্বারে প্রবল স্রোতের জন্য একাকার হয়, গঙ্গা-যমুনার পার্থক্য দেখা যায় না।

ব্রহ্মবাদে ঈশ্বর এক (অদ্বিতীয়) কিন্তু মতবাদদ্বারা ভিন্ন ভাব, ভিন্ন বেশ দেখছি ; শাক্তরা লাল কাপড় পরেন। আমরা মানুষ ছাড়া কিছু নই ; জ্ঞানে গুণে রূপের পার্থক্যে আছি। আমরা প্রকৃতির দাস, ব্রজপথে সকলেই চলেছি, পৃথিবীতে, বৃন্দারণ্যে, পূর্বপুরুষরা ছিলেন। ক্রমে ক্রমে গৃহবাসী হয়েছিলেন। যাঁরা অন্তর পথে (মহাপুরুষ; সাধকরা) চলেছেন, হিংসা হতে মানুষকে রক্ষা করতে চান বোধ হয়, কিন্তু মত পার্থক্যে সকলেই আমরা আছি। পারি কি- তা কেউ অস্বীকার করতে?

ব্রহ্মবোধ না হলে শান্তি স্থাপন অসম্ভব। এ হল আমার মত। শান্তির জন্য ব্রহ্মই আমাদের সাধনীয় । তথাগত বুদ্ধের অষ্টশীল উপদেশ রক্ষা করতে হলেও অদ্বৈতবাদ প্রশান্তি সাধন করতে হয়।

বহু তীর্থ ভ্রমণ করে কোথায় কি দেখেছি, তা বোধ হয় গুছিয়ে বলতে পারব না, তবে এটা জেনে রাখ - তীর্থে জল বা কুণ্ড থাকবেই, পাণ্ডারাও থাকবেন। আমি কোথায় কোথায় গেছি এর তালিকা দিতেছি ; তা বলে রাগ কর না ভাই। ভ্রমণ কাহিনী লিখতে পারি না যে ; আমি ত দিতে ভুলেই গেছি।

আমার ভ্রমণ তালিকা

কলিকাতা, গিরিডী, রাঁচি, বৈদ্যনাথ, গৌহাটি, শিলং, মণিপুর, দার্জ্জিলিং, গোপালপুর, পুরী, রেঙ্গুন, এলাহাবাদ, বেনারস, বিন্ধ্যাচল, চিত্রকূট, নৈমিষারণ্য, মিশ্রি, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা-বৃন্দাবন, দেরাদুন, নৈনিতাল, জয়পুর, উদয়পুর, নাথদ্বারা, মুসৌরী, আজমীর, ভূপাল, পান্নাষ্টেট, বারিয়াষ্টেট, বরোদাষ্টেট, বোম্বে, দ্বারকা, পুণা, উজ্জয়ন, নাসিক, কাশ্মীর, আমেদাবাদ, গোয়া, হায়দ্রাবাদ, মাউন্ট আবু, প্রভাস, মাথেরান, লোনাওয়ালা, মাদ্রাস, ব্যাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রম, কোচিন, কন্যাকুমারী, মাদুরা, ত্রিচেনাপলি, রামেশ্বর, জুনাগড়, সোমনাথ, দ্বিউ, চণ্ডিগড়, নেপাল, মিজোরাম, বদরি-কেদার, ইন্দোর, হরিদ্বার।

ইউরোপ ভ্রমণেও গিয়েছিলাম, আমার ঘোরার মধ্যে বলার মত কিছু ছিল না, মনের অস্থিরতায় ঘুরেছি, কিন্তু লক্ষহীন যাত্রায় কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি বৈকি। দেখতেই পাচ্ছ কোথায় বোম্বে কোথায় বদরি-কেদার। কোথায় বা নাইটক্লাব কোথায় ধর্ম্মশালা।

যদি বল - তালে বেতালে ছন্ন ছাড়া, আপত্তির কারণ নাই। নিন্দা-প্রশংসা, ভালবাসা-বিশ্বাস, সম্মান সবই পাচ্ছি, অপমানও পেয়েছি; সুখ-দুঃখও কম ছিল না। ঐসব মাঝে মাঝে আমাকে ভাবিয়ে তোলে ; ভয় করি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, ভাবপ্রবন ব্যক্তিদের। বলতে হচ্ছে- কে বলেছিল ভালবাস, বিশ্বাস কর, শ্রদ্ধা কর? আমার ত ঢাকঢাক কিছু নেই। এমন কোন ভাল কাজও করিনি ; মন্দ যা করছি - তোমাদের গোপন করে করছি না। স্নেহাস্পদ ও বন্ধুজ্ঞাতীযদের জন্য দুঃখ হয় এরাই আমার পথের কাঁটা, এঁদের জন্য আমাকে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

অবজ্ঞা- উপহাস ওসব কিছু না। ঠাট্টা বৈ ত নয়? ওতে কিছু এসে যায় না কিন্তু একটু দুঃখ হয়। এমন দুঃখ জেনে না জেনে, আমি কি কম মানুষকে দিয়েছি? নিজের দিকে তাকালে, অনেককে ভালই বলতে হবে। স্বীকার করতে হবে—ওদের দোষ নেই। অপ্রিয় হয়ে উঠলে অপ্রিয় ব্যবহার, অপ্রিয় কথা শুনতে হবে বৈকি, আপত্তিই বা কোথায়?

মাঝে মাঝে বাজে কথা লিখতে ইচ্ছে করে, তাই কিছু লিখলাম। তা ভাই - কিছু মনে কর না। গীতা থেকে ধর্ম্ম কথা উদ্ধৃত করে লিখছি -

কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ক্ষমা কর। পত্র লেখটা আজকের মত এখানে শেষ করছি।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কাম, কামাৎ ক্রোধাভিজায়তে।

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ: সম্মোহাৎ মতিবিভ্রম।।

স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

‘এ শ্রীকৃষ্ণের সত্য বানী’ তা খুব ভাল করেই বুঝছি।

অনুপ, আমার প্রাণের অনুপ,

আমি এমন করে কাকেও পত্র লিখিনি কোনদিন। আজ আমার জীবনের কিছুকথা তোমাকে লিখছি।

আমি জানতাম - বন্ধু চিরদিন বন্ধু থাকে না, শত্রুও চিরদিন শত্রু থাকে না। আমার ভাই - এমনি ভাগ্যের জোর শত্রু-মিত্রদ্বারা বৈতরণী পার হচ্ছি। ঝড় তুফান মাথার উপর বয়ে গেল,

গাড়ীটা খাদে পড়তে পড়তেও বেঁচে গেল। ধাক্কা লেগেছিল, তবে একটা আঁচড়ও লাগল না কিন্তু অনেকে হায় হায় করছেন। আমার চোখে জল এল। অনেক দিন পর " ধূমার ছলনা করে কাঁদলাম।" আমার মা'র দিকে তাকাতে পারছিলাম না ; তিনি বেশ বড় রকম আঘাত পেলেন। আমার জন্য সব মার মত, সহজ সুন্দর জীবন, সুখের সংসার, চেয়েছিলেন তিনি। এ চাওয়াটাই - আমার উপর অভিশাপ হল ; এরপর আমার বিয়ের কথা মুখে আনলেন না আর। পাথর পূজা করে, যেন পাথর হয়ে গেলেন। এখন অনেকেই আমার কাছে অপরাধী হয়ে আছেন ; এদের দ্বারাই অত্যন্ত মন্দ পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম. এর রেশ টেনে চলেছি। বিভোর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আমার জীবন থেকে। এরপর কি হল জান? আমি রাহুগ্রস্ত ছিলাম ; রক্ষা কবজটা বুক জুড়ে ছিল বলে কোনমতে চলছিলাম, আশা ছিল - সে ফিরে আসবে। দিনের পর দিন গেল, বছর গেল এলনা ; এল - এক সমবয়সী বন্ধু। দীর্ঘকাল পর এলেন। যার রূপ ছিল কার্ত্তিকের মত, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ব্যবহার ছিল - বালক সুলভ ; রুচি ছিল পঞ্চমকারে। সে জীবন ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিল। এই বন্ধুটি আমাকে সোজাসুজি বললেন- আমাকে তাঁর গৃহিনী হতে হবে। বললাম, কেন? আর মেয়ে পেলে না ! আমার প্রতি কৃপা কেন?

বলল, জানইত, সে কবে থেকে ভালবাসি। আবার নূতন করে শুনতে চাও নাকি?

তোমার উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসার জন্য তোমার বৌ হতে হবে নাকি?

জানইত, আমি বিভোরকে ভালবাসি। বেশত, যত ইচ্ছা ভালবাস, ও আর ফিরে আসবে না। যৌবনে যোগিনী হওয়া কেন।

তারকথা শুনে হসলাম, বললাম - কত সেবাদাসী, বৌ ছেলেমেয়ে সবই ত আছে, আবার বিয়ে কেন! তাছাড়া— তোমার সাথে আমার বিয়ে হতে পারে না।

একথা তুমি বিভোরকে বলতে পারতে?

বোধ হয় পারতাম না।

তবে আমার বেলা এত বিচার কেন।

তুমি বিবাহিত, তোমার স্ত্রী রূপে -গুণে, মানে কম ছিল না ; সুখী হতে পারলে না, এ তোমার ভাগ্য। আমাকে বিয়ে করলে তোমার ভাগ্য খুলবে না, আরো বিপাকে পড়তে হবে। তাছাড়া - বললাম না - বিভোরকে ভালবাসি? গুণান্বিত ব্যক্তিটি রেগে গেলেন। বললেন- এতই যদি ভালবাস, আর একজনকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলে কেন, এওত জানি।

আমাদের আবার রাজি অরাজি কি ; তোমার বোনদের যেমন বিয়ে হল - আমারও তেমনি বিয়ে হতো ; লোকটাও ভাল ছিল।

তা মন্দ হবে কেন, সম্মান আছে, টাকা আছে ; মনি মুক্তায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুড়িয়ে দিত। এছাড়া আর কি আছে শুনি? আমি ত চরিত্রহীন, আমার অনেক সেবাদাসী, বলছিলে না? ঐ ব্যক্তিটি কি খুবই চরিত্রবান নাকি? রূপই বা এমন কি ছিল মুগ্ধ হবার মত। রূপগুণের কথা কে ভাবছে। আমার বিয়েটা হয়ে গেলে ভাল হত, আমি সুখে থাকতাম।

তাত হতোই, অন্ততঃ একদিক রক্ষা হত, কিন্তু কোনদিকই হল না। ও তোমাদের সব কটি বোনকে দেখেছে, তোমাকে দেখেছে ছবির মত। তুমি এ অপমান কি করে মানলে ! ও

তোমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল না ; পছন্দ করে বিয়ে করতে চেয়েছিল বৈত নয়?
বললাম - আমিও পছন্দ করি। ভালবাসাবাসি প্রশ্ন নেই. প্রতারণাও নেই ; চরিত্রের কথা যদি বল - কার কত সেবাদাসী আছে, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।
বিভোরেরও ত এক ডজন ছিল। ও সবত বাড়ীর শোভা, কি বল?
আমার কথা শুনে সে হেসে বলল, ও হবু বরকে তোমার মনে ধরেছিল?
তা আর শুনে কি হবে, বিয়েত হচ্ছেনা।
খুব দুঃখ হচ্ছে নাকি?
হবে না কেন। এমন সম্পদশালী ব্যক্তি, যিনি আমাকে মণি মুক্তায় মুড়িয়ে দিতে পারতেন - কিন্তু সবাই বাদ সাধলেন। বেশ হয়েছে, কারুর সাথে বিয়ে হবে না। যদি হয় - আমার সাথে হবে। এ আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি।
বিভোর বলেই ছেড়ে দিলেন, কিন্তু শনির দশা তাঁকে ছাড়ল না। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম ঐ বন্ধুটির কথা। আমি একে নিরীহ মানুষ বলে জানতাম , সে যে এমন রুখে দাঁড়াতে পারে কোনদিন ভাবিনি। বড় শান্ত ছিল ; এর জীবনের পরিণতি দেখে দুঃখ হল। ইনি যেমন আমার জীবনের প্রতিটি কথা, প্রত্যেক ঘটনা জানতেন, আমিও তাঁর জীবনের প্রতিটি কথা জানতাম। বিভোর, আমি, আমার সহোদর, এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম। সে আমাকেদ আদরে সম্মানে রাখত। আজ আমার সামনে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়ালেন।
যাঁর সাথে আমার বিয়ে হবার কথা, তা না হওয়ার কারণগুলো সবই যেন জানেন বলে মনে হল।
আমি যা সহজে মেনে নিয়েছি, আমার বন্ধুবর তা সহজে নিতে পারছেন না ; অপমান বোধ করেন বলে মনে হল।
আমাকে সে খুবই বিশ্বাস করত, মেয়েদের সম্মানের চোখে দেখত কিন্তু বিয়ের পর সে বিশ্বাস তার থাকেনি, যা তা বলতে ছাড়ে না। আমার কাছে সে সংযত ছিল বহু কারণে। প্রথমে আমরা তার বন্ধু ; দ্বিতীয় - আমি একাগ্র ছিলাম পুস্তকে গানে, নাচে, আমার সঙ্গী ছিল বিভোর,, আমার ছোটবেলার অদ্ভুত বিয়ের প্রতি নিষ্ঠা ছিল। এমন একটা মতবাদ পোষণ করতাম - যা অনেকের কাছে গ্রাহ্য ছিল না। বিভোর সমীহ করত ঝগড়াও করত ; তর্ক উঠত আত্মবাদ নিয়ে। ঐ সবে সহোদর দাদাও ঐ কার্ত্তিক বন্ধুটি হাসত, বলত কি পাগল মেয়ে। আমাকে, যাঁর সঙ্গে বিয়ের কথা নিয়ে যখন ও খোঁটা দিল, বিরক্ত হয়েছিলাম। তাই বললাম -জানত - তোমার বৌ আর আমি এক জাত? আমাকে বিশ্বাস করতে নেই।
" তুমি ত্রিপুরার, বিভোরের প্রতি তোমার ভালবাসা - তা আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু - যা আর হবে না, হতে পারে না ; ...... আমি তাঁকে খুব ভাল করে জানি। তিনি তোমার মঙ্গলটাই বড় করে দেখলেন, মনের দিকটা কোনদিন দেখেননি।
-তুমিও ত আমার মনের দিক দেখছ না।
- আমি তোমার মনের দিক দেখব কেন ; নিজের মনের খবরটাই তোমাকে বলছি, আর জিজ্ঞাসা করছি - আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ কিনা।

এ বলছে কি? সুস্থ আছে ত? সন্দেহ হল। বললাম - আজ ক' পেগ গিলে এসেছ!
ও একটু হেসে বলল - কাছে এসে পরীক্ষা করে দেখ।
আজ যদি বিভোর থাকত, পারতে একথা বলতে?
পারতাম, তিনি কোন বিঘ্ন না ঘটিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সরে গেলেন - তুমি রাজরাণী হবে বলে। আমারও আপত্তি ছিল না তোমার সখের, সুখের বিয়েটা হলে। স্যামপেন গিলতাম মজা করতাম। তা যখন হলনা, ওটাকে গুরুত্ব দিয়ে অসহযোগ করছ। এর মানে কেউ বুঝুক, না বুঝুক, আমি বুঝছি। ঐ ঐশ্বর্যবান লোকটাকে ভালবাস নাকি? সে কি তোমার স্বামী?
-ও স্বামী হবে কেন ?
-তবে আমার সাথে বিয়েতে আপত্তি কি।
-তেমন আপত্তি নেই, এখন আমার মনের অবস্থা ভাল না, অনেক ভাবতে হবে।
-আমি অপেক্ষা করব না, এ তুমি জেনে রাখ। আবাব বিয়ে করবই।
- পাঁচটা বিয়ে কর, আমাকে কেন বলছ। আমি কি তোমার হাতিয়ার নাকি? শোধ তুলবার?
-তোমাকে না বললে আমার শান্তি নেই যে। তোমাকে, বিভোরকে তোমার দাদাকে বলেছিলাম
-প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছি। এখনও ঐ স্ত্রীকে ভালবাসি।
-তবে আমার স্থানটা কোথায়?
-যেখানে কেউ নেই, তুমি একমাত্র আশ্রয়। আমি শান্তি চাই।
" তুমি আমাকে ছেড়ে দিওনা। শেষ পর্যন্ত তার শক্ত অপরাধ সহ্য করে তাকে শান্তিতে মরতে দিয়েছি।
যাক্ সেকথা, বলেছিলাম - তুমি ত যুদ্ধে যাচ্ছ, আমরাও যাচ্ছি অন্য রাজ্যে, যদি ফিবে আসি তোমার নূতন বৌকে দেখতে নিশ্চয় আসব। সে একটু হেসেছিল।
দেখলে অনুপ? আমি কি চমৎকার গল্প লিখতে পারি।
দেখ, এরপর আর কি লিখি।
তার ঐ হাসিটা চোখের জলের মত পবিত্র ছিল ; আমি চোখ তুলতে পারলাম না।
আমার মমতা তাকে দুর্ব্বল করবে এ আমি চাইনি।
সে আমাকে ভুল বুঝল না ; আচ্ছা চলি বলে - তাড়াতাড়ি উঠে গেল। তার ঐ মায়া মমতা আমাকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ রেখেছিল।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুরাদমে আরম্ভ হয়ে গেছে, ছুটিতে এসেছিল সে, যেদিন যাবে, পরিবারের মধ্যে চাপা কান্না উঠেছিল, ত্রিপুরায় কারুর মনেই শান্তি ছিল না। আমার সহোদরের চোখে জল দেখলাম ; মহামান্য দাদারও অস্থিরতা দেখেছিলাম। একদিন এঁর সাথে তর্ক বিতর্ক হওয়াতে, আমাদের বন্ধু ক্ষুব্ধ হয়ে সৈন্য বিভাগে স্বাক্ষর করেন, তখন তাঁর বয়স ২৪। যুদ্ধের ডাক পড়েছে, যেতে হবে, আমার সাথে দেখা করতে এলেন। মিলিট্যারী ধরা চূড়া পরে এসেছিলেন। বললেন, আবোল তাবোল অনেক বকেছি। ঝোকের মাথায় আবার পাগলামী করে বসনা। আমাকে যেতে হচ্ছে, এপথই বেছে নিয়েছি যে, কথা শুনে আবার চোখ নামাতে হল, চেষ্টা করেছিলাম কিছু বলতে। সে আমাকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করে আমার কপালে স্নেহচুম্বন

রেখে গেল।

সবার ভালবাসা আজ আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। মানী, মাসী, পিসীমাদের বোনদের সবাইকে আমার মনে পড়ছে। আমার ক্লাবের মেম্বাররা যাঁদের নিয়ে আনন্দে ছিলাম - কাকেও আমি ভুলিনি । আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামান্য দাদার কথা মনে করে পীড়া বোধ করছি। এই দাদার মান রাখতে গিয়ে আমি নিজেরও আমার দাদা মধ্যমের দুঃখের কারণ ঘটিয়েছিলাম। আমার হবু বরের প্রস্তাব সহজে নিতে পারিনি। তিনি যখন বললেন - " তোমার দাদা মহারাজেব কথা ঠিক নেই, একবার বলছেন ত্রিপুরায়, আবার বলছেন কলিকাতায়, আবার বলছেন বেনারস, এ সব কী?

এর চেয়ে - আমার রাজ্যে তোমার মেজদাদা সম্প্রদান করুক ; এতে আমার প্রজারা খুশী হবে। তোমার আমাব বিয়ে আমার রাজ্যেই হোক তুমি কি বল?

সেদিন আমি অস্বস্তিবোধ করে চুপ ছিলাম ; যখন বললেন - চুপ করে থাকবে নাকি? তুমি কি পুতুল?

বললাম- হ্যাঁ আমি পুতুল। দাদা যা বলবেন তাই হবে। আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক, এটা কি তুমি চাওনা? তোমার নিজের দাদাকেও বল, ভেবেচিন্তে পত্র লিখে বল তোমাদের মত। আমার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, অপমান বোধ করেছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর চেহারা দেখে তাই মনে হল। ভয়ও হয়েছিল, আমি বুঝেছিলাম যা বলে ফেলেছি, তা ভাল হয়নি. মা জানলে বিরক্ত হবেন। আমি ঐ কথা কাকেও জানাইনি, পত্রও লিখিনি। এটাই মেজদার কাছে আমার বড় অপরাধ। ঐ রাজাকে আমি সহজেই ভুলতে পারতাম কিন্তু মেজদার মনোনীত মেয়েকে তিনি ওঁর রাজ্যে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন ; একটা বড়রকম আঘাত আমাদেব উপর পড়ল। আর একটা কারণ হল - আমার গায়ে জলবসন্ত দেখা দেয়, মেজদারও হল। এরজন্য বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভাগ্যের ফেরে গণ্যমান্য রাজার সাথে বিয়ে ঠিক করা হয় ; আমি নিরানন্দ অবস্থায় পড়ে ত্রিপুরা থেকে চলে যেতে চেয়েছিলাম, কারণ - আমার বান্ধবী দিদিদের বিয়ের পর আমার মনে সুখ শান্তি ছিলনা। ত্রিপুরার আবহাওয়াও কিছু বদলে গিয়েছিল। তাছাড়া, চক্রান্তে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর পাকাপাকি বিয়ে ঠিকদ হওয়ার পর - জাকজমক করে আমাকে আংটি পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন বিয়ে বাতিল হয়ে গেল, বীরেন্দ্রর সাথে আমার দেখা হল, তিনি কলিকাতায় এলেন, তাঁর মাসতুতো বোনেরা তাঁর সাথে বেড়াতে যেতো. আমাকে যেতে অনুরোধ করেন, ছোট দিদিও কলিকাতায় ছিলেন, চল চল বলে আমাকে টেনে নিয়ে যেতো। ওদের নমুনা আমি বুঝলাম ; বীরেন্দ্রও বললেন - আমার এমন কি অপরাধ আমার সঙ্গে কথা বলতে নেই ; বেড়াতে যেতে নেই?

বললাম - আমার মতিগতিটাই - ভাল না, আপনি তা জানেন না। ও বলল - যে মানুষ এমন কথা বলে, একটুও দ্বিধা করল না ; কি করে আপনাকে ভুলব বলুন ত? শিবদাজীর মত আমিও আপনাকে শ্রদ্ধাই করি। আপনার বান্ধবী মল্লিকা ভাবী আপনার সব কথা আমাকে বলেছেন। আপনার বিয়ে না হওয়ার কারণও জানি।

বললাম - শিবকে আমি ভাল চিনি না, দু একবার দেখেছি।

তাঁর দাদাকে চিনি, বেশ ভাল। তাঁদের বোন আপনাদের মামার মেয়ে আমার বান্ধবী, বুঝলেন? এমন সুন্দর মেয়ে কমই দেখা যায়। রাজা সাব বললেন, আপনি আমার বিষয়ে অনেক কথা শুনেছেন না? মল্লিকা ভাবীর কাছে আমিও আপনার অনেক কথা শুনেছি। আপনার ভাল-মন্দ, আপনার অংহকার, সবটাই আমার ভাল লাগে।

বললাম আপনাকেও আমার ভাল লাগে। বিয়েতে তবে অমত কেন? জিজ্ঞাসা করলেন। আপনি আমাদের দাদার মাসতুতো ভাই না? ঐ জন্য অমত। হেসে হেসেই কথাটা বলেছিলাম। আজ আমি বীরেন্দ্রের জন্য কাঁদছি। ভাবছি তাঁর প্রিয় ব্যবহারগুলো তাঁর বিয়ে হয়েছিল, ছেলেমেয়েও হয়েছিল, কিন্তু ত্রিপুরার মেয়েদের প্রতি তাঁর মোহ কাটাতে পারলেন না, আমরা কলিকাতায় এলে সেও আসত। সেই আগের মত মুগ্ধ দৃষ্টি, তেমনি প্রাণখোলা হাসি।

-ল্লিকাদিদিটি আমায় - বলেছিল তুই একে বিয়ে কর, " আমি না কি একটু তোর মত, সে আমাকেও ভালবাসে। তার কথা শুনে না হেসে পারিনি। বললাম -ঐ চার ছেলেমেয়েব বাপকে বিয়ে করব কেন। তাঁর স্ত্রীর কথাও চিন্তা কর। রাজা সব মেয়েকেই ভালবাসেন, সম্মান করেন। তোকে, আমাকে, আমাদের আরো অনেকে বুঝলে? মল্লিকাদি বলল - আমি সব কথা তোর বলে দিয়েছি। তবু আশা করেন।

বললাম - তুই তো তার মনের আধখান দখল করেছিস, আবাব দু'তীয়ালি কেন।

" ও খুশী হবে," আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম তার কথায়। বাজা সাহেবের শেষ জীবন পর্য্যন্ত সে তাব সুখ দুঃখের সাথী। দুজনেই ওরা আমার শুভেচ্ছু।

বাজাসাব আজ নাই, মল্লিকাদির জন্য দুঃখ হয়। বুড়ো বয়সে - বাজা সাব, আমি, মল্লিকাদি, তিনজনে আমরা আলিঙ্গন করে বিদায় নিয়েছিলাম ভূপালে। সকলের স্মৃতি আজ আমাকে পীড়া দিচ্ছে। দিদি গোলাপীকে, আমার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত মনে থাকবে। এত ভালবাসা কারুব কাছে আমি পাইনি, ও যে ভালবাসার জনাই জন্মেছে। সে আমাকে বিশ্বাস করত, কত কথা বলত। সর্ব্বদা তাঁর মুখে হাসি, লেগে থাকত, অনেকটা আমার মাসীমার মত স্বভাব ছিল। সেমিজ পরতেন। সিন্দুর ফোঁটায় কি চমৎকার দেখাত। বনই ও আমাকে খুবই ভালবাসতেন। আমি তাঁর কাছে ঋণী, 'তিনি মার্টিন কম্পানীর হেড ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন।

ইঞ্জিনীয়ারিংটা পুরো একটা বছর, আমাকে তিনি বুঝিয়ে ছিলেন ; বলেছিলেন -তুমি পারবে। সত্যিই আমি ঐ শিক্ষা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলাম ; মনে এব ক্রিয়া হতে থাকল............., বুঝছি ঐকান্তিক ইচ্ছাই -ইচ্ছা পূরণ কবে। আমি এক ডজন বাড়ী ত্রিপুরাতে তৈরী করেছি। আমার তৈরী বাড়ী বনই দেখে খুব পছন্দ করেছিলেন। বলেছিলেন - আমি জানি যে তুমি পারবে।

মেজো জামাই বাবু, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ, তিনি আর্টিষ্ট মানুষ, আমাকে ছবি আঁকতে উৎসাহিত রেখেছিলেন। আমার অঙ্কন দেখে তিনি বলেন - আমি নাকি জন্ম শিল্পী। আমি নিজেও অবাক হচ্ছি একটা বছরে ১১৫টা ছবি কি করে আঁকলাম! সহসাই বা ছবি আঁকতে ইচ্ছা হল কেন? কেউ যেন ঘুম থেকে উঠে আঁকতে আরম্ভ করল। আমার মেয়েরাও আঁকতে লাগলেন। আমার মনে হয় ঐ ধারা ক্রমাগত চলতে থাকবে।

যুদ্ধের জন্য ত্রিপুরা ছেড়ে এসেছিলাম। এলাহাবাদে বোধ হয় ২/৩ মাস থাকতে হবে। এখানে ষোড়শীকে সম্প্রদান করা হবে - ঝারি উদয়পুর রাজা সাহেবের হাতে। দাদা আসবেন নাকি। ফাকামাউ কাসেলে আমরা আছি, ঐ বোনের বিয়ে হয়ে গেলে আমরা যাব বারিয়া ষ্টেটে, কেউ যাবেন- টি হরী গড়ওয়ালষ্টেটে। সেখানের রাজাও দাদার মাসীর ছেলে।

ফাপামাউ কাসেলের কম্পাউন্ড আমাদের রাজবাড়ীর মতই বেশ বড় ; গঙ্গাপারে চমৎকার স্থানে -অনেকগুলো বিল্ডিং ফাপা মাউয়ে ছিল। এর ভিত্তিপত্তন করেন পদ্মজং জেনারেল। তিনি এসেছিলেন নেপাল হতে ; তিনি মাতা বড় মহারাণী, মাতা মধ্যম মহারাণীর, পঞ্চম মহারাণীর বাবা, ('দাদ মহারাজের - মাতামহ')। আমরা দাদার ও মাতা মহারাণীদের সম্পর্ক রক্ষা করে - মামা, দাদা, দাদু, মুয়াজুই বলি। আমাব মানি মাতা চতুর্থ মহারাণী পিত্রালয় নেপালে রাজ ফার্মিলিব মেয়ে তিনি।

পদ্মজং জেনারেল মেয়েদের কোন না কোন বাজা, মহারাজদের সাথে এদের বিয়ে হয়েছে, ছেলেরাও অনেকেই বোনদের রাজ্যে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু আমি জানলাম পদ্মজং জেনারেল জ্যেষ্ঠ ছেলের নাম রাজজং মেঝো ছেলের নাম যুবরাজ জং। এদেব কোন রাজ্যে চাকরী করতে প্রয়োজন হযনি। তাঁদের ছেলের নাম পরাক্রম জং ও তেজরাজ জং (শিবফোঁটা) গোকর্ন জং ছোট ভাই, কিছু বছর ত্রিপুরায় ছিল।

মাতা বড় মহারাণী পরাক্রমের বাড়ীতে থাকছেন, আমবা শিবের গেষ্ট।

শিবের কোন পাত্তা নেই, কখন আসে, কখন যায জানিনা, হঠাৎ একদিন দেখা হল পরাক্রমদাজীর বাড়ীতে।

বলেছিলাম - কেমন আছ ; তুমিত আমাদের খোঁজই নাওনা। শিব বলেছিল - কি খোঁজ নেব. নিজের বাড়ীতেই ত আছ। তাছাড়া - দাজীর (দাদাব) এখানেইত সারাদিন থাক , খোঁজ খবর নিই বৈকি।

তার কথা শুনে দাজীও আমি হেসেছিলাম। বললাম - তাই তুমি খোঁজ নাওনা?

শিব চুপ করে ঠায দাঁড়িয়েছিল, বললাম - চলচল উঠানে বসি অত্যন্ত গরম লাগছে। যেতে যেতে বলেছিলাম -তোমাকে আজ একটু উপেদেশ দেব।

কি উপদেশ দেবে দাও না ; আমি ত শুনতে বাজীই আছি। সবাই যা বলে - তাই ত? গাঁজা ভাঙ্গ মদ খেওনা। (আমবা খাটিয়ায় এসে বসলাম) সে বলল নাও যত ইচ্ছা গাল দাও।

বললাম, কেন গাল দেবো বলত? সে বলল - সবাই বলে আমি উচ্ছন্নে গেছি, আমাব চালচলন নাকি ভালনা।

বললাম, আরো বলে - তুমি নাকি কার কার ছবি আঁক, সত্যি?

ও হ্যাঁ, সত্যি।

আমি ত অনেক ছবি এঁকেছি, সব ফেলে এলাম।

দেখি - তুমি কেমন ছবি এঁকেছ?

সে উঠে গিয়ে ছবি এনে আমাকে দিল ; দেখলাম সস পেন্সিলে আঁকা। আমি তার কাণ্ড দেখে না হেসে পারিনি, শুয়ে চিঠি লিখছেযেন। বললাম - শকুন্তলা নাকি? আঁকার বিষয় আর পেলে

না? তা এমন কেন? সে আমার কথা শুনে হাসল। বলল - শরীরটা আঁকতে আঁকতে চেহারা, ভাবভঙ্গি এমন হয়ে গেল।

"তুমি আঁক, আমিও আঁকি, তুমি গাও, আমিও চেষ্টা করি ; যা যা তোমার ভাল লাগে - আমারও তা ভাল লাগে। এখানে সবাই মনে করে আমি তোমার ভক্ত। দাজীও প্রায়ই তোমার কথা বলেন, আমাকে উপদেশ ঝাড়েন, বলেন এটা করনা, ওটা খেওনা।"

বললাম- বাজে জিনিষ খাও কেন, ছাড় ওসব।

সে হেসে বলে জিনিষ কেউ খায় না কি। তবে ত চেয়ার টেবিলও কিছু থাকবে না। তার কথা শুনে সেদিন আমরা সকলেই হাসলাম। তার সরল ব্যবহারের কথা - যেমন ভাল ছিল, চেহারাও ছিল তেমনি, কিন্তু আমার মনে সে একটা ছোট ছেলের মত। অনেকে ওর জন্য দুঃখ বোধ করেন, আমিও দুঃখ বোধ করি ; জানি—– তাঁর জীবন আর শোধরাবে না। ওর বৌ ছেলেমেয়ের জন্য ভাবি। মাতা বড় মহারানী তাকে নিয়ে নৈনিতাল যাবেন নাকি, সেখানে শিবের স্বাস্থ্য কিছু ভাল হবে ভাবলাম। শিব আমার চেয়ে ৩/৪ বছরের বড় হলেও ছেলেমানুষ মত ছিল ; তাঁর জন্য স্নেহ অনুভব করি।

মঙ্গলমতে আমাদের ছোটবোনের বিয়ে হয়ে গেল। দাদা মহারাজ এসেছিলেন। উনি ঘুরুকে মেয়ের মত ভালবাসতেন। যাবার বেলা ছোট বোনটা আমাকে জড়িয়ে কেঁদেছিল : দাদা আমার দিকে তাকাতেই আমি অন্য দিকে চোখ ফেরালাম। কোন বোনই আমাদের সুখে থাকেনি। কেউ অকালে টি. বি. রোগে মারা গেল, কেউ যৌবনে ২১ বৎসর বয়সে বিধবা নানাহ রকমে একটা না একটা দুঃখ সবার জন্য তোলা ছিল যে। যাক্ ও সব কথা ; ঘুরুর মঙ্গ ল হোক, ও বড় সরল - ভাবপ্রবন মেয়ে, বয়স ও কম ; চিন্তা হয়েছিল - এই বিয়ের নামে বনবাস্ সহ্য করতে পারবে কি? কারণ - ঝারি উদয়পুর তাঁর শ্বশুরবাড়ীটা আমাদের জন্য পাড়াগাঁ মত , জনবসতি খুবই কম, পরিবার সঙ্গীসাথী নেই বললেই হয়। কী করে জীবন কাটাবে। তার ভবিষ্যৎ যেন দেখতে পেলাম।

আমরা কেউ বিয়ের জন্য ব্যস্ত ছিলাম না। ত্রিপুরাতে আমাদের জীবন উৎসবময় ছিল। নাটক বসন্ত উৎসব, দুর্গাপূজা উপলক্ষে কলিকাতা থেকে ষ্টার থিয়েটার আসতো, সিনেমা আসত। নামকরা ওস্তাদরা আসতেন, সানাই বাজত। বৈশাখী মেলা আনন্দ - আজও ঐ রূপ কোথাও দেখলাম না। ত্রিপুরাতে আমরা সুখেই ছিলাম। দিদিদের দেখেছি - একটা গণ্ডীর মধ্যে ওঁরা ছিলেন ; বিয়ের পর ত্রিপুরায় এলে তাঁরা নিঃশ্বাস নিত যেন। বিয়েটাই আমাদের জন্য বড় কথা ছিল না ; শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় ওঁরা কাঁদত, সবাইকে ছেড়ে যাবে বলেই কাঁদেনি ত্রিপুরার জন্যই কাঁদে। আমিও কেঁদেছিলাম যাবার বেলা ফিরে এসেও কাঁদলাম, যখন পাখী নীড় হারাল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ত্রিপুরার সংস্কৃতি নাচগান, পর্ব্বগুলো -একে একে লোপ পেয়েছিল। আমার বিয়ের মিছিল অর্দ্ধপথে এসে যখন ফিরে গেল, আমার জীবনের গতিও মোড় নিল। আমি জানতে পেরেছিলাম - আমার মা, ভাইদের অবস্থা। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে, তা আমি বরদাস্ত করব না নিশ্চয়, এটা ত্রিপুরার অনেকেই জানতেন। এখানে আমার সাথে

বোনদের ও অনেকের সঙ্গেই আমার পার্থক্য ছিল। যা আমার ন্যায্য বলে মনে হয়েছে - তা আমি নিয়েছি, যা করতে হয় করেছি ; এখানে কোন ওজর আপত্তি মানিনি।

যুদ্ধ শেষে যখন ঐ কার্ত্তিক বন্ধুটি বললেন - আবার সেই পুরোনো বিয়ের কথা ; বললাম বিয়ে করতে রাজি আছি কিন্তু একটা শর্তে ; আমার ঐ কথা শুনে অবাক হয়েছিলেন ; বললেন - বিয়ের জন শর্ত কেন? এমনিতেও আমি তোমার কথা ফেলিনা। বললাম - ও সব বাজে কথা; তুমি যা পত্রে লিখেছ — তাও। তোমার স্ত্রীর উপর রাগ করে শুধু বিয়ে করনি ঐ অল্পবয়সী মেয়েটাকে। মোহগ্রস্ত হয়েছিলে, আমার দাদারা তোমার বিয়ে দিয়েছেন।

আমার সাথে তোমার বন্ধুত্ব, দাদারা পছন্দ করতেন না। এখন আমি কাকেও গ্রাহ্য না করে বিয়ে করতে রাজি আছি। এরা যখন আমার কথা ভাবে না, আমি ভাবিয়ে তুলব বৈকি।

বন্ধু বললেন - শুধু এরজন্য বিয়ে করবে? আমাকে ভালবাস না? ওর কথায় আমার দুঃখ হয়েছিল। বলেছিলাম - ভালবাসি। কথাটা মিথ্যে ছিল না। আমি রোজ ওদের বাড়ী যেতাম, সে আমাকে নিয়ে যেত, অনেক রাত পর্যন্ত ওদের আড্ডায় থাকতাম। আমার সহোদরের বাড়ীতেও প্রায় আড্ডা জমত, কিন্তু একদিন আমার দাদা আপত্তি তুললেন ; আমি বললাম - এটা আমার ইচ্ছা, তুমি যেতে পার। আমি এর সঙ্গে যাচ্ছি। হৈ চৈ পড়ে গেল ; মাকে বললাম, আর পথ নেই এছাড়া। আমি সব কিছু জেনেশুনেই ওঁকে বিয়ে করছি।

আমার মা'র চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছু করার ছিল না ; মহামান্য দাদা নাকি রাগে ফেটে পড়েছেন - আমার চিঠি পড়ে। তাঁকে লিখেছিলাম, শত কোটি প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন- আমার বন্ধু স্বজাতি, আত্মীয়ও বটে ; আমি তাঁকে ভালবাসি, তিনি সুশিক্ষিত, রূপবান। আমরা বিয়ে করব মনস্থ করেছি। আপনার এক পয়সা ও খরচ হবে না, পিতৃবাজ্যে আরামেই থাকব। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদই করবেন আশা করা যায়।

আপনার মামার ছেলে, মামীর ছেলের চেয়ে কাকার ছেলেই ভাল মনে হল। আমাকে অন্য বোনদের মত বিয়ে দিতে পারলেন না, ষ্টেটে বিয়ে দিতে হত। আর ত ভাবনা নেই। আমি ইচ্ছা করলে খৃষ্টান, মুসলমান, যা ইচ্ছা হতে পারি ; আপনার সমাজ, স্ব পরিবার নিয়ে সুখে সম্মানে থাকুন। আমার ন্যায্য প্রাপ্য পেলে কোন দাবী থাকে না। ন্যায্য প্রাপ্য হতে যদি আমার দাদাদের মত বঞ্চিত করেন, অন্যপথে যেতে বাধ্য হব।

আমাদের মহামান্য দাদা, আমার পত্র পড়ে নাকি দুঃখ পেলেন। বুঝলে অনুপ? আমাদের দুঃখের তুলনায়— তাঁর ঐ দুঃখ কিছুই না। বৈমাত্রেয় হলেও ঐ দাদাকেই সম্মান করতাম। তাঁর বহু গুণের জন্য। তিনি উপযুক্ত রাজা ছিলেন, এতে সন্দেহ নাই। মহারাণীদের সমান মাসোহারা আমাকে দেওয়া হল, কিন্তু বিয়েটা অনুমোদন করলেন না। আমাকে যা বললেন - তা না-ই জানলে। আমার জন্য সব ব্যবস্থাই হল ; কাকার ছেলেকেও বললেন এমন অনেক কথা - যা ওর জন্য নিরাপদ ছিল না। আমার দাদার বেশ কিছু মোটর ছিল ; আমার মাতা ঈশ্বরীর বরাদ্দ মোটরটাও হাজির থাকত। আমি নাকি সম্পূর্ণ স্বাধীন, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা যে চাই নি ; আমার নিয়মে আমি চলি যা মনে ধরে তাই করি। জন্ম থেকেই আমি স্বাধীন। নৈনিতাল, শিলং, মুসৌরী আমরা সবাই মানিদের সাথে যেতাম, বড়দিনে কলিকাতায় দু

একমাস থাকতাম। একবার হঠাৎ আমার ইচ্ছা হল পণ্ডীচেরী যেতে ; সেখানে শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে থাকতে ইচ্ছা হল ; নীলুরায় যোগাযোগ করে দেন দীলিপ রায়ের সঙ্গে, তিনি থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ফ্রান্সের মেয়রের অতিথি হয়েছিলাম পনেরদিন মাত্র। আমার বন্ধুবর আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। কিছুতেই আমাকে একা যেতে দিল না। সাউথের পুরোপুরি সব স্থান দেখে ফিরে এলাম। কোচিন, আমার ভাল লেগেছিল। ত্রিবান্দ্রমের মেসকট হোটেলে ছিলাম। তিনদিন ছিলাম - কৃষ্ণরাজ সাগরে। কন্যাকুমারী পর্যন্ত গিয়েছিলাম। পণ্ডীচেরীতে থাকা আমার ভাগ্যে নেই যে। ফিরে এসে জানলাম আমার দাদারা কাকা রণবীর সহ বঞ্চিত হয়েছেন। এরাই ত্রিপুরা মহারাজের সকসেসার, যত দিন না মহারাজের সন্তান না হয়। দাদাদের সেই কলেজ আজমীরে পাঠাতে হয়েছিল।

দাদা মহারাজ সাবালক হওয়ার পর দাদাদের পড়া বন্ধ হয়, কিন্তু মেঝো দাদাকে পিছিয়ে রাখতে পারা যায় নাই। সে স্বাবলম্বী হতে পেরেছিল। রাজ্য মার্জ হওয়ার পর আমার মাসোহারা বন্ধ করা হয়, ধারণাতীত কষ্ট পেয়েছিলাম। আবার মুকাবিলা করতে হল ভাগ্যের সঙ্গে। দাদা মহারাজের মৃত্যুর পর আমাকে বিয়ে করতে হয়েছিল ; তাঁদের বাড়ীতে আমি সুস্থির ছিলাম না। কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হয়েছে। আমার ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাটাই আমি কাজে লাগালাম। আমার বন্ধুবর মিলিটেরী চাকরী ছেড়ে দিয়ে ত্রিপুরা এডমিনিষ্ট্রিশনে কাজ নিলেন ; তাঁর সম্মান ছিল, বুদ্ধিও মন্দ ছিল না, তাঁর সব বুদ্ধিই পলিটিসিয়েনরা কাজে লাগালেন । তিনি সোজা মানুষ, সোজা পথে চলতেন, শান্তিপ্রিয় ছিলেন। বন্ধুদের নিয়ে মেতে থাকতেন। পূর্বের মিলেটারী অভ্যাস জন্য ১০ টা বাজলেই অফিস যেতে প্রস্তুত হতেন, কিন্তু তিনি থেকে গেলেন - যে রাম, সেই রাম। আমার ছেলেমেয়ের জন্য আমাকে ভাবতে হল। দশভূজা হতে হল আমাকে। রোদে পুড়লাম, জলে ভিজলাম ; কংগ্রেস পার্টিতেও কিছুদিন ছিলাম, কিন্তু মত মিলল না। কংগ্রেস বলতে মহাত্মাগান্ধীকেই বুঝেছিলাম, কিন্তু এছিল আমার ভুল। সবাই মহাত্মা হতে পারে না যে। বিশেষ করে টেবিল চাপড়ে কথা বলাটা সহজ হলনা। ইন্দিরাগান্ধীর ব্যবহার ভাল ছিল, ভদ্র ছিল। তাঁর সময় মেয়েদের ইলেকসনে দাঁড়াবার অধিকার মেয়েরা পেয়েছিল কিন্তু পার্টি লিডার তা নাকচ করায় এর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করেছিলাম। জয় পরাজয়ের জন্য দাঁড়াইনি, হার-জীত আমার জন্য সমান ; জীতলেও মন্ত্রী হতে পারব না, আমার কোন দল নেই ; আমি নির্দলীয় মানুষ। তবে দেশবাসীর অবস্থা প্রকাশ করতে পারব, সত্য প্রকাশ করার সাধ্য আমার আছে। প্রতিকারও কিছু হতে পারে মনে হল। আমার সংরক্ষণ ক্লাব মেম্বাররা ইলেকসনে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন, ওরা এসেম্বলিতে মেয়েদের মুখপাত্র চেয়েছিলেন। রাজনীতি বুঝি না বুঝি মানুষের প্রয়োজনটা বুঝেছিলাম। দেশের উন্নতি মানে শুধু রাস্তাঘাট নয়, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, যন্ত্রপাতি নয়। মানুষই ওসব, নিয়ম নীতির মধ্যে জীবন পরিচালনা করে। মানুষের বোধও জ্ঞান না থাকলে সবই বৃথা হয়। ত্রিপুরাতে এটাই ব্যর্থতার কারণ বলে মনে হয়েছে। এ রাজ্যে ডিসিপ্লিন, শাসন সম্বরণ নেই জানলাম। শক্ত বিষয় ও মিউনিসিপ্যালিটির জন্য বিধান দরকার, এ হল আমার ধারণা। এও বুঝছি -জোর জবরদস্তিতে কিছু হবে না। শ্যাম-কূল দুটাই রাখতে হলে কার্যতঃই মানুষকে সহজ সুন্দর

জীবন দিতে হবে। এটা আমি বুঝলাম এবং তা অসম্ভব নয়। দেশের আবর্জনা নোংরা পরিষ্কার করতেই হবে, কিন্তু তা চণ্ডীগড় প্ল্যানিং যিনি করেছেন - তাঁদের মত লোকদ্বারাই সম্ভব হয়। নীতি রক্ষা করে দল অর্গানাইজ করা, ও রাজ্য পরিচালনা করা, এক কথা নয় যে। রাজ্যত যেন তেন প্রকারেন চলছে, চলবে কিন্তু মানুষের অবস্থার হেরফের হবে না। জনশিক্ষা ছোটবেলা থেকেই দিতে হয়। ঐ শিক্ষা দেওয়ারও নিয়ম আছে। আমার বন্ধুবর মনে সমর্থন করতেন - আমার কথা, কিন্তু বড় রুক্ষ হতেন, তর্ক উঠত ঐ সব কথায়।

আমি রাজবাড়ীর মেয়ে, পিতা প্রপিতামহদের ধারাগত শিক্ষা ও দেশভ্রমণ এবং ঘাত প্রতিঘাত, তা আমাকে প্রস্তুত করেছিল, স্বনির্ভর হয়ে বাঁচতে। নানাহ পরিস্থিতিতে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম বৈকি।

ধারাগত শিক্ষা বলায়, অনেকে বোধ হয় কষ্ট হবেন, কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝবেন, নিশ্চয় বুঝবেন, ক্রমাগত শিক্ষা, অভিজ্ঞতাতেই মানুষ দক্ষ হয়। প্ল্যানিং, অত্যন্ত গুরুতর বিষয় ; পুঁথিগত বিদ্যায় শুধু তা হয়না। ত্রিপুরার অফিসাররা ব্যয় করতে জানেন, আয় করতে জানেন না বলাতে - আমার প্রতি অনেকে অসন্তুষ্ট হলেন বটে, কথা কিন্তু সত্য। জিজ্ঞাসা করেছিলাম - ইউরোপে বেকার নাই কেন? বেকারদের দায়িত্ব তাঁদের সরকার বহন করতে সক্ষম হয়েছেন দেখা যায় ; এর কারণ জানেন আপনারা? কর্ত্তার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমার বন্ধু কর্ত্তা, মানুষ, বিয়ের পর আমি তাঁকে কর্ত্তাই ডাকি। তিনি বললেন, যারা প্ল্যানিং করেন তাঁদের উপদেশ দাও, আমরা চাকরী করি, আমার বন্ধুরাও প্ল্যানিং করেন না। তাছাড়া সংবিধানের নিয়মে চলতে হয়। কাজ কর না কর, ভোট পেতে হবে, হারতে হবে তোমাকে, তা চোখ বুঁজেই বলা যায়। ইলেকসনে হার হতে পারে, আপত্তির কি আছে, মেয়েদের অধিকার নেই। কর্ত্তা বললেন, তুমি মন্ত্রী হলে কী করতে শুনি? প্রথমে তোমার ডিপার্টমেন্টে হাত দিতাম। টাউন প্ল্যানিং - এর জন্য অভিজ্ঞদের আনতাম, আমার ইচ্ছা জাহির করতাম। আয়ের পথ করে প্ল্যানিং করতে বলতাম। এমন একটা পার্ক বানাতাম যেখানে বেকাররা কাজ পাবে। ঐ পার্কের নমুনা, আমিই মডেল তৈরী করে দেখাতাম। সেখানে আনন্দ থাকবে, দেশের ভাবরূপ পরিষ্কার থাকবে, নিত্য নূতন উৎসব অনুষ্ঠান থাকবে, শিল্পী ও গায়ক, বাদকরা, জ্ঞানী গুণীরা আদৃত হবে, এমন সব ব্যবস্থা করতাম। "বার, পানপানীয় থাকবে না?" বললাম - নিশ্চয় থাকবে - একটা নিয়ম নীতির মধ্যে। নিয়ম মেনে চলার শিক্ষা হবে পার্কে। তোমার মন্ত্রীত বুলডজার দিয়ে ঘরবাড়ী ভেঙ্গে, রাস্তা বড় করতে চান, আমি দেখিয়ে দিতাম - কারুর বাড়ীঘর না ভেঙ্গে রাস্তা চওড়া করা যায়। " আমার চাকরী থাকবেত?"

তোমার চাকরীত - দিল্লী নগরী গিয়ে ডেভলপমেন্টের জন্য টাকা আনা ; তোমার চাকরী না থাকলে -চাকরী থাকবে কার? এখন যেমন নিশ্চিন্তে আছ, তেমনি নিশ্চিন্তে থাকবে। ওরা দুহাতে টাকা খরচ করেছে, আমি দশ হাতে খরচ করতাম। বললেন - " তোমার উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, এটা ইণ্ডিয়া - বুঝলে? " তোমার পার্ক, অশোক বনে পরিণত হতে বেশী সময় লাগবে না, হনুমানের অভাব নেই। দশ হাত দিয়ে আগলে রাখতে পারবে না বুঝলে? দেখলে অনুপ, আমি কেমন গল্প লিখতে পারি? যাক্ সেসব কথা, আমি আবার পূর্ব্ব কথায় ফিরে

যাচ্ছি।

সেকেণ্ড গ্রেটওয়ারে এলাহাবাদ হয়ে - আমাদের আসতে হয়েছিল - বারিয়া ষ্টেটে। সেই যে এসেছি প্রায় দুবছর হতে চলল। আমরা আছি ছোটদিদির শ্বশুরবাড়ীতে। ত্রিপুরার অনেকে এসেছেন আমাদের সাথে। কিছু গেলেন টেরী গড ওয়াল ষ্টেটে, কিছু থেকে গেল এলাহাবাদে। এখানে মহারাজকে বাপজী বলা হয়, মহারাণীকে বাসাব। দিদিকে যুবরাণী সাব।

শুনলাম এক কালে এ রাজ্য উৎসবময় ছিল , যুবরাজের মৃত্যুর পর থেকে ঝিমিয়ে গেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া কিছু হয় না। দেখলাম কাকা সাব বাপজীর ছায়ামত থাকেন, একই রকম পোষাক পরেন, প্রতিদিন একসঙ্গে বেড়াতে যান -মোটরে করে। বাসাব কাকীসাবও প্রায় তাঁদের একসঙ্গেই দেখছি।

এখানের রাজপ্রাসাদ মন্দ নয় ; দিদি- ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে থাকেন, আমরা তাঁর সঙ্গে আছি প্যালেসে। বাপজী থাকেন - কম্পান বঙ্গালায , ছোট রাজকুমার হীরাসিংয়ের মহলে। আমাদের সাথে যাঁরা এসেছেন তাঁদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে পাহাড় কুঠি নামে একটা দোতালা বাড়ীতে। থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা নেই , অসুবিধা হল কিছু ভাষার ; কিন্তু এখানে সবাই উচ্ছল আনন্দে, অবাধ গতিতে বেশ আছেন।

এ রাজ্যে বিস্তৃত পলো গ্রাউন্ড আছে, অসমাপ্ত সাগরমহল আছে। পার্ক মত সুন্দর বিস্তৃত বাগান আছে। ওতে স্থানে স্থানে দেখলাম সাদা পাথরের অনেক মূর্ত্তি। মন্দিরের মত করে পিলার দেওয়া সাদা পাথরের নির্মিত স্মৃতিসৌধ দেখলাম, ওতে মহারাজের পিতার মূর্ত্তি রাখা হয়েছে। এর চারদিকে সিঁড়ি, অনেক ধাপ ছিল। আমরা মাঝে মাঝে ওখানে সিঁড়িতে বসে গল্প করি। কোন চেয়ার বেঞ্চ রাখা হয়নি।

এ রাজ্যে গুজরাটি ভাষাতে কথাবার্ত্তা হয় . রাজ্যটি ছোট, সুন্দর সাজানোগোছানো, আমার মন্দ লাগেনি। সুব্যবস্থা আছে। হাসপাতাল, স্কুল হাটবাজার গেষ্ট হাউস, সবই ছিমছাম। পুরাণ কিল্লায় গরবা হয় দুর্গাপূজায়। রাণী মহারাণী যুবরাণীসাব ও ঠাকুরের স্ত্রীরা গরবা নৃত্য করেন। প্রতি বছরই এ নিয়ম পালন হয়। ছোট ছোট ঘড়ায় (পাতিলে) আংটী দিয়ে শব্দ তোলেন। আবার খাটো খাটো লাঠি নিয়ে তাল রেখে একের সঙ্গে আর একজন মুখোমুখি হয়ে চক্রাকারে ঘোরেন, একটু অমনোযোগ হবার জো নেই।

হোলীতে বহুদূর হতে, ঢোলকে সঙ্গীত শোনা যায় অনেক রাতে ; খেলা নৃত্য, রাজবাড়ীতে হয় না। একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে এ রাজ্যে সব থেকেও কিছু নাই মত হয়ে আছে।

যুবরাজের স্মৃতি বহন করে পলো-গ্রাউন্ডটি আছে। এখনও দেখা যায় দু চারটা ঘোড়া। দিদির ছেলেমেয়েরা ঐ ঘোড়াগুলোতে চড়ে। মহারাজ কুমারের বন্ধুরা, তাঁর কাকার ছেলে পৃথ্বীসিং অন্য রাজ্যে চলে গেছেন। কাকা সাব ছাড়া এমন কাকেও দেখি নি ; আমাদের বারিয়া থাকাকালেই তিনিও মারা গেলেন বোম্বেতে । বাপজী মহারাজের জন্য আমার খুবই দুঃখ হল, নিঃসঙ্গ হলেন।

দিদি সবসময় বাগান নিয়েই সময় কাটান, আমরা আসার পর আমাদের সঙ্গে গল্প করেন, রান্না করেন। সবজী কুটতে ভালবাসে দেখলাম, এটা সকালে প্রতিদিনই হয়। আর একটা অভ্যাস -

জানালার ধারে বিকাল চারটা থেকে প্রায় দুঘন্টা বসেন ; বেশ লম্বা জানালাটায় পেতলের ঝকঝকে পাইপ দেওয়া ছিল, ওখানটায় বসবার জন্য লম্বা গদি, মোড়ান আলমিরা ; ওতে অনেক বই সাজানো হয়েছে, তা কাঁচ লাগান আলমিরা মত। দিদির বই পড়ার বা' ্কে আছে ; কিন্তু যখন ঐ জানালায় বসতেন, দু চারঘন্টা কথা বলত না। চা আসত, জুড়িয়ে যেত, আমি একদিন ঐ জানালায় বসলাম, যখন চা এল, বললাম - এক চামচ চিনি দিয়েছি, দু চামচ দিচ্ছি, আবার দিচ্ছি বলতে —বললেন- এ তুই কি করছিস।

আমি নানাহ প্রকারে দিদিকে খুশী রাখতে চাইতাম ; তার সাথে প্রতিদিন চাইনিস চেকার খেলতাম, হারাতাম। কেরাম ভাল খেলেন। আজকাল চাইনিস চেকারেও জিতছেন। এটা আমার সহ্য হবে কেন, মন দিয়ে খেলি।

দিদির একটা লাইব্রেরী আছে, বেশীর ভাগই উপন্যাস ; শরৎচন্দ্রের সবকটিই আছে। রবীন্দ্রনাথের বহু পুস্তর সাজিয়ে রেখেছেন, ধর্ম্মপুস্তকও বেশ কিছু আছে। আমরা দুপুরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ি। প্রতিদিন সকালে বিকালে, রাত্রে, রেডিওতে শুনি যুদ্ধের খবর, আর দিদির সাথে ঝগড়া খুঁজি। দিদি এতে বেশ মজা পান।

আমার এই দিদির অনেক গুণ আছে ; প্রথম যখন ওর হনলুলু গার্ডেনটা দেখি, অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এমন রুচি সুন্দর বাগান খুব কমই দেখেছি। মস্ত বড় চৌক লেক পাড়ে — বাঁধা ছিল একটা ছোট্ট নৌকা, ওতে দুজন বসে চা জলখাবার খেয়ে গল্প করা যায়। র'কাঠের ঘর ছিল বারান্দাযুক্ত ; ছোট ঘর। এর আশেপাশে ছিল ঝাড়ঝোপ, জংলা ফুল। খুব স্বাভাবিক করে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে খাপ খাইয়ে রাখা হয়েছিল। একটা বেশ বড গাছ ঘিরে বার তৈরী কবা হয়েছে দেখলাম (পান পানীয় ওতে চলে)।

আমরা সকালে বিকেলে রোজ ঐ বাগানে যাই ; মাঝে মাঝে পার্টি হয়, খাওয়া দাওয়া ওখানেই হয়।

আজকাল আমাদের কিছু ব্যতিক্রম হচ্ছে ; অনেকে বেসামাল হয়ে পড়ছেন। তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চেষ্টা করেও ঐ স্বাভাবিক অবস্থা আমার হলনা, এটা আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে ; মেতে উঠতে পারলাম না। পেছন হতে কে যেন আমাকে ধরে রেখেছে। আমার সাথে তাদের ব্যবধান সবার অলক্ষ্যে সৃষ্টি হল। দিদি কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। আমার সঙ্গেই সবসময় হাসেন, বলেন, আমার জন্য বিশেষ করে পরিবেশন হয় স্নেক ইত্যাদি। মাঝে মাঝে কক্‌টেল দেন। আমি তা নিতে মোটেও আপত্তি করি নি। আমাদের দিন কেটে যাচ্ছে..... একদিন একটা পার্শেল পেলাম। পাঠালেন সেই বন্ধুটি। পার্শেল খুলে দেখলাম, ওতে ৪/৫ বোতল হোয়াইট ল্যাবেল হুইসকি, দু বোতল গর্ডন জিন। শান্তা আপ্তের একটা রেকর্ডও চিঠি। লিখেছেন অনেক বাজে কথা, সত্য কথা হল আবার বিয়ে করেছেন।

দিদিকে দিলাম হুইসকি, জিন, চিঠিটাও পড়ে শোনালাম, দিদি বিরক্ত হয়ে বললেন, হুইসকি-জিন পাঠিয়েছ, বেশ করেছ ; আমি রাজপুতের বৌ, ট্রাইবেল মেয়ে, ওসব ড্রিঙ্ক-এর জন্য নিশ্চয় ধন্যবাদ দেব। আবার রেকর্ড চিঠি কেন ; কেউত জবাবদিহি করছে না। এসব শান্তি নিকেতনী ঢং বুঝলে?

গরীবের মেয়ে বিয়ে করেছে বলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে চিঠি লেখাটাই বিরক্ত লাগে।

দিদির রাগ দেখে না হেসে পারিনি। হেসে হেসেই বললাম, আজই একটা পার্টি দেবার ব্যবস্থা করে হেলথ ড্রিঙ্ক কর। এরপর কিছু প্রেজেন্ট পাঠান যাবে।

অনুপ, এখন তুমি বুঝতে পারছ - কেন ওর বিয়ের কারণ যা ও লিখেছে, মিথ্যা বলেছি? তার ঐ চিঠির কথা উল্লেখ করে যা বললাম তাতো তুমি জানলে?

আমার মনে কোন আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি বললে মিথ্যা হবে। বিভোরের স্মৃতি আঁকড়ে ধরেছিলাম কিন্তু নৌকাডুবি হয়ে গেল, যখন জানলাম বিভোর আর ইহলোকে নেই, কোনদিনই সে আর ফিরে আসবে না। আমি যে বুঝেছি - আমার সামনে ভবিষ্যৎ নাই, অতীতও ক্রমে মুছে যাবে। আমাকে - বর্ত্তমান সময়টা অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছিল।

যুদ্ধের ভালমন্দ পরিণামও আমাকে ভোগ করতে হবে। মন ভাল না থাকলেও হাসি খুশীই থাকছি।

আমরা একমাসের জন্য বোম্বে এসেছি- দিদির সঙ্গে। উদ্দেশ্য হল - কিছু পবিবর্ত্তন। আমি ত জানি দিদির কোন পরিবর্ত্তন হবেনা ; ঐ বেশভূষা ঐ রান্না নিয়েই থাকবে। আমাদের ছড়ানো ছিটানো ভুরু কিছু ঠিক হবে, চুলও কিছু কাটছাট হবে, প্রতিদিন বিকালে বেড়াব, সিনেমা দেখব। কিন্তু দিদিটা ঘোর বিরোধিতা করলেন, বললেন চুলকাটা হবে না। ছোটবোনেরা আমার দিকে করুণ চোখে চাইল , বললাম - এখন চুপ করে থাক, পরে মনোবাঞ্ছাটা পূর্ণ করে দেব। একদিন আমি ওদের চুল খাটো করে দিলাম, দিদি মারমুখী হয়ে এলেন। বললাম - বেশ করেছি ; ওদের চুল কাটলে তোমার কি? তোমার কী নুকসান হল শুনি? বেশ ভাল দেখাচ্ছে, হিংসে করছ কেন?

বললেন, কাটতেই যদি হয়, বিউটি পার্লারে গিয়ে মানানসই করে কাট, তোর ইচ্ছায় কাটবে নাকি?

যাওনা নিয়ে, এমন মুখ ফুলিয়ে রাগ করার কি আছে। দিদি ওদের নিয়ে গেলেন ; বোনেরা ডানাকাটা পরী হয়ে এল ; " তুইও চল্ না, বাঁকা ভুরু তোকে মানায় না, আমার মত কর"। দিদির দিকে চেয়ে একটু হাসলাম বলে আমার পীঠে ছোট একটা কিল বসিয়ে দিলেন। এটা ওর আদরের নমুনা।

এরপরও বোম্বেতে আমি বহুবার এসেছি ; সে অনেক কথা। শোক, দুঃখ, উত্থান-পতন ও সি সি আর ক্লাবে ডান্স, পার্টি ইত্যাদি বহুকথা।

অনুপ, ওসব লিখে কি হবে ? যা কিছু পেলাম, হারালাম, যা হয়ে গেল, সময়মত তা আমাকে ফিরিয়ে দেবে না? বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত পথে পা পড়েছে কিন্তু সবার সাথে এক হয়ে মিশে যেতে পারলাম না। ওরা ও আমাকে অন্য জাঁত মনে করে। সবার সঙ্গে ডান্স করতে বাধে, রুক্ষ হয়ে উঠি। আমাকে অনেকে অন্যচোখে দেখে, বিশেষ করে মেয়েরা।

একজন ধনবান, আমার সঙ্গে ডান্স করতে চান ; বলেছিলাম - আত্মীয় ছাড়া ডান্স করিনা। "শচীন নবাব?" ও আমার বড় ভাইর মত বুঝলেন? "রাজা, মহারাজারা, আপনাদের আত্মীয়, না?" তা কিছু সত্যি ; আসল কথা- আমার ডান্স ভাল লাগে না, এজন্য দুঃখিত। আমি নিরামিষ

ভোজী, ড্রিঙ্কের অভ্যাস নাই ; সজ্ঞানে থাকতে হয় আমাকে।

কিছু ভদ্রলোক আমার কথা শুনে অবাক হলেন ; বন্ধুব্যক্তিরাও সাবধান হলেন। কিন্তু অনুপ, তবু আমি এক ধাপ নেমেছি। ভাবতে বিশ্রী লাগে কিন্তু খুব সত্য।

ছোট দিদির জন্য আমার দুঃখ হয়, ওইত আমার কৃষ্ণ দিদি। ও যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী হতে এল, আমাকে দেখে সে অবাক হয়েছিল। বলেছিল - তুইত চমৎকার হয়েছিস ; তোর হাইট কিন্তু আমার চেয়ে কম।

তার সাথে আমাব ভাব তেমন জমে উঠেনি , এক হিতৈষী দিদিব সাথে মাঝে মাঝে, তার কাছে আসতাম ; যখন ভাব জমে উঠল - না এলে বলেছে, তুই যে এলি না?

ও খুব কম কথা বলে, কিন্তু তাব দাবী, তার হাসিটা খুব মিষ্টি ছিল। আমি তাব অপ্রিয় ব্যবহাব সব ভুলেছিলাম। সে আমাকে খুশী করার জন্য যখন সেন্ট, সিগাবেট কেস, চোলী সদরী দিল. সেন্ট নিলাম চোলীসদরী (জামা) নিলাম না। একসময সবার জন্য সে তার দেশের জামাকাপড পাঠিয়েছিল- আমাকে ছাড়া। আজ এই দিদিই দিচ্ছে আমাকে, তা নিতে না দেখে, তার চোখেমুখে দুঃখ ফুটে উঠতে আমি তক্ষুণি সেন্ট, সিগারেট, ব্যাগে পুড়ে কাপড়গুলো নিয়ে ড্রেসিং রুমে গেলাম। আমার কাণ্ড দেখে দিদি চোখ মুছে ছিলেন। সিগারেট টানতে দেখে হেসেছিল। বলল - রোজ আস না কেন? আমি ত চলেই যাব।

দিদি এলে ভীড় জমে, বিভোবও মাঝে মাঝে আসে, আসতাম না ভালবাসে না বলে। আমার সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বি ভাব ছিল। সব ব্যাপাবে আমাকে পিছিযে রাখতে চাইতো যে। সেই যখন বলছে কেন আসনা, একটু অবাক হলাম বৈকি। আমিও কেমনএকটা আকর্ষণ বোধ কবলাম। আমারএই দিদিটি যখন ২১ বৎসর বযসে বিধবা হল, কালো পাড সাদা শাড়ী পড়ে এলো, সে দিনের কথা ভাবলে এখনো আমার মন অস্থিব হয়। দীর্ঘজীবন এমনি নিরানন্দে কাটাবে নাকি? আমার প্রিয় পিসীমা ও বার বৎসর বযসে বিধবা হয়েছিলেন, সেই পিসীর জীবনকথা অত্যন্ত দুঃখের। সারাটা জীবন ব্যথা নিয়ে অন্তিম জীবন শেষ কবেছেন। দিদির জীবনও স্বামী সন্তান শোকে শেষ হল। কোন বোনের জীবনই সুখের হলনা, একমাত্র রেণুকা ছাড়া ; তারও স্বামী মারা গেল। সব বোনের কপালেই দেখছি বৈধব্য যোগ আছে।

অনুপ, আমি নিজেকে বিধবা মনে করিনা কিন্তু সাদা কাপড়ই পরি ; এটা যেন আমার ইউনিফর্ম হয়ে উঠেছে। ভাবছি - রঙ্গিন কাপড় পরব, কেমন কৌতুহল হচ্ছে ; আমার ছেলেমেয়েরা কেমন অবাক হবে, কিন্তু কারণ জানবে না, এই হল - মজা।

বারিয়াতে প্রতিবছর কার্তিকমাসে দু মাসের জন্য গুরু মহারাজ স্বামীজী গঙ্গেশ্বরানন্দ মহারাজ স্বশিষ্যদের নিয়ে থাকতেন। এবছরও তিনি আসছেন। তাঁদের জন্য থাকার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। মহারাজ মণ্ডেলেশ্বর গঙ্গেশ্বরানন্দ দিদির গুরু। বারিয়ার মহারাণী, কাকীসাব, আরো বহুশিষ্য, তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য গেলেন ; আমিও আমার মানি সাথে ত্রিপুরার আরো অনেকে গিয়েছিলাম। রাজা মহারাজরা বরাবরই বহুকাল থেকে সাধুসন্ন্যাসীদের সম্মান করে এসেছেন।

আমাদের দেশেও (ত্রিপুরায়) সচ্চিদানন্দ স্বামী, কালানন্দস্বামী (মাতৃসাধক), দাওজী মহারাজ,

সড়ানন্দস্বামী, সন্তদাসবাবা, যাশিড়ির হংসমহারাজ, গৌড়গোবিন্দ গোস্বামী, অনেকেই মাঝে মাঝে আসতেন। রসমন টিলায় রামমন্দির আছে, দলে দলে প্রায়ই বৈষ্ণব সাধুরা আসতেন - জেঠা নরেন্দ্র কিশোর জীবিতকাল পর্যন্ত। শকুন্তলা রাস্তায় বড় বড গাছ ছিল, দীঘি পারে জগন্নাথ মন্দির সামনে, জটাধাবী বৈষ্ণবসাধুরা ধুনী জেলে বসতেন। ত্রিপুরার সেই তখনকার কথা মনে আসলে উদাস বোধ করছি। মাসীমার কথা মনে পডছে, তিনি তাঁদের সিদা (চাল ডাল) পাঠাতেন। জেঠা নরেন্দ্রকিশোর রাত জাগতেন, ওঁদেব সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন, মাঝে মাঝে বামায়ণ 'তুলসীদাসের' শুনেছিলাম। কি চমৎকার সুরে পাঠ হত।
অনুপ, আমি তুলসীদাসের বামায়ণ হতে যা শুনেছি, না লিখে পারছি না।
শ্রীবাম, খুব উঁচু পর্ব্বতে দূরবীক্ষণ লাগিয়ে বোধ হয লঙ্কা রাজধানী দেখেছিলেন। তিনি নীল ঘন মেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখেন। আব মেঘগর্জ্জন শোনেন। বিভীষণ বলেন, এ মেঘ গর্জন নয, বিদ্যুৎও নয়। নীল সামিয়ানা ওটা ; পাখওয়াজ বাজছে, মহারাণী মন্দোদরীব কানেব দুল চমক দিচ্ছে। আজ উৎসব পালন কবছেন লঙ্কেশ্বর রাবণ। ও কথা বলতেই লক্ষণ তীব ছুড়লেন, মহাবাণী মন্দোদরীব কানেব দুল পড়ে গেল। সকলে আশ্চর্য্য হন, অশুভ লক্ষণ অনুভব করেন , থেমে গেল পাখোযাজ। বাম ও সুগ্রীব, হনুমান, আশ্চর্য্য হয়েছিলেন।
আমি যে কিছুই ভুলি না ; এমন অনেক আলাপ আলোচনা মহাভারত রামায়ণ গ্রন্থাদির শুনেছিলাম, আজ পর্যন্ত আমাকে ভাবিয়ে বাখে। আমি সাধু সন্নাসীদের শ্রদ্ধা করি কিন্তু আত্ম সমর্পন কবতে পারি না। অনেকে মনে করেন- আমি অহংকাবি, কিন্তু তা সত্য না ; সত্য হল আমার সাধ্য নাই।
মহারাজ মণ্ডলেশ্বর এসে পৌঁছলেন , আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। একে একে প্রণাম করলাম। গুরু মহাবাজ সাথে আমাদেব পবিচয় কবিয়ে দেওযা হল। কিছুদিন পর আমাদের ছোট বোনেরা ও ত্রিপুরাব অনেকেই মহারাজেব কাছে দীক্ষা নিল। মহারাজেব প্রধান শিষ্য সর্বানন্দজী ও অনেককে দীক্ষা দিলেন, উপদেশ দিলেন ; বললেন আমাকে দীক্ষা নিতে। বলতে হল, গুরু করতে পাবি এমন শক্তি আমার নাই। দিদিব অনুগতা একজন ভক্তিমতি বললেন - ক্ষিদে পেয়ে শিশু কাঁদে দুধ পায়, আপনি গুরুকৃপা প্রার্থনা করেন অবশ্যই ঈশ্বর কৃপা লাভ করবেন। এঁর কথায মনটা কেমন বিবক্ত হল, বললাম- বিশ্বাস ভক্তি খুব সহজ ব্যাপার নাকি ? আমার ক্ষিদে পাযনি, মিছি মিছি কাঁদব কেন । মণ্ডলেশ্বর ও শিষ্য মহারাজ আমার কথা শুনে হাসছিলেন, কিন্তু দিদি মুখ ভার করে বসলেন। আমি গুরুকে বললাম- আপনার শিষ্যাকে বলুন তিনি যেন বাগটা কম করেন। আমাবও যথেষ্ট রাগ আছে, এইত এক্ষুণি চলে যাব। আমার কথায় তথাকাব মহারাণী অবাক হলেন। তিনি আমাকে ভালবাসতেন, তাঁর দিকে চোখ পড়তে বসে পড়লাম। আমার মা বললেন - এব অপবাধ নেবেন না। ভজন হল, উপাচারে - পূজা হল, ভজন হল। মহাবাজ আমাকে ডাকলেন, আমি তাঁর কাছে গেলাম, তিনি আমাকে মালা পরিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।
মহারাজ ছোটবেলা থেকে অন্ধ, আমার চেহারা দেখতে পান না, মন বোধ হয় দেখতে পান। মহারাজকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি তাঁর বাবহার।

এরপর বাসাবদের সাথে আমিও মা, প্রায়ই সাধু দর্শনে যেতাম, এবার গরমের সময় সন্ন্যাসী মহারাজরা বদরী — কেদার যাবেন, অনেকেই সঙ্গে যাবেন তাঁদের সাথে। আমার মানির (মার) একান্ত ইচ্ছায় আমিও যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। মার লোকজন সবাই যাবে (আমার লোকজনও কম ছিল না।

প্রথমে আমরা পৌছলাম হরিদ্বারে। চৈত্রমাস, হাওয়া বইছিল। গঙ্গা উদাম স্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সবাই আমরা হরকি পৌড়িয়ে স্নান-দান করলাম। আমাদের সঙ্গে পাণ্ডা দুজনও ছিলেন। তাঁরাও বদরি-কেদার যাবেন নাকি । তাঁরা বড় ভদ্র ছিলেন।

হরিদ্বারে, গঙ্গার দুপারে দুটি বিচিত্র জগৎ দেখা যায়; পাশাপাশি তা যেন চলচ্চিত্র । একদিকে লোকবহুল জনতার ভীড়, বেচাকেনার ব্যস্ততা। কোথাও নাচগান হচ্ছে খঞ্জনীতে, ছোট ছেলেরা বাঁশী বাজাচ্ছে, কোথাও প্রবচন বেদ পাঠ হচ্ছে, কীর্ত্তন হচ্ছে ; জোতির্ষীবা ভাগ্য গণনায় ব্যস্ত দেখা যায়। রাজনীতি- বক্তৃতা থেকে আরম্ভ করে ভোজবাজী খেলা, লাঠি খেলা, কিছুই বাদ নাই।

অপর পারে শ্যাম কান্তি নীলাপর্ব্বত যেন ধ্যানমগ্ন। তার উচ্চ চূড়ায় দেখা যায় -মনসা দেবীর মন্দির। তথা সর্ব্বত্র শ্যামের স্নিগ্ধছায়া, প্রকৃতি যেন শ্যামপ্রেমে বিভোরা। দেখা যায় - জনবিরল স্থানে গেরুয়ার আভাস ; বৈরাগী সন্ন্যাসীরা সে স্থানে থাকেন। সে নীরব শান্ত ভূমির নাম কংখল। পথের দুধারে গোলমোহর সুনহার বৃক্ষে ফুল ফুটে আছে। ত্যাগ ও ভোগের মধ্য দিয়ে গঙ্গা ছুটে চলেছে। ত্যাগের শান্তি, ভোগের সুখ বিলাস, কিছুই গ্রাহ্য করে না ; হাসি-কান্না বিপত্তি, তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি, দিবা রাত্রি ছুটেছে , বিরামহীন তার যাত্রা, উচ্ছলতার গতি। আমার মনে হল ধনী-গরীব, শিশু- যুবা, বৃদ্ধ, সবাই একসাথে মহাপ্রস্থানে চলেছি। হাসি-কান্না কোলাহলে, লীলাভূমি এই হরিদ্বার। এখানে ফুল বেচাকেনা হয়, বহু নরনারী পাতার ভেলায় অর্ঘ্য সাজিয়ে বসে আছে ; শত শত মানুষ তা কিনে নিচ্ছে। কর্পূব ও প্রদীপ জ্বেলে, ফুল অর্ঘ্য ভাসিয়ে দিচ্ছে ভক্তি বিশ্বাসে ; গঙ্গাস্রোতে কত ফুল ভেসে যাচ্ছে, বিড়লাঘাটে বসে তা দেখছি। অনেক দিনের একটা গান মনে এল। ঐ গানটা প্রত্যক্ষ হয়ে শত শত ফুল সাথে ভেসে যাচ্ছে মনে হল। 'একটা আধ ফোটা ফুল' কোথায় পৌঁছবে? যাঁকে মনে করে ভাসল, তাঁর কাছে পৌঁছবেত?

গানটা কে লিখেছিলেন, কে গেয়েছিলেন মনে এল না ; রেকর্ডে শুনেছিলাম। আজ আবার তা আমার মনে সুর তুলেছে।

" ময়ূর কণ্ঠি নদীর নাম
সোনার কমল স্রোতে ভাসে।
কার নামে কে, ভাসায়রে ফুল,
তার কি গো জল নয়নে ঝরে।
সোনার কমল বিনা দেশে যাবেরে ভাসিয়া,
তারে নিঠুর বন্ধু হাতে তোমরা দিও নিয়া,
পরান বিদরে দুঃখে, মনের কথা কয়না মুখে,

কে তারে কাঁদায় আজি দূরে বয়স নিজে হাসে।

(সোনার-কমল স্রোতে ভাসে।)

বন্ধুর মনে বন্ধুর কথা জাগিবে ফুলের বাসে।।

"সোনার কমল ভাসল" ঐ ফুলে ভাসিয়ে দেওয়া অভিমান ছিল কি? ছিল কি চোখের জল? যে কেনাদাম হতে ফুল ভাসিয়ে দিল, আশা ছিল মনে পড়বে তাকে "ফুলের সুবাসে।" যে, মনের বিশেষ কথা বলে গেল না, দূরে থেকে কাঁদাল, তার জন্য ভাসল সোনার কমল "অমূল্য রত্ন মত" যা ধারণ করে সেজেছিল ; আজ তা ভাসিয়ে দিল। কোথায় গিয়ে পৌঁছবে জানে না, একটা ক্ষীণ আশা মাত্র নিয়ে আছে যেন।

ময়ূরকণ্ঠি নামটাও বেশ। কত রং কত বৈচিত্র্য ছিল ঐ নদীতে। ঊষার রাঙা আলো, বনের সবুজ ছায়া, রূপসী বধূর রূপ লাবণ্য, বেলাশেষে সন্ধ্যা তারা দেখা যেত নিশ্চয়।

শুনলাম, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকল। আমি চমকে উঠলাম, অনেক - অনেক দূর থেকে কার ডাক শুনলাম?

যাঁকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছিলাম, সেই আমায় ডাকেনি ত?

ভেবেছিলাম অনন্ত শয্যায় শুয়ে থাকবে ; এখন বুঝছি - ঘুমের ভান মাত্র ছিল। বুঝলাম সে ঘুমায়নি।

ডাকবে ডাক ; আমি আর পেছনে তাকালাম না।

গঙ্গা স্রোতে জোনাকি মত কত শত প্রদীপ ভেসে যাচ্ছে, কোনটা অর্দ্ধপথে যেতে যেতে নিভে গেল ; কোনটা বাঁক নিচ্ছে। শত শত ফুল অর্ঘ্যে আলোর মিছিল গঙ্গা তরঙ্গে ভেসে গেল। গঙ্গারতি স্তব গান শুনছি " জয় জগদীশ হরে"। ভাল লাগল, সুখ-দুঃখ মিশ্রণে খুবই ভাল লাগল। কে যেন আবেশ মত নিবিড় হয়ে তাঁর বিশাল বুকে আমাকে নিল। আমি বিবশ হয়ে পড়েছিলাম ; মাথা রাখলাম তাঁর বুকে। শুনতে পাচ্ছি মনের ক্রন্দন.......।

তরঙ্গিনী গঙ্গার কলস্বরে মিশে কার যেন সঙ্গীত আমাকে আকুল করে তুলল। আমার ঐ মূহুর্তটি অমৃতময় হয়ে বলছে ন হন্যতে হন্যমান শরীরে। সে কবে কার একটা অনুষ্ঠান-, আকুল করল আমাকে।

ভক্তি বিশ্বাসে আমাকে সম্প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু আমার স্বামীর বিশ্ব বিমোহন রূপ দেখতে পাইনি। ফুল শয্যায় - বিশাল বিশ্বে একাই ছিলাম। শুভদৃষ্টি কালে একটা শালগ্রাম শিলা দেখেছিলাম, ঐ কুচকুচে কালো পাথরটা এতকাল পর, যখন সব ভেসে গেল, কিছু থাকল না...., আজ আমার চেতনায় বিশ্বময় হয়ে এল। আমি কিছু দূরে সরে দাঁড়ালাম, লিখছি অচ্ছন্ন হয়ে, বুঝে না বুঝে ঃ

তুমি জগদীশ্বর জগৎ ধারক

তোমাতে কত শত ফুল প্রস্ফুটিত,

বৈজয়ন্তি মালায় তোমার বক্ষ সুশোভিত,

তা চয়ন করে মালা গেঁথেছি,

তোমাতেই তা ভাসিয়ে দিয়েছি।

তোমাকে ভালবেসে, তোমার উদ্দেশ্যে
কত শত প্রদীপ ভাসল, অন্ধকারে
খুঁজিয়া তোমারে।
অন্তর ভালবাসায়, তোমাকে দেখবার প্রয়াসে
প্রদীপ জ্বেলেছি। জোনাকি আলোয় প্রদীপ্ত সূর্যকে
দেখতে চেয়েছি।
হাসি-কান্নায় উদ্বেলিত মন, তোমার তরে করি পূজা আয়োজন,
তোমাকে দিতে চাই, দেবার কিছু নেই। তোমাকে পেতে চাই -
পাবারও কিছু নেই। সর্বত্র তুমি, সর্বালি তোমার,
তবু বাহু প্রসারিয়া মন বলে - তুমি আমার, তুমি আমার।

আমি ও ফুল প্রদীপ ভাসিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে জীবনটাও ভেসে গেল। সবাব নিকট হতে সে আমাকে কেড়ে নিল যেন। সবার ভালবাসা ব্যর্থ করে দিয়ে- আমাকে কাঙ্গাল করল, আমি সকলকে হাবালাম। সবাই বলছে - এ বিধি বিধান ; আজ বলছি - তুমি কি আমায় নির্যেছিলে? তবে কেন পথের ধূলায় ফেলে দিলে? বাঞ্ছিত ভারে - কেন এলে না ? কেন লাঞ্ছিত করলে? জীবন-যৌবন ব্যর্থ হল কেন ?
লিখছিলাম - হরিদ্বারের এপারেব কথা . কি লিখতে কি লিখলাম দেখ।
একটা পাথব আমার বুক জুড়ে চেপে বসল যে, তা তো বুঝতে পারছ।
হরিদ্বারে পনেরদিন ছিলাম ; যাত্রাব জন্য বন্দোবস্ত করা হল। ঋষিকেশ -লছমন ঝুলা হয়ে দেব প্রয়াগে আমরা পৌঁছলাম । এখান থেকে হাঁটা পথ শুরু হল। গঙ্গার কূলে কূলে আমবা চলেছি... । যেপথ দিয়ে গঙ্গা নেমে এসেছে, সে পথ ধরে চলতে হয। যত এগিয়ে যাচ্ছি ততই গঙ্গার দুর্বার গতিধারা দেখা যায়। তা চোখের আড়াল হলে বুঝতে হবে পথেব ভুল। তার খল খল শব্দ শুনে পথের সঠিক সন্ধান কবতে হয়। সন্ন্যাসীরা, পাণ্ডারা, ভারবাহীবাই আমাদেব নিয়ে যাচ্ছে, প্রতি বছবই তাবা বোধ হয বদরী কেদার যায় যাত্রীদের নিযে। যে পথ দিয়ে ভাগিরথী নেমে এল- আমাদের কাছে, আমরা যাচ্ছি তার দিকে। বেশ মজাব খেলা, একটার পর একটা চট্টি পেছনে ফেলে, অর্থাৎ বিশ্রামাগার ছেড়ে চলেছি। যে চট্টিতে থাকা হয়, সেখান থেকে ডাল চাল লবন মবিচ ইত্যাদি কিনে রাত্রি বাস করে তারপর আবার চলতে হয। দোকানদাররা যাত্রীর জন্য বেশ বড় বড় মাটির ঘর দু চারটা রাখেন, ভাড়া দেওয়া হয় কিনা তা জানিনা। আমরা যা যা দরকার কিনে নিয়েছি। ওরা খুব ভাল, সরল ছিল। ঐটাই ওদেব জীবিকা ৪/৫। মাইল পর পর চট্টি আছে, সকালে বিকালে পৌঁছতে হয়। দুপুরে খাওয়া দাওযা করে বিশ্রাম নিয়ে মালপত্র গুছিয়ে সন্ধ্যার আগেই চলতে হয় যতক্ষণ না আর একটা চট্টিতে না এসে পৌঁছায়। সেখানে খাওয়া দাওয়া করে, রাত কাটিয়ে, সকালে জলখাবারটুকু খেয়ে আবার এগোতে হচ্ছে। যাত্রীর বিরাম বিশ্রাম নাই ; চলার আনন্দেই চলে। এটাই আমার খুব ভাল লেগেছে কিন্তু কেদারে একদিন বেশী থাকা যায়নি। অত্যন্ত শীত ; বরফে ঢাকা ঘরবাড়ী, সারা স্থানটাই বরফে ঝলমল ছিল, ভয়েরও কারণ ছিল। সবার হাতে পেরাক লাগান লাঠি ছিল,

মসৃণ বরফে পিছলে যাতে না যায়। হঠাৎ বরফের উঠানটা দুভাগ হলে বিচ্ছিন্ন হবারও ভয় ছিল।

কেদারে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে স্তুপাকার আকৃতিতে। এখানে নাকি নর নারায়ণ তপস্যা করেছিলেন।

কেদারে রাত কাটিয়ে তারপর দিন স্নান দান করে সকলে আবার আমরা চললাম বদরির পথে। পৌঁছলাম প্রায় দশদিনে ; পথের কোন কষ্টই কারুর কষ্ট বলে মনে হল না; সবার সাথে মন্দিরে গেলাম, দেখলাম কালো কুচকুচে প্রস্তর ফলকে চতুর্ভূজ মূর্ত্তি কর্পূর চন্দনে প্রলেপিত, জীবন্ত বলে মনে হল। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে কেদার নাথ আছেন। পরিপাটি করে পীতাম্বর পরানো। হীরাপান্নার মুকুট ঝলমল করছে, মুক্তামালা হীরা হারে শোভিত হয়ে ঐশ্বর্য্যময় ঈশ্বর, দাঁড়িয়ে আছেন। দূরাগত যাত্রীরা তাঁর পায়ে লূটিয়ে পড়লেন। মন্দিরদ্বার খোলা, কিন্তু প্রবেশ নিষেধ। এ কার নিষেধ? অলঙ্কারের নয়ত?

নিরাকার প্রস্তর ফলকে রূপ দিয়ে মানুষই শ্রদ্ধা বিশ্বাসে প্রণাম করে। নিজের রুচিমত ঐশ্বর্যময় ঈশ্বরকে সাজায় অলঙ্কারাদিতে। ভগবান নিয়ত প্রত্যক্ষ, স্পর্শিত বলে মনে হয়। বিশ্বনাথ যিনি, সর্ব্বদা স্পর্শিত হয়ে আছেন। মার কোলের শিশুর মত আমরা আছি ; কিন্তু ঐ মূর্ত্তিকে দূর থেকে প্রণাম করতে হয়। শত শত মানুষের ভালবাসার প্রতীককে প্রণাম করলাম। তুমি প্রভু, আমি দাসী আমার চক্ষু তোমায় দেখতে চায়। আমি, তুমি এক হতে চাই না যে। ভালবাসতে চাই, ভালবাসা পেতে চাই, তুমি যে আমার স্বামী, পুরুষোত্তম, সর্ব্বময় হয়েও বিচ্ছেদ নিরানন্দে থাকছি ; সকলের মত কেন হতে পারছি না !

' আমরা বদরিকাশ্রমে তিনদিন ছিলাম'। ভাল লাগল, এখানের সর্বকিছু। তুষার ঢাকা তীর্থভূমি -নীলাকাশ সাথে মিশে, অপূর্ব্ব শোভায় মনকে স্তব্ধ করছে।

এখানের সরল মানুষ, তাদের সরল ব্যবহার। পাণ্ডারাও নিকট আত্মীয় মত দূর্গম পথে সহযাত্রী হয়ে এসেছেন। বদরিকাশ্রমে সকালে-বিকালে আরতি দেখতে যাই ; ফিরবার সময় আলুপুরী কিনে আনি। ও' ই সকলে আমরা ভাগ করে খাই।

অনেকে আবার চলেছেন তুঙ্গনাথ দর্শনে। পৌঁছতে ওদের তিনদিন লাগল ; আমরা যোশিমঠে বিশ্রাম নিচ্ছি। ওরা ফিরে এলে একসঙ্গে আবার যাত্রা হবে হরিদ্বারে ফেরবার। প্রতিদিন তীর্থ - মাহাত্ম্য শুনছি ; গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, যাওয়া হল না। ক্লান্ত যাত্রী, ফেরার অবসাদে ক্লিষ্ট ক্লান্ত, মলিন বেশ, ক্ষত বিক্ষত শরীর, শীর্ণদেহ কোনমতে বহন করে চলেছে। যেখানেই যাই না কেন, হরিদ্বারেই ফিরতে হবে যে। যেখান হতে যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, শেষও সেখানেই। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পথে বিপথে ঘুরছি ; বোধ হয় একেই বলে ভাগ্য তাড়না।

হরিদ্বার আসার পর অন্তহীন পথে চলেছি অন্তর্দ্বন্দ্বে। এখানে বিশ্রাম নেই, সঙ্গী নেই, প্রশ্নের পর প্রশ্ন - আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমি জানিনা। অলক্ষ্যে কারযেন নির্দ্দেশে অভিভূত হয়ে চলেছি নিশি পাওয়ার মত।

প্রিয় অনুপ, আজ আমি তীর্থপথের আসা যাওয়ার কথায় লিখছি একটা কাহিনী, গল্প বলেই তোমার মনে হবে।

সাধু সন্ন্যাসী সাথে শতাধিক যাত্রী ছিলাম। তাছাড়া ভারিয়াবা (ভারবাহী) ডাণ্ডিওয়ালারা, ঘোড়াওয়ালারা কণ্ডিওয়ালারা (যারা পীঠে করে ঝাঁপিতে যাত্রীদের বহন করে) পাণ্ডারাও ছিলেন।

আমরা যাবার বেলা যেমন বেগে গেছি, তেমন বেগে ফিরতে পারিনি। দু একটা দুর্ঘটনাও ঘটেছিল।

যাত্রাপথে কি দেখেছি, শুনেছি-বুঝেছি, তা গুছিয়ে লিখতে পাবব না । যা লিখছি- তা থেকে কিছুটা অনুমান করতে পাববে। আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাসও লিখতে পারবে।

আমাব চালচলেনব জন্য ভক্তিমান ভক্তিমতী যাত্রীরা আমাকে পছন্দ কবেননি। আমাদেব ভাষা বেশভূষা চেহারা কিছু আলাদা ; তাব উপব আমাব বযস, পোযাক পরিচ্ছদ তীর্থযাত্রীব মত ছিল না। আমাদের থাকার ব্যবস্থা আলাদা ছিল। গুরু মহাবাজেব কাছাকাছিই থাকাব ব্যবস্থা হত। প্রতিদিন তীর্থ মহাত্ম্য, প্রবচন শুনে শুনে আমার মন বিরক্ত হযে উঠেছিল। যাত্রীদের অতি ভক্তি দেখে -অভক্তিই প্রবল হয়ে উঠেছিল । নানা কারণে ভক্তিমান ভক্তিমতীদেব এড়িয়ে চলতাম। আজ ভাবি, ওরা কত সরল ছিলেন, ওরাই পথের সাথী ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ভক্তিতে, আমি বদরীনাথকে অবনত হয়ে প্রণাম করেছিলাম। আমার ছোটবেলাব রাজ বাজেশ্বর কিশোরলালই দাঁড়িয়ে আছেন মনে হল।

আমার সহযাত্রীদের ভক্তিপথে এগোতে না পারলেও ঐ পথকে আমি প্রণাম করেছিলাম । কিন্তু তাঁদের মত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবতে পাবিনি। আমার মনে অভিমান আছে, অনুযোগ আছে, পাবলাম না এক হতে।

আমার নিঃসঙ্গতায় আমি কাকে খুঁজছি? যারা আমাকে ভালবাসেন, মোহমুগ্ধ হচ্ছেন; আমিও কম মুগ্ধ হচ্ছি না, কম ভালবাসি না ; কিন্তু কেউ আমাব বাঞ্ছিত নয়। ভালবাসা মুগ্ধতায়, দুঃখই বোধ করছি।

অন্ধ মহারাজ, সন্ন্যাসী-মণ্ডলেশ্বর, অন্ধভাবেই ভালবাসতেন। আমাকে একটা ছোটমেয়ে মনে করতেন। তাঁর সাথেই এসেছিলাম মা'ব ভক্তি জ্বালায়। আমার ক্ষিদে পেলে, কোন কারণে রাগ হলে বলতাম - আমাকে এক্ষুণি হরিদ্বারে ফিরিয়ে দিন। তিনি বলতেন আরে বেটা, হরিদ্বারেত ফিরতেই হবে, এত ব্যস্ত কেন। 'কে শুনে তাঁর কথা' বলেছি - সামকো মেরে লিয়ে রোটি দেনেকো কহিয়ে। মুঝে ভুখ লগতা নহি? তখন আমার হিন্দী বলাব ধরণ ঐ রকম ছিল; এখন যে খুব ভাল বলি তা না। অন্ধ মহারাজ বোধ হয় আমাব মনটা দেখতে পেতেন, আমার কথায় খুব হাসলেন তিনি। আমার জন্য জলখাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অনেকে বললেন, এত বড় মেয়ে, খাওয়ার জন্য কান্না কাটা দেখ। ওরাত জানে না, আমি একসঙ্গে অনেকগুলো দুদিনেও খেতে পারি না, অভ্যেস ছিল জলখাবার খাওয়ার। মনের জ্বালায় জ্বালা দিচ্ছি অনেককে । আমার সর্ব্ব অপরাধ কৃষ্ণলীলায় সামিল ছিল। স্বস্নেহে মহারাজ আমাকে আগলে রাখতেন। আমি তার ধারণায় একটা অবুঝ ছোট মেয়ে। আর সব শিষ্য শিষ্যাণীরা সইতে পারে না কেন, প্রথমে বুঝতে পারিনি। বলতে শুনেছিলাম, দেখ নমুনা, কেন যে তীর্থে আসা। সন্ন্যাসীরা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী নাকি ; গৃহস্থরাও আমাকে ভালবাসতে পারছে না কেন?

অথচ কেউ কেউ খাবাব পাঠায , হা করে তাকিয়ে থাকেন, গান শুনেন, চোখ মুছেন। যখন গাইতাম কিস্‌ ওর গযে শ্যাম সখী ..; এ একটা বিরহ সঙ্গীত। মহাবাজ পছন্দ করতেন 'মেরে তনকে তৃ অধিকাবী' কমলা ঝবিযা গেয়েছিলেন, আমি নিজেব ভাবে গাইতাম।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে শাস্ত্রীজীকে আমাব ভাল লেগেছিল উনি মূর্তি বিবোধী ছিলেন। কিছুটা নাস্তিকমত। উনি বাংলা জানেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, গুরুমহারাজের সমাজসেবক শিষ্য বোধ হয়। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি আবাব গেরুয়া পরতে গেলেন কেন? বলেছিলেন - আমি যে কতবাব গেরুযা ছেড়েছি তার হিসাব নেই। আমার বন্ধু সর্বানন্দজীব জ্বালায গেরুয়াব উপর মায়া পড়ে গেছে। তাছাড়া ঐ বংযের একটা মাহাত্ম্য আছে, বিশেষ করে ভাবতবর্ষে। তুমি যদি পব, বুঝবে গেরুযার মাহাত্ম্য। বললাম, আপনাদের মধ্যে কি নিযে এং তর্ক হয? আপনি রাগেন কেন?

" শিব নামে একটা পাথরের উপর দুধ ঢালার কী মানে হয়, ওটায আমার আপত্তি, ঐসব বুঝি না। তর্ক হযে যায়। সন্ন্যাসীর ত রাগতে নেই, আপনিত বেগে গেলেন।

আপনি ভগবান বিশ্বাস কবেন না?

কবি, কিন্তু শালগ্রাম শিলা ভগবান - এ আমি বিশ্বাস করি না। আমি হেসে হেসে বললাম - ভগবান সর্ব্বময স্বীকার কবলে -আমাব স্বামী শালগ্রাম শিলা বাদ পড়ে না। কিন্তু আমি আত্মা আমাব কোন সুখদুঃখ নাই, আমি নির্ব্বিকাব বলেন, এ আমি মানি না। শাস্ত্রীজী খুব হাসলেন। ঐসব কথা বিশ্বাস করতে, এব জন্য নাকি সাধনা করতে হয। আমি বুড়ো হয়ে যা পারিনি, তুমিত ছেলেমানুষ। ছোট মহারাজ সব্বানন্দজীর সঙ্গে পরিচয আছেত? তা আছে, তবে- উনি আমাকে পছন্দ কবেন না।

পছন্দ না করলে বড় মহারাজকে বলে দাও। তুমিত কৃষ্ণ যে। কৃষ্ণ বললে কৃষ্ণ হওযা যায নাকি। বললেন - খুব যায়, চেষ্টা করে দেখ না।

তবেত আগে যাত্রীদের জামাকাপড চুবি কবতে হয়, ওদের তোযাজ কবতে হয়। বাঁশীটা না হয না'ই বাজালাম।

শাস্ত্রীজী পান সিগারেট খান ; জানি- বদরী-কেদাবে ওসব পাওযা যায না। সিগারেটটা সঙ্গে এনেছেন নিশ্চয় ; পানটা পান কোথা থেকে? কারুর কাছ থেকে জোগাড করেন বোধ হয়। বদবী- কেদার পথে সবজীও তেমন পাওয়া যায় না ; আলু মিঠে কুমড় ঢেকিশাক ছাড়া। তাও পাহাড় জঙ্গল থেকে খুঁজে আনে আমার ব্রাহ্মণীবা। তাঁরা এটাকে বৌঠনে বলে।

বদরী-কেদারের পথে বসবাসকারীদের সূচ সূতার খুব প্রয়োজন হয়। সেখানে হাট বাজার না থাকায় সূঁচ সূতা প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই ওরা পান না। তাঁদের জন্য যাত্রীরা সূঁচ সূতা নিয়ে যায় বিলি করার জন্য। ওখানকার লোকেরা পয়সা চায় না, সূচ সূতা পেলে খুশী হন। আমিও স্থানে স্থানে বিলি করাতাম পেঁয়াজপাতা পেলে খেতাম। জানতাম রসুন পেঁয়াজ খাওয়া তীর্থে নিষিদ্ধ ওটা নাকি আমিষ।

'আমার পেয়াজ খাওয়া গোপন থাকেনি' মহারাজ বললেন - ওটা না খেলে কি নয়? সংযম নিয়ম মেনে চলা ভাল। বলেছিলাম - মহারাজ, আমি খুব সংযমে থাকি, রসনু, ও ত ঔষধ,

কবিরাজরা রসুন বটিকা দেন বাত হলে। পেয়াজ, ওটা যখন লু চলে খেতে হয়। আমি খুব নিয়মে থাকি, ঘুমাই, খাই, হাসি-কাঁদি, রাগ করি। প্রকৃতিগত নিয়মে চলি, অসংযম হল কখন?
"যখন তখন চা খাচ্ছ, খাওয়াচ্ছ ওটা!"
বদরি-কেদারে খুব ঠাণ্ডা পড়বে, তাই খাওয়াচ্ছি। আমি ভাই তোমার সঙ্গে পেরে উঠি না সর্ব্বানন্দকে বল, সর্ব্বানন্দজী তাঁর স্বভাব-সুলভ শান্তভাবেই — বললেন চা'র একটা নেশা আছে নাকি, অভ্যেস হয়ে গেলে ওটা না হলে চলে না। সাধুদের কোন নেশায় বশীভূত হতে নেই।
বললাম, সাধুদের সবকিছু ত্যাগ করতে হবে, বসে থাকতে হবে, এইত? কিন্তু যার কিছু নেই, সে কী ত্যাগ করবে শুনি? সংযম যদি বলেন - তা চোখ কান বন্ধ করে নয়, দেখে শুনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ হতে মুক্ত হতে হবে. সহ্য করবেন। আমি নেশা ত্যাগ করার জন্য চা দিয়েছি।
সাধুদের শীত-গরম ও চিত্ত বৃত্তি সংযত রাখার অভ্যাস আছে, ব্রহ্মচারী ছাত্রদের তা অভ্যাস করতে হয়। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি প্রকৃতি নিয়মের বশীভূত নন?
"প্রকৃতি নিয়ম অস্বীকার করিনা ; নির্লিপ্ত থাকার অভ্যাস করি। তা যাঁরা পারবেন সন্ন্যাসী হবেন, ওরা গৃহীও হতে পারেন। ছাত্র ব্রহ্মচারীদের নিয়ম সংযমে থাকতে হয়। অধ্যয়ন শেষ হলে নিজেই তাঁদের পথ তাঁরা ঠিক করে নেবেন ; এ হল আমাদের মত। বললাম, আমার মতে সকলকেই বদরি-কেদারে চা খেতে হবে।"
"গরম দুধ খেতে পারে না?"
তা পারে, কিন্তু দুধ ক'বার খাবেন, অসুখ করবে যে। চা - যতবার ইচ্ছা খাওয়া যায়।
বেশ ত, আপনি সেখানে আমাদের চা করে খাওয়াবেন, এখন দরকার কি।
বেশ, চা দেব না, ওদের চা দিয়ে আমার লাভ কি। আমি খাচ্ছিলাম, ভদ্রতা করে দিয়েছি।
আমরা যখন কেদারে পৌঁছলাম, তুষারপাত হচ্ছিল ; এত শীত চাল ডাল পাকেনা, উপরে নীচে আগুন দিয়ে অর্দ্ধসেদ্ধ খিচুরি খেতে হল। সেখানে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ; বরফ গলা জলে নেমে অনেকেই স্নান দান করে পুণ্য অর্জন করেছিলেন, ফলে সর্দি-কাশি, জ্বর নিয়ে চার পাঁচটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। কম্বলগুলো ছিল কালী কম্বলী বাবার আশ্রমের। আমি স্নান করিনি ; মাথায় জল ছিটিয়ে নিয়ে তামাসা দেখছিলাম। মার মনের জোর অদ্ভুত বলতে হবে, স্বাস্থ্যও ভাল।
ছোট মহারাজ (সর্ব্বানন্দজীর) জ্বর, বড় মহারাজ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, নিমোনিয়া হয়নিত? সেদিন সাধুর পুত্রস্নেহ দেখেছিলাম। আমি মণ্ডলেশ্বর মহারাজকে গরম চা করে দিয়েছিলাম, তিনি বললেন - সর্ব্বানন্দকে দাও ; আমিত ভালই আছি। শাস্ত্রীজী তাঁকে ঔষধ দিয়েছেন। ভাল আছেন। আমি চা দিলাম। তিনি হেসে বললেন - চা খেলে ভাল হয়ে যাব ত?
বড় মহারাজ বলেছেন আপনাকে চা দিতে।
মিছে কথা বল্লে না ত? আমি বললাম - তা কি আর বলি? (সাধু চা খেলেন) শাস্ত্রীজী হেসে হেসে বলেন, বহেন যা বলে সত্য হয় ; বলেছিল না চা খেতে হবে ? হলত ?

তারপর দিনই আমরা রোগী নিয়ে বর্দারির পথে চলেছিলাম। বদরিকাশ্রমে পৌঁছে তিনরাত সেখানে আমবা বাস করেছি ; ফেরার পথে এক যাত্রী রয়ে গেলেন, তাঁর নাকি বাঁচবার আশা নেই । আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন, পুণ্যস্নান ফলে অসুখ তাঁব বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী কাঁদছিলেন, সঙ্গে ১০/১২ বছরের ছেলে ছিল। রোগীব চিকিৎসার সুবাবস্থা করে সবাই ফিরছিলাম, হঠাৎ মাঝপথে এসে শাস্ত্রীজী ফিরে গেলেন। রোগীকে ফেলে যেতে মন তার সরল না। কালীকম্বলী বাবার আশ্রমে চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল ; থাকা খাওয়া সাহায্যাদি ব্যবস্থা স্থানে স্থানে আছে। এমনকি প্রয়োজন হলে তীর্থ যাত্রীদের খরচও কিছু দেওয়া হয়।

কালীকম্বলী বাবা, যিনি যাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা করে গেছেন, তিনি নাকি সর্বদা কালো কম্বল গায়ে বাখতেন, এবজন্য তার নাম কালীকম্বলী বাবা। তিনি যাত্রীদেব সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তখনকাব দিনেব তাঁর সেবা আজো অক্ষয় হয়ে আছে। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হই তীর্থ যাত্রার কথা যখন ভাবি। তীর্থ উদ্দেশ্যে করে ভগবান দর্শনের জন্য দিনের পর দিন যাওয়াটাই দুর্গমপথে বন্ধনহীন আনন্দ আমাকে দিয়েছে। আমি মুক্ত ছিলাম, কোন ভাবনা চিন্তাই আমার থাকেনি, নিঃসঙ্গও ছিলাম না। বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন মধ্যে নিঃসঙ্গই বোধ করেছি, ঝামেলাও কম ছিল না। এখানে সুখভোগ নাই, কোন চিন্তা ভাবনাও নাই। যাযাবব, বৈরাগী জীবন, যাত্রী জীবন, যাবা জানে না তারা বুঝবে না, যাত্রাব আনন্দ যে কি।

আমাদেব ফেবার পথে আর এক দুর্ঘটনা হয়েছিল। একজন সাধু যাত্রীদের বাঁচাতে গিয়ে গঙ্গার ভীষণ স্রোতে পড়ে গেলেন। নিমেষের মধ্যে এই ঘটনা হযে গেল বিষ্ণুপ্রয়াগে । সেদিনটা আমবা ওখানেই কাছেব একটি চট্টিতে থেকে গেলাম। ভালো লাগছিল না, বড় মহারাজও চুপ করে বসে আছেন। আমি তাঁব কাছে এসে বসলাম। উনি বললেন - বেটা, (বেটা মেয়েকেও বলা হয়) তুমি কথা বল আমি শুনি। না হয় একটা গান গাও। বললাম - আমাব ভাল লাগেনা যে।

সর্ব্বানন্দজী ও নিশ্চয় দুঃখ পাচ্ছেন। যাওত দেখ ঔষধ খেয়েছেন কিনা?

গেলাম, কাঁদছিলেন বলে মনে হল। আপনি দুঃখ পাচ্ছেন কেন, সবাই তো বলছেন - ভাগ্যবান আত্মারামজী ; (গঙ্গায় দেহত্যাগ হল) " আপনি তাঁদেব বলুন গঙ্গায় দেহত্যাগ করতে, পারবেন তাঁরা - সে সৌভাগ্য নিতে? "

তা না পারুক, ওঁরা কাঁদেন না, মোহ ওদেব নেই। তবে নিজের শরীরের মোহ বোধহয় আছে।

" যাও বহেন, আমি একা থাকতে চাই"।

বেশ ত , একা থাকুন, কাঁদুন, মহারাজ বলছি আপনি ঔষধ খান।

" বলুন, উনি দুঃখ পাবেন, সহ্য করবেন"। আর বললাম- মহারাজকে আপনাকে ডেকেছেন যে, আমি তো ডাকতেই এসেছিলাম। সর্ব্বানন্দজী মহারাজের কাছে এসে বসলেন। মহারাজ তাঁকে কি সব বললেন বুঝলাম না। ওঁরা নিজেদের মধ্যে সংস্কৃতে কথা বলেন। কিছুটা বুঝতাম কিছুটা বুঝতাম না। আমি সরে গেলাম।

এসে দেখি - মা ও চুপ করে বসে আছেন। তাঁর গা ঘেঁষে বসলাম ; দীর্ঘকাল থেকে মার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। চোখের নীচে কোলটা - আজ যেন আরো কালো দেখাচ্ছে।

আমার ত কাঁদবার অভ্যাস ছিল না, সে কবেই ভুলে গেছি।

(আমরা চুপ করে আছি, দুজনেই দুজনকে বুঝছিলাম)

আমরা আমাদের ভাগ্যের খেল দেখে যাচ্ছিলাম....... ..।

আমি যখন তখন হাসতে পারি, কাজ করতে পারি, কাজ আদায় করতে পারি। আমার কাজ দেখে অনেকে তারিফ করেন, মাও কাজ দেখলে খুশী হন। আমার নাকি অনেক গুণ, দোষের মধ্যে নাকি রাগী, বিচার না করে যা মনে আসে তাই নাকি করি। এমন সব প্রশংসা আমার আছে। আর একটা আশ্চর্য্য কথা, হ্যাংলা হলেও আমার স্বাস্থ্য খুবই ভালো, কোন অসুখই আমার হয় না। পড়ে গেলেও তেমন আঘাত লাগে না। আমি বোধ হয় দীর্ঘজীবি হব। ভীস্মদেবের মত ইচ্ছা মৃত্যু হবে।

আমরা শাস্ত্রীজীর অপেক্ষায় আছি। শাস্ত্রীজী ভদ্রলোকের বিধবা স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে এলেন। আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল হরিদ্বারে ফেরার। রাস্তায় রাস্তায় আমি গাইতাম, মহারাজ শুনতেন।

একদিন মহারাজকে বললাম- আমাকে আপনি, আপনি বলেন কেন? উনি বললেন ওটা অভ্যাস হয়ে গেছে। আপ, মানে কি জান? নিজে আমি; সবই আমি। সকলে আমাকে বাপজী ডাকেন, আপনিওত আমাকে বাপজী ডাকেন না। সেদিন শাস্ত্রীজী, সর্ব্বানন্দজী, আরো অনেকে ছিলেন; বললাম যখন -আমি আপনাদের সৎ মা হই। সৎ মা? খুব ভালো মা, তা কি করে হলেন?" বললাম, আপনারা ভগবানকে পরম পিতা বলেন ; ছোটবেলায় মা আমাকে ঈশ্বরকে স্মরণ করে সম্প্রদান করেছেন; আমি আপনাদের সৌতেলী মা নই? অনেকেই হাসলেন, মহারাজের ভাবান্তর আমি লক্ষ্য করেছিলাম। আমিও বুঝলাম এই জন্যই আমার বিয়ে হল না, সকলের ভালবাসা ব্যর্থ হল, আমারও। আমি কারোর স্ত্রী নই, শালগ্রাম শিলাটাই আমার স্বামী। বেচারা আমার কার্ত্তিক বন্ধুর দোষ কি ; আমি আমার ভাবে যাঁকে দেখেছি, তার নাম - আর্য, ঈশ্বর প্রতীক। সর্ব্বদা আমাকে আগলে রাখেন।

মহারাজ গঙ্গেশরানন্দ আমার প্রতি স্নেহান্ধ ছিলেন। সময়ে সময়ে সর্ব্বানন্দজীকেও এরজন্য ব্যস্ত হতে হত। তর্কেরত শেষ ছিল না। গেরুয়া কাপড় পরলেই সব পরিত্যাগ হবে, এ আমি মানতে পারি না। শাস্ত্রীজী সন্ন্যাসীদের বিপক্ষে ভাষণ দিতেন তা আমার খুব ভালো লাগত ; আমার ছোট ভাইয়ের সমবয়সীদের আমি খাটাতাম, তারা আমার কথা মানত। সন্ন্যাসীদের আসনে বসতে নেই এ আমি জানতাম না ; অনেকগুলো কম্বল পাতা থাকতো, আমি বসতাম। এনিয়ে কিছু কানাঘুষো হলে সর্ব্বানন্দ মহারাজ বললেন আমাদের আসনে বসতে নেই। বললাম কোনটি আপনাদের, কোনটি আমাদের, বুঝতে পারছি না যে। শাস্ত্রীজী বসেন, আরো কত জনে বসে, এ ছোকরা সন্ন্যাসীরাও। আমি বসলে দোষ কি? এছাড়া এত বড় বিরাট পৃথিবীর একাসনেই তো সবাই আছি; আবার মাঝখানে আর একটা আসনের কথা উঠে কেন? মনটা রুখে উঠেছিল, বললাম - কেন বসব না বলুন? আপনি গৃহস্থ, আমরা সন্ন্যাসী, নিয়ম মেনে চলতে হয়। আমি গৃহস্থ? আমার তো ঘর সংসার কিছু নাই, আপনাদের মত বিরাট আশ্রমও নাই। পয়সাও নাই। সে দুঃখেই ফিরস্তা হয়েছি।

" একথা কি সত্য ? "
সত্যইত, আমি মা'র আশ্রয়ে থাকি , ভালবাসেন বলে যা চাই তা দেন, যেমন আপনার গুরুমহারাজ দেন। এখন বলুন বসতে পারি কিনা।
আমরা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, আমাদের আসনে বসতে পারেন না। আপনাদের আসনে শাস্ত্রীজী বসেন। ঐ ক্ষদে সন্ন্যাসীরা বসেন, তারা ব্রহ্মচারী বটে আমি ব্রহ্মচারী নই ?
সাধু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন আপনি ব্রহ্মচারিণী।
ও, আমি ব্রহ্মচারিণী ? আকার ইকার ভেদের জন্য এত কথা ? আপনারাইত বলেন - আত্মার ভেদ নাই। আমিও বলি -যাঁর আত্মবোধ নাই তারাই সূচিকায় গ্রস্থ হয়। এও বলছি - আত্মা যখন শরীরে আবদ্ধ থাকে শরীর নিয়ম পালন করে। শুধু বেশ ভূষা নিয়ে, আমার কাপড় দেখে আসনে বসতে দিতে আপত্তি কেন ? এক্ষুনি কাপড় ছেড়ে আসছি আপনার আসনেই বসব
মহারাজের আসনে বসুন, উনি কিছু বলবেন না।
আপনি কেন বলেন ?
আমি গুরু মহারাজ নই গুরুর শিষ্য সন্ন্যাসী মাত্র।
তাঁর এই স্বীকৃতি ভালো লাগল। তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।
'হরিদ্বারে পৌঁছে গেছি' এখানের পথঘাট আমার জানা। আমরা রমাভবনে থাকি , আমাদের খোঁজখবর নিতে সর্বানন্দজী আসেন , একদিন আমি চলে গেলাম, সন্ন্যাসী মহোদয়দের শান্তিরক্ষা কেমন হয় দেখবার জন্য। গঙ্গাধারে ছোট ছোট কোঠরী আছে গরমের সময় থাকার জন্য সেঁ রকম কোঠরী রমা ভবনেও আছে। মাতাজীর সাথেও পরিচয় ছিল, সেখানেই থাকলাম। অনুগত সঙ্গিনীকে বলে এসেছিলাম আমার জন্য জলখাবার ওখানে আনতে। আমি জানি মা ব্যস্ত হবেন। সাধু মহারাজদের আজ আমাকে খুঁজতে হবে।
সর্বানন্দজী মহারাজের অবস্থা বুঝতে পারছিলাম আমি না আসা পর্যন্ত ত ফিরে যেতে পারবেন না।
সঙ্গিনী জলখাবার নিয়ে এল, বলল - চলুন চলুন মানি অস্থির হয়ে আছেন। সাধু বাবারা যেতে পারছেন না। শিষ্যরা খুঁজছেন। আমি ফিরে গেলাম। মা ত মারমুখী হয়ে এলেন, বললেন তুমি কি আমাকে কোনদিনই শান্তিতে থাকতে দেবে না নাকি ? সর্বানন্দজী বললেন, আর কোনদিন কিছু বলব না, যা খুশী করুন। আপনাদের দেখাশোনা করার ভার ছিল, আজ যা দুশ্চিন্তায় ফেললেন।
সন্ন্যাসীর আবার ভাবনা চিন্তা কি ?
তাই বলে সারাদিন ঘরে ফিরবেন না ?
আমিত আগেই বলেছি - আমার ঘর নাই। তবু ফিরলাম মা আছেন বলে।
" সারাদিন কিছু খেয়েছেন ?" আমি হা না কিছু বললাম না সন্ন্যাসী মাকে বললেন - মা, আমাদের খেতে দিন, রাগ করে বকে আর কি হবে। আবার কোনদিন কি করে বসবে ঠিক নেই। আপনি কিছু খান নি সেই সকাল থেকে । সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন না। খেতে বসলেন, আমিও

বসলাম। যাবার সময় বলে গেলেন - আর কোনদিন এমন করবেন না। মহারাজ শুনলে খুশী হবেন না।

দেখলেন ত? আমি জ্বালাতে পারি

" শান্তি দিতে পারেন না?

বোধ হয় রাগ করে গেলেন। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগল না। তারপর দিনই আমি কংখল গেলাম, হরিবংশ পুরাণ ও দেখবার ইচ্ছা, ওতে সে কবে কার ছবি অনেক আছে নাকি, একটুও রং নষ্ট হয়নি নাকি, ফরেনাররা এই সব গ্রন্থাদি দেখতে আসেন, গীতা মন্দির তখন তৈরী হয়নি বোধ হয়। পরে দেখলাম, প্রাকৃতিক দৃশ্য সেখানের বড় সুন্দর।

আমি যখন গুরু মহারাজকে প্রণাম করলাম, তিনি হেসে হেসে বললেন - জানতাম, আজ তুমি আসবে। বস, বস, রাগ করে ছিলে কেন ! সর্ব্বানন্দজী অহংকারী নন, ভুল করছেন আপনি। (মহারাজ মাঝে মাঝে বস বস বলেন কিন্তু আপনি বলছেন)

আমাদের হরিদ্বারে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছে, মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । সন্ন্যাসী, গৃহী, কেউ বাদ নেই, সবাই রক্তামাশায় ভুগছেন ; জ্বরে পড়েছেন। শাস্ত্রীজী, সেবারাম সর্ব্বানন্দজী, মহারাজ, আমি ছাড়া সবাই অসুস্থ। মহারাজ আগেই শাস্ত্রীজীকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আশ্রম দেখাশোনা করার জন্য। কিছু রোগী সন্ন্যাসীদের নিয়ে তিনি গিয়েছেন।

জৈষ্ঠ্যমাসের গরম, কম্বলে শোয়া যায় না। জানলাম কিছু কাপড় ঔষধ কিনতে হবে। সেবারামজী সঙ্গে গেলেন। এই সাধু অত্যন্ত সাধাসিধা, সবল মানুষ। কি গরম কি শীতে একভাবেই তাঁকে দেখেছি। বদরি কেদারেও বেশভূষা বদলাননি ; একটা গামছা পরে থাকতেন, এটাই তাঁর কাপড়। ঐ দিগম্বর সাধু চললেন আমার সাথে। কিনলাম প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু। ৪/৫ টা শাড়ী নিলাম, মালপত্র ঔষধও নিয়েছি। সেবারামজীকে বললাম - টাকা দিন ;" মহারাজের টাকা আছে, তাই দেব?" (আমার কিছু টাকা কম পড়েছিল) হ্যাঁ, তাই দিন। (ফিরতি পথে বলেছিলাম কিছু দুঃখের কথা) তারপর দিন দেখি আমার জন্য সাটিনের বিছানা, বালিশ এল। সাধুরা এমন বিছানা পেলেন কোথায়? কেনেন নি ত?

বললেন - একজন মাই দিয়েছেন, আমি সর্ব্বানন্দজীর দিকে অবাক হয়ে চাইলাম। বললেন, চলুন মহারাজ আপনাকে ভোজনের জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমরা কংখল পথে যেতে যেতে, আলাপ করছিলাম। জিজ্ঞাসা করলেন - মহারাজ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কী পেলে খুশী হন, এত অশান্ত কেন ?

বলব - মানুষের যা, যা, প্রয়োজন হয়- সবই চাই।

তার মানে - টাকা, ঘরবাড়ী, সম্মান, সুখের সংসার, এইত?

হ্যাঁ।

"শুনলাম আপনারত মাত্র আড়াইলক্ষ টাকার প্রয়োজন, তাও আবার ইউরোপ ঘোরার জন্য। তা এমন ব্যস্ত হবার কি আছে, আপনি যা চাইবেন - তাইত পাবেন কিন্তু চাননি, এই হল মজা। আমি জানি, আপনি চাইতে পারবেন না।

বললাম, আপনারা ইউরোপ চলুন না, সেখানে ধর্ম্ম প্রচার করুন, তাহলে আমিও সঙ্গে যেতে

পারি।

"ভারতের কথা ভেবে দেখেছেন? ভারতের অধ্যাত্মিক চিন্তাধারা কোথায় নেমে গেছে দেখুন। শুধু অন্ধবিশ্বাসে হাতরে চলেছে; পৃথিবীর মানুষ ধ্বংসের পথে, অথচ আমরা অমৃতের সন্তান হয়েও অমৃত আত্মকথা ভুলে গেছি। ইউরোপ গিয়ে কী হবে? ধর্ম্মের মূলভিত্তি- অমৃত আত্মা, মূলে জল না দিলে কি গাছ বাঁচে? শান্তি ছায়া বিস্তার হবে কি? বললাম, ভারতের বোধিবৃক্ষ কল্পতরু; অমৃতফল যে গাছে ফলে তাতে জল দেবার প্রশ্ন উঠে না। বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে, ভাবনা কি। তা সত্য। অমৃত সন্ধানত কেউ নেয় না, তাই মনের হাহাকারে, চাওয়াও শেষ হয় না। জীবনটাই শেষ হয়ে যায়। অতৃপ্ত মানুষ দুঃখের কারণ সৃষ্টি করে।

আমিত দেখছি - আপনাদের শিষ্য-শিষ্যারা অন্ধবিশ্বাসে, কেউ গেরুয়া প্রভাবে, কেউ পরজন্মের অজানা ভয়ে, কেউ ইহলোকের শান্তি সুখ আশায় দীক্ষা নেন; শিক্ষা নেন কি? সত্য বলুনত - ওরা কী পায়? সান্ত্বনা পায়, নির্ভর স্থল পায়, দুঃখের কথা বলতে পারে, সদ উপদেশ পায়। গুরুকে একান্ত আপনভাবে, ভক্তিবিশ্বাসে শান্তি পায়; বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চিন্ত হয়।

বললাম, অমৃতের সন্ধান পায় কি? ওরা নিজের বিশ্বাসে ভক্তিতে শান্তি পায়, দুঃখের কথা বলে - মন হালকা করে;

আপনারা কী দেন; পাথরে বীজমন্ত্র ছড়ালে কি ফসল হবে?

"শত শত ছড়ানো বীজের একটিও ফসল হবে না বলছেন?

সবটাই হতো, যদি জমিটি আগে তৈরী করতেন। আমরা কি তা করি না?

করেন, কিন্তু প্রকৃতি বিরোধী যে, আমার মতে - কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছাড়বার নয়, প্রশ্রয় ও দেবার নয়, সংযত মাত্র অভ্যাস শিক্ষাদ্বারা করতে পারি। এটাই মানব ধর্ম্ম, মানুষের আত্মসমুর্পন, নিবেদন ওসব আমি বুঝিনা। কার কাছে আত্মসমর্পন করব বলুন?

" মানব ধর্ম্মত বললেন, পারেন তা রক্ষা করতে? রোজই দেখি রাগ করে কাপ ভাঙ্গছেন; আরো কত কি? মানব ধর্ম্ম রক্ষার জনাইত আমাদের সাধনা। শিক্ষাদীক্ষা।

তা প্রকৃতি বিরোধ যে; খেতে পাইনা একাদশী করছি; কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করি পালিয়ে; রাগ ত্যাগ করি মৌনি হয়ে, আমি এসবকে বলি প্রকৃতি বিরোধী। আপনারা বলেন হটযোগ।

"ভুল করছেন হটযোগ নয়; অভ্যাস যোগ। মন্দিরে, সেবা পূজাদ্বারা, জনসেবাদ্বারা, স্নানাদি নিত্য সেবাদ্বারা, কর্ম্ম ও পাঠদ্বারা ভজনদ্বারা, জীবন পরিচালনা করার অভ্যাস করে আমরা শিক্ষা দক্ষতা লাভ করি, ভ্রমণ করি। কাম, ক্রোধ, অহংকার আয়ত্ত করি।

গুণগ্রাহী মন, ফুলের সৌরভ সৌন্দর্য্য অস্বীকার করতে পারে কি?"

না, তা অস্বীকার করিনা, আমরা তা শ্রদ্ধা করি।

কিন্তু সকলেই শ্রদ্ধা করেও মুগ্ধ হয়, বার বার রূপ দেখতেই হয়, তা আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

অস্বীকার করিনা, জগদীশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি দেখে আনন্দ বোধ করি। আপনি ফুল তুলে মালা গেঁথে আপনার কিশোর লালকে পরিয়ে দেননা?

আমিত সন্ন্যাসী নই; আমার বাসনা কামনায় সুন্দরকে ভালবেসে পরিয়েছি।

আপনারত কোন মোহ নাই, দয়া করে জনসেবা করেন। ছোটবেলায় মা বাবাকে ভালবেসে ছিলেন না! চৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলে বৃদ্ধ মাকে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবন ছেড়ে গেলেন সকলকে ফেলে। ভাগবত শুনলে এখনও আমরা কাঁদি। শত ভালবাসলে ও ছাড়তে হয়, এ প্রকৃতি নিয়মে, এত আপনি মানবেন? তাই আমরা উদাসী সন্ন্যাসী। ভালবাসি, ভালবাসা অস্বীকার করিনা।

গুরু মহারাজকে ভালবাসি, ছাত্রদের ভালবাসি, আপনার কত শত দুষ্টামী ভালবাসি, আমাব শিষ্য শিষ্যাদের ভালবাসি। আমি তা অস্বীকার করতে পারব না; এসত্য। মা'র স্নেহ ভালবাসায় আমাদের জন্ম যে। আমরা কংখলে এসে পৌঁছলাম মহারাজ বললেন - কেমন শাড়ী নিলেন? সুতির নিলাম ; দাম মাত্র পনের টাকা। বললেন রেশমে নিলেন না কেন? সুতিব শাড়ী ঘরে ধোয়া যায়। দামও সস্তা।

আপনি যে এমন হিসেবি - কম দাম বেছে নিলেন ধোয়া যায় বলে।

এরপর ধর্ম্ম আলোচনা হল।

ভোজনপর্ব শেষ করে বিশ্রাম নিলাম ; বিকেল পাঁচটায় ফিরে যাব। ভাবছি, ওরা থাকেন কংখলে, আমরা থাকি অপর পারে। এ পারে তাঁরা, ওপারে আমরা, মাঝে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে ; কত কি ভাবছি.... ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, বুঝতেও পারলাম না।

ফিরে যাবার আগে মহারাজের কাছে বসলাম, জিজ্ঞাসা কবলাম ভগবান আছেন? তিনি বললেন - আমার শিষ্যাকে জিজ্ঞাসা কর। সর্ব্বানন্দজী সর্ব্বদা মহারাজেব কাছে থাকেন, তিনি মহারাজের পাশেই বসেছিলেন ; ঐ প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়লেন। আমি জানালাম মহাবাজকে, সর্ব্বানন্দজী নাই বলছেন। (গুরু মহারাজ অনেকক্ষণ হাসলেন, কেন নাই বলছেন জান? তিনি আছেন বললে আপনি নাই বলতেন, তর্ক তুলতেন ; নাই বলে আছে বলতে চান। বললাম - তাই নাকি? বেশত, আমি আছে বলছি, তবে সবার অনুভূতিতে নাই।

সর্ব্বানন্দজী বললেন - যদি থাকেন আপনার, আমার সবার মধ্যেই আছেন ভগবান এক, অদ্বিতীয় তাঁকে এভাবে শাস্ত্রে বলা হয়েছে। আমিত না-ই বলছি অনুভবে যখন নাই।

বললাম - আছেন, অনন্ত শয্যায়। যা আছে তা নাই হতে পাবেন, যা নাই, তার কথাই উঠে না। প্রশ্ন উঠে কেন?

বললেন - প্রশ্নত আমি করিনি? প্রশ্ন আপনার।

আপনি নিজেই চিন্তা করে মীমাংসা করুন - ভগবান আছেন কি নাই। ঈশ্বর শব্দ, এই নাম এল কখন থেকে, কোথা কে, ভেবে দেখুন।

দর্শন বলেছেন ঈশ্বর জগন্ময় । প্রথম মানুষ প্রথম বীজ অনুসন্ধান করেছেন, আত্মবোধে ঈশ্বর অভিন্ন, এক বলেছেন, তা কল্পিত নাম রূপ নইত? এই সংশয়ে পড়েছি।

মহারাজ বললেন - তা বৈকি, তুমি মহাকবির নাম রূপ নিয়ে আমার পাশে বসে আছে, তিনি আছেন, তুমি আছ।

আমি যে কাউকে দেখিনা?

আমি অন্ধ, তুমিত তা জান? তা বলে কি তুমি নাই?

আপনি আমায় না দেখলেই বা কি, আমার মাথায় হয়ত হাত বুলাচ্ছেন, আমার কথা শুনছেন ; এমন করে ভগবানকে কেউ ছুঁয়েছে? সর্ব্বানন্দজী বললেন, আপনি নিজেকে কখনো দেখেছেন? এটি আগে বলুন।

আয়নায় দেখেছি, চোখে সকলকে দেখেছি।

ওত নাক চোখমুখ, শরীর দেখছেন, আসলে কাউকেই দেখছেন না ; দোকানে কাপড় দেখারমত সকলকে দেখছেন।

"শরীরই দেখছেন, ব্যক্তিতে চৈতন্যময়কে দেখছেন না"

শরীরের ক্রিয়াতে চৈতনা ; নাক চোখ মুখ নিয়ে সকল অবয়ব নিয়ে আমি নই কি?

শরীর ক্রিয়াতে চৈতন্য প্রকাশ পায়, সকল অবয়ব নিয়ে আমি। আমি এক বিন্দুমাত্র কিন্তু মন যখন গানে বা ছবিতে থাকে একাগ্রতায় ; সামনে দিয়ে কেউ গেলেও দেখিনা, শুনিনা, তখন বুঝি মনই দেখাশোনা বিষয় গ্রহণ করে। তবে শরীরে কি আমি মন? ভগবান অন্তর্য্যামী বা কোথায়?

" আমরাত বলি - আমার মন, আমার প্রাণ, আমার শরীর ; আমি - আমার মধ্যে সীমিত। একটি মহাব্যাপ্ত বিন্দুর সর্ব্বময় বিকাশে বহুরূপে আমি। বিভিন্নতা শরীরে রূপ পার্থক্য আছে।"

তবু প্রশ্ন থাকে, ধনী, গরীব, শত্রু, মিত্র, হিংসা, বিদ্বেষ এসব কী?

"আপনি ছবি আঁকেন, একই রকম, একই রঙে, আঁকেন না কি? তিনি বৈচিত্র্যময় বহুরূপ এঁকেছেন - জীবন্ত চিত্র। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়, গীতার বক্তা। তাঁর সঙ্গীতময় বানী আপনি নিশ্চয় পড়েছেন ; আপনি রাধাকৃষ্ণ প্রেমে বিমুগ্ধ।"

আপনারা কেউ বিমুগ্ধ নন? ভগবান আছেন কি নেই সাধনার প্রয়োজন কি?

আছেনত আছেন, নাইত নাই। তা নিয়ে মাথা ব্যথা কেন হয়?

যা হবার তাতো হবেই।

তা আপনিই বলুন না, আপনার মনে আসে কেন?

কি জানি।

মহারাজ গঙ্গেশ্বরানন্দ বললেন ওটা পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার, ঈশ্বর ইচ্ছা। অন্তর্যামী সর্ব্বদা জাগ্রত আছেন, তার প্রতিধ্বনী তোমার মধ্যে হয়। ভগবানকে মনে করার সাধ্য নেই, তিনি মনে করেন বলেই আমরা মনে করি। মহারাজের কথাটার মধ্যে হেয়ালী আছে যেন। 'ভগবান' বিষয়টি রহস্য হয়ে মনকে চকিত করে ; আমার মনটা চমকে উঠেছিল। ঈশ্বর ভাবনা আমাকে জাগতিক বিষয় থেকে কিছু বিমনা করল।

ফেরার পথে সর্ব্বানন্দজীকে বললাম, আপনারাত বলেন আমি -যে, তুমি ত সেই। তাহলে আপনার সুখদুঃখে আমার কিছু হয় না কেন? সুখদুঃখ, শরীরের বোধক্রিয়া, আমার নয়। শরীর দ্বারা মন গ্রহণ করে প্রকৃতিগত ভাবে। শরীর বিভিন্নতায় ঐসব ভোগ করি বলে, একে অন্যের সুখ বা দুঃখ বোঝেনা।

বললাম - আত্মকথা বলুন। শরীরও আমার। মন ও আমার; মন যা গ্রহণ করে - জাগতিক বিষয়, তা থেকে নির্লিপ্ত হয়ে-আমি আত্মা বলা যায় কি?

শরীরে মন থাকলে সবকিছুই অনুভব করতে হয় ; না থাকলে হয় না। তা আপনি নিজেও বলেছেন।
তা বলেছি, বাস্তবে সর্ব্বদা সম্ভব নয় ; এটা একটা মুহুর্ত মাত্র। শরীরে, মনে, ঝাকুনি এলে নিমেষের জন্য সে আঘাত ভোলা যায়না।
অভ্যাস সাধনাদ্বারা যদি প্রমাণ করি - শরীর থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে কিছুক্ষণ মন্দিরে স্থির হয়ে বসবেন তো?
শুধু স্থির হবেন, নিজেকে খুঁজবেন, অথবা কৃষ্ণের বাঁশী শুনতে চেষ্টা করবেন। আপনার ত আবার বাঁশী শুনবার সাধ আছে ; মূর্তিও রাখেন।
আপনি কি মূর্তি রাখেন না? আপনার এই শরীর কি আপনাদের মতে মূর্ত্তি নয়? আচ্ছা বেশ, আপনি কেমন আত্মস্থ তা প্রমাণ নেব।
বাড়ীতে এসে পৌঁছুলাম, দেখলাম শরীর থেকে মন সরানো যায়। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হল, এটা জেদ নয়ত? আমি মেছকাঠি জ্বেলে ছিলাম মাত্র, পুড়তে পারিনি. শরীরে আমার মন ছিল না। সাধুকে বললাম - আমার হাত পুড়ুনত । আপনিও বোধ হয় পারবেন না ; দেখুন চেষ্টা করে।
" না, আমি পারব না "। বললাম, তাহলে বলুন শরীরে মন থাকেই। তুমি, আমি, ভিন্নতার মধ্যে এক আত্মবোধ হতে পারে না। দুঃখ দেওযা, দুঃখ সহ্য করা এক কথা নয়। "
" অভ্যাস থাকলে নিমেষের জন্য মন সরানো যায়। আপনার তা অভ্যাস নাই; কষ্ট পাবেন।"
তা আমার কষ্ট হতে পারে. আমি শরীর নই, তা প্রমাণ হতো - বুঝতাম আপনি আত্মস্থ। সন্ন্যাসী স্থির হযে কিছু বলতে চাইলেন, আমি সহসা তা বুঝলাম। আত্মা এক, স্বীকার করি ; ধ্বনি প্রতিধ্বনির মত মনে হয়। যা বলতে চাইলেন, আমি তা বুঝলাম কী করে? চিন্তা করছিলাম....., তার শিষ্য শিষ্যারা মহাব্যস্ত হয়ে রেগে গিয়েছিলেন ; ঔষধ লাগাতে এলেন। সন্ন্যাসী বললেন - আপনারা শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন, ওতো সত্যি সত্যি পুড়েনি। মা রেগে বললেন - পাপী কোথাকার, তীর্থে এসে সাধুর হাত পুড়ে দিলে? সর্ব্বানন্দজীকে সম্মান করি, তাঁর শান্ত শিষ্ঠাচার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়। শাস্ত্রীজী ও সর্ব্বানন্দজী আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আমার উপর তাঁদের সহানুভূতি, মমতাবোধ আছে, আমার জীবনের অনেক কথাই তাঁরা জানেন। আমি যে কত অসহায়, নিঃসঙ্গ, তা তাঁরা জানতেন না। একে একে আমার বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে, জ্যোঠা নরেন্দ্রকিশোর, মাসীমা মারা গেছেন। দাদা ভাইয়েরা বাড়ী ফিরতেন না। পৃথিবীতে আমার যে কেউ ছিলনা। একমাত্র মালতী, দূর্গা আমার সঙ্গিনী। অন্ধ মহারাজের স্নেহমমতায় আমি বশীভূত ছিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসী মতবাদ মানতে পারি নাই। বুঝিনি। যাক সে কথা, ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে সর্ব্বানন্দজী এসে বললেন- বহেন, আমি চলে যাচ্ছি, অনেকেই আমার সঙ্গে যাবেন। আপনাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করে যাব। মা কোথায়? সন্ন্যাসীর মা ডাক সুন্দর ছিল ; মা তাঁকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা দুটাই করতেন। মাকে ডাকলাম, মা এসে বললেন - বাবা, আপনারা চলে যাচ্ছেন শুনলাম। আপনাকে কত কষ্ট উঠাতে হয়েছে আমাদের জন্য ; আমার মেয়ে অবুঝ, ওর দোষ গুণ ক্ষমা করবেন।

আমার হাসি পেল, দোষের সঙ্গে গুণ জুড়তে শুনে। বললাম- দোষ গুণ সবারই আছে, আমাকেই ক্ষমা করতে হবে কেন? সর্ব্বানন্দজীকে বললাম- আপনারাত বৃন্দাবনে গিয়ে সাধন ভজন করবেন, আমার ত সে সৌভাগ্য হবে না। পাপী মানুষ আমি, কয়েক মাস পর পশুব বর্জ্জিত দেশে ফিরে যাব, আমার অনেক সুকীর্ত্তি আপনার মনে থাকবে বোধ হয়। ক্ষমা করবেন অপরাধ কিছু যদি হয়ে থাকে।

বললেন, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্টই হচ্ছে। গুরুর আদেশ যেতে হবে। তুমি কিছুক্ষণ হলেও মন্দিরে বস। চাওযার যদি কিছু থাকে একাগ্র হয়ে চেয়ে নিও। ভগবান তোমার প্রতি বিমুখ নন ; তুমি অভিমানে জোর করে মুখ ফিরিয়ে আছ ।

আজ শুনলাম 'তুমি' বলতে; বোঝেন তো আপনি ভাষার তারতম্যে তুমি বুঝছি। শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে আমরাও প্রণাম করলাম। সর্ব্বানন্দজী হাসলেন, তা ম্লান ছিল নাকি? কি করে বুঝব মায়া নেই? সূর্যের ছায়া পড়ে, রাহুগ্রস্থ হয় ; হাসির আড়ালে ম্লানতা, বিচিত্র কি? সাধনা, তা প্রকৃতিগত নয়; জোর করে মনকে স্তব্ধ করা। তা কতক্ষণ?

অভ্যাস বশে মা সংযত, মাষ্টারমশায় সংযত, সন্ন্যাসীরা সংযত, তাদের ব্যতিক্রম বাইরে প্রকাশ পায় না।

সর্ব্বানন্দজী বলেছিলেন - শান্তি পাবে, আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। শুধু বাক্য সত্য হোক, শান্তি কে না চায়। আমি শান্তি পেয়েছিলাম কি?

জন্মের পর আমি সতের বৎসর শান্তিতে, সুখে ছিলাম। তারপর ?

জেনেশুনে আমি নিরুপায় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। এরজন্য অদৃষ্টকে দায়ী করব কি? আমার উপর দিয়ে ঝড় তুফান গেছে, একটা ভাঙ্গা ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তবু মনে সান্ত্বনা ছিল ছেলেমেয়েকে পড়িয়েছি ; আমি কোনদিনই ক্লান্ত বোধ করি নাই, এখনো করি না। এটাই আমার প্রতি ভগবানের কৃপা।

প্রিয় অনুপ, ভ্রমন কাহিনী লেখার নমুনা দেখলে ত? গঙ্গার প্রচণ্ড বেগ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু দেখি নাই। (আমার চোখে পড়ল না)।

বদরী কেদারের তুষারপাতও আমার মনকে চমৎকৃত করল না ; চলার আনন্দেই ছিলাম।

কৈশোরে গিয়েছিলাম দ্বারকানাথ দর্শনে। ঐ দ্বারকানাথ এর সাথে বদরীর চতুর্ভূজ মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে। পরিপাটী করে সাজাবার ধারাগত শিক্ষা বৃন্দাবনেও দেখেছি। এটা ভারতের নিজস্ব ধরণ। এখানে কোন ভেজাল নেই, শত শত বর্ষ আগে রাজবেশ বোধ হয় এরূপই ছিল মনে হয়।

চিত্রকররা দ্বারকানাথের চমৎকার ছবি আঁকেন, তা দেখবার মত। কুচকুচে পাথরের মূর্তি কেমন জীবন্ত হয়ে জেগে উঠে। এত রূপ ঐশ্বর্য - শিল্পীর প্রাণ প্রাচুর্য্যে কি যে ঝলমল হয়। এটা তেমন মূর্ত্তি নয়, ভালবাসা মণ্ডিত প্রিয় আঁধার।

তীর্থ ভ্রমণ কাহিনীর উপসংহারে দূর্গা ব্রাহ্মণীর বিষয় না লিখলে তীর্থপ্রসঙ্গ কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে থাকে। তাছাড়া ঐ ব্রাহ্মনী আমার স্নেহের পাত্রী। তার বয়স তখন কম, স্বামীর নাম ধাম জানেন না। কিন্তু সে নাকি বিধবা। রীতিমত নিষ্ঠা মেনে চলেন। অনুকরণ করে পূজা

করেন।

হরিদ্বার থেকে ফেরার পথে একদিন তারজন্য আমাদের ভাবনায় ফেলেছিলেন, প্রতিদিনের মত এসে পৌঁছুলেন না। আমাদের উদ্বেগ দেখে শাস্ত্রীজী দুজন সন্ন্যাসীকে পাঠালেন। তাঁরা প্রায় সাতটার পর, ব্রহ্মলাভ করার মত ব্রাহ্মনীকে নিয়ে এলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম - ব্যাপার কি, ফিরতে দেরী করলে যে? সে বলে কিনা - আমার লোটা গড়িয়ে গিয়েছিল। তা আনতে যেতে হল। ব্রাহ্মণী ঘটিকে লোটা বলে। বললাম - লোটাটা লুটিয়ে গেলত গেল ; তুমি নামতেগেলে কেন। পা ফসকে পড়ে গেলে কী হত?

সাধুদের তো কষ্ট দিলে, আমাদেরও ভাবনায় ফেললে।

ব্রাহ্মণী বললেন- আমার কি কম ভাবনা হয়েছিল - লোটা না আনলে জল খাব কি দিয়ে? মরলেত জল খেতে হত না, বাঁচাব জনাই জল-ভাত খাওয়া, বুঝলে?

ব্রাহ্মণী ঝেঁযে বললেন, আমি পয়সা দিয়ে কিনেছি, ছাড়ব কেন?

লোটাই যে তোমাকে ছাড়তে চায়। নূতন আর একটা না হয় কিনে দিতাম ; আর ওরকম করনা খবরদার বলছি। যদি ওরকম লীলা কর আবার কান মলে দেব, তোমার জাত যাবে বুঝলে?

বড় মহারাজ শাস্ত্রীজী সর্ব্বানন্দজী ব্যাপার শুনে হেসেছিলেন।

সাধুরা ব্রাহ্মণীর বোচকা রাস্তার উপর দেখে নিচে তাকালেন নাকি। দেখলেন প্রায় ৬০/৭০ ফুট নীচে থেকে ব্রাহ্মণী উঠে আসছিল। মহারাজ ঐকথা শুনে বললেন লোটাটা কি খুব সুন্দর? শাস্ত্রীজী বললেন - এলুমিয়ামের লোটা ; তা লুটাতে, লুটাতে অষ্টবক্র আকার ধারণ করেছে। তা ব্রাহ্মণীর খুব প্রিয ছিল বৈকি। মহারাজ বললেন - আরে বেচারা, আর একটা কিনে দাও। ভারিয়ারা আমাদের লটবহব বহন করে ; ব্রাহ্মণী কিছুতেই ওর বোচকা দেয়নি। বরাবর সে নিজেই তা মাথায় ঝুলিয়ে নেয়। ও বলে - বোঝা না বয়ে নাকি চলতে পারে না, অভ্যাস নাকি - বয়ে চলার। (সে নেপালের পাহাড়ী মেয়ে)।

আমরা কোনমতে শরীর বোঝা বয়ে চলি, ওচলে তার যথাসর্ব্বস্ব নিযে। কৌতুহল হল, একদিন তার বোচকাটা খুলে দেখলাম। ওতে কয়লা পর্যন্ত আছে দেখলাম। বলেছিলাম - তুমিত তামাক খাওনা, সে মা'র বারতি কয়লা নিয়ে এসেছিল। বলেছিলাম এ আবার কি। তুমি তামাক খাও নাকি?

রাগ করে সেদিন বলেছিলাম, যা কিছু ফেলে আসি - তা আবার তুলে আন কেন? আজ আমি ভাবছি, আমি ও কি কিছু তুলে আনিনি?

ব্রাহ্মণীর সেই কয়লা, আমার কাছে হীরায় রূপান্তরিত হল নাকি?

প্রিয় অনুপ, আমি তীর্থপথ হতে অনেক অনেক দূরে এসে পড়েছি। সে পথের দৃশ্যাবলী এলবামের পাতার মত এক একটা করে উলটে যাচ্ছে ; ব্রাহ্মণীর মিষ্টি হাসি, মালতীর নম্রতা, বউমার কৌতুক কথা, চম্পার সেবা, ভগবতীর ছেলেমানুষি, মা'র স্নেহ-ব্যাকুলতা, সর্ব্বানন্দজীর উপদেশ, শাস্ত্রীজীর সহানুভূতি, মহারাজের সদা হাসি মুখ। সবই একটার পর একটা দেখতে পাচ্ছি। আর দেখছি - একটা মেয়েকে। যার বয়স ছিল তেইশ, চব্বিশ ; সে খেয়াল খুশীমত হেসে গেয়ে চলত, গতি ছিল চঞ্চল। সুস্থির থাকার অবসর কাউকেও দিত না। কিছু দয়ামায়াও

বোধহয় ছিল, ছিল ব্যঙ্গ কৌতুক। ডুবন্ত মাঝিকে ডাঙ্গায় তুলে দিতে দ্বিধা করত না। হাওয়া-মহল ভেঙ্গে দিতে এক মুহূর্ত দেরী হত না। আমি আজ দেখতে পাচ্ছি তাকে ; সে অনেক ধাপ নীচে নেমে গিয়েছিল ; তার সেই স্বামী তাকে দুহাতে তুলে নিয়েছিলেন। তবু অভিমানী মেয়েটা সেই বিয়েটি পুতুল খেলা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। সে অনেক দূরে এসে পড়েছে, আজ কাকেও 'আমার' বলতে পারছে না।

কাশ্মীর

"**ভূস্বর্গ কাশ্মীর**" তা অনেকে বলেন। আমি সে স্থানে স্বর্গ নরক পাশাপাশিই দেখেছি। কাশ্মীরে প্রাকৃতিক প্রচুর শোভায় মানুষের নিবস চরম দুর্গতি এবং প্রাণ ধারণ জন্য সংগ্রাম দেখা যায়। সেখানের সুখ-দুঃখ দুটাই পীড়াদায়ক। বলতে ইচ্ছা করে সুখ দুঃখ ততটুকুই দাও যা সহ্য করতে পারি। কাশ্মীর বর্ণাতীত সুন্দর, বিষ ও অমৃত গড়া যেন। শুধু গান কবিতা নয়. অতি বাস্তব গদ্যে "ভূস্বর্গে" জীবন যন্ত্রনা আছে।

সুন্দরের লীলাভূমি কাশ্মীরে আছেন অমরনাথ শিব, দর্শনের জন্য অনেকেই সেখানে যান। নীলকন্ঠ শিব আকন্ঠ বিষপান করে অমরনাথ হলেন কি? অমরনাথ দর্শন আমার হলনা, অন্তরে তাঁকে দেখলাম ; বিচিত্র হাসিতে তুষারাবৃত ভগবান শিব - নিমিলিত চোখে, সতীর ধ্যানে মগ্ন।

আমরা ছিলাম মহম্মদ বক্তর বোট হাউসে। ভাড়া ধার্য্য করে যখন এগ্রিমেন্ট করতে চাইলাম, মহম্মদ বলল - ও সবের প্রয়োজন নাই। যতদিন ভাল লাগে থাকুন, তারপর হিসাব করে টাকা দিয়ে দেবেন।

বুঝলাম, বিশ্বাস করার সাহস আছে।

জলপথে বেড়াতে গিয়েছিলাম, শিকারাতে আমরা সবাই ছিলাম।

মোটর ইঞ্জিন লাগানো নৌকাকে শিকারা বলা হয়। চমৎকার ঝালর দেওয়া চাঁদোযা থাকে. বসবার ব্যবস্থা ও সাজানো গোছানো বেশ ভাল। ঝিলমের সুবিস্তৃত স্বচ্ছ জলে শিকারায় বেড়াতে গেলে এমন সব দৃশ্য দেখা যায় যা অপূর্ব ; ঝিলম হ্রদ বলব না নদী বলব জানি না. এটা কাশ্মীরের বড় একটা সৌন্দর্যাপূর্ণ সম্পদ। ওতে চিনার বাগ নগিন বাগ নামে অনেক ঘাট আছে। বোট হাউসগুলো এক একটা বড় নৌকায় সাজানোগোছানো বাড়ীমত। কোন কোন বোট হাউসে তিন চারটা বেডরুমও থাকে। সিটিং রুম, ডাইনিং রুম, বাথরুম ও ছোট বারান্দা যুক্ত। ছাদে যাবার সিঁড়িও আছে, উপরে বসবার স্থানে রেলিং আছে। ঐ বোট হাউসগুলোর সাথে একটা বড় নৌকাযুক্ত থাকে, সেখানে রান্না হয়, দেখাশুনা করার লোকজন থাকে, তারাই হাটবাজার করে দেয়, রান্নাও করে। তারাই পাহারাদারও বটে। ওদের বললে, যে কোন ঘাটে বোট হাউস নিয়ে রেখে দেয়, শিকারার ব্যবস্থাও ওরাই করে। ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা আছে। আমরা শিকারায় বসে জলপথে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঝেলমের স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি...., চোখে পড়ল একটা নির্দয়তা : জিজ্ঞাসা করেছিলাম - একি ! একটু লজ্জিত

হয়ে বক্তর মেজোভাই ইসুপ বলল - আমাদের জলে থাকতে হয়, সাঁতার জানতে হয়, ভয় করলেত চলবে না।

দেখলাম- একটা ছোট মেয়েকে শিক্ষা দেবার নমুনা ; অসহায় বোধ করছিলাম ; চেয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার ছিল না যে। একটা বড় গাছের কাণ্ড জন্মেছিল ; তা রোল করে মেয়েটাকে নাকানি চুপানি দিয়ে কি সব হিংস্রভাবে বলছিল। এই দৃশ্য দেখে প্রাকৃতিক রূপে আমার মন ভুলল না। আবার আর এক জায়গায় দেখলাম - ঝাড়ে ঝোপে ফুল ফুটে আছে ছোট্টদ্বীপের মত ঢিপিতে সরু একটা গাছের তলায় দুটো হাঁস কাছাকাছি থেকে গলা বাঁকিয়ে উপর দিকে মুখ তুলে রোদ পোয়াচ্ছে। স্থির ছবির মত। কোন কোনখানে দেখলাম জলপথের দুধারে ঘন জঙ্গল মত সরু সরু গাছ লাগিয়েছে. মনে হল অলিগলি পথে চলেছি। চাঁদনী রাতে ঝেলমের শোভা দেখে মনে হল - আমি কি আকাশে? না - জলে? শত শত তারার ছায়া. বাঁকা চাঁদের ছায়া জলে পড়ে মনকে নীরব করে দিল। বহু দেশ বিদেশ দেখেছি, এ আমি কোথায় এলাম? 'পৃথিবীর রূপের শেষ নাই', তাই এর আকর্ষণ মনকেও টেনে রাখে। সমুদ্রের সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, ঝেলমের বিচিত্র রূপ, এক একটা শোভা, বঙ্গদেশের শরতের কাশবন, ত্রিপুরার ফাল্গুন, মাধবী পুষ্পের সৌরভ শিশির স্নাত শেফালিকা ; সবই স্মৃতিতে আবদ্ধ হয়ে মনকে আলিঙ্গন করল।

আর একদিন কমলবাগ দেখতে গেলাম খুব ভোরে। সেখানে যাবার পথে ঝেলমের পরিস্কার জলের ভেতর সাজানো বাগান মত জলীয় ঘাস লতাপাতা, কচি কচি গাছ দেখে ভারি আনন্দ হল। 'কমল বাগ এসে গেছে' দেখলাম সেখানে অষ্টদল পদ্মের বড় বড় পাঁপড়ি ও পাতায় ছেয়ে গেছে। এর পাশ দিয়ে আমাদের শিকারা আস্তে আস্তে চলল......, পাতাগুলোতে শিশির বিন্দু ঝলমল হয়ে হীরামত দেখাচ্ছে। পদ্মগুলো হালকা গোলাপী আভা ছড়িয়ে - ফুলশয্যা যেন রচনা করেছে। চলন্ত শিকারার ঢেউ লেগে দুলে উঠল ঐ পদ্মগুলো।

আমরা পদ্মের অনেক রকম নাম শুনেছি ; যথা - পঙ্কজা, কমল, নিরজা, শতদল, মৃনালিনী, সরোজিনী ইত্যাদি....। কাশ্মীরের পদ্মকে পঙ্কজা বলা যায় না, শতদলও বলা যায়না। কাশ্মিরী পদ্মের সার্থক নাম নিরজা। অথৈ জলে যে ফুল ফোটে, নিরজাই বলতে হয়। পদ্মের রং ও ওজন হালকা ; পুরোপুরি দল বিস্তার করে আছে। কমলবাগ হয়ে আমাদের বোট চলল - নগিনবাগের দিকে.....। নগিনবাগে ঝিলম গোলাকার হয়ে আকাশের নীল ছায়া ধারণ করেছে। 'দেখতে দেখতে জলের চেহারা বদলে যাচ্ছে' সন্ধ্যা বাগে যখন রেঙে গেল, পাড়ের বোট হাউস গুলো হতে আলো পড়ে. জলের ভেতর অপরূপ আর একটা নগরী সৃষ্টি করল। 'মনে' নানাভাব বৈচিত্র্যে তা ছবি মত দেখা যাচ্ছে। এ স্বপ্ন নয়, চর্ম্ম চক্ষুতেই দেখছি। হাউসের পর্দাগুলো পাতলা রঙ্গিন ; হাওয়ায় উড়ছে, এর ছায়া এর আলো, রংয়ের বাহার, জলে আর এক নগরী সৃষ্টি করে স্পর্শাতীত হয়ে কল্পলোক বলে মনে হয়। কাশ্মীরে এ স্বপ্নময় রূপ বাস্তবে সত্য কি ?

নগিন বাগ পেছনে ফেলে অন্ধকার জলপথে আমরা ফিরছি....., ফেরার পথে একটুও আলো ছিল না ; ছিল কি কোন আশা? খুব ভোরে রওয়ানা হয়েছিলাম, ফিরছি অন্ধকারে। এসে পৌঁছলাম, রাত তেমন খুব বেশী হয়নি। ছেলেমেয়েরা গল্প করছে...., কাল কোথায় যাবে

প্রোগ্রাম হচ্ছিল। আমি কেবিনে এসে বালিসে মাথা রাখলাম . মন বিশ্রাম নিলনা।

আমি যখন কাশ্মীরে প্রথম আসি লাহোর রাওলপিণ্ডি হয়ে ; তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল; সরদারিয়া রিয়াসত রাজত্ব করতেন কাশ্মীরে, তাঁব নাম ছিল গোলাপসিং হিজ হাইনেস মহারাজা। ঐ সময় আমি ষোড়ষীর সাথে - আমার লোকজন নিয়ে রমেমালা গোস্বামীর বোট হাউসে দুমাস ছিলাম। বর্ত্তমান অধিবাসীরা তখনকার সেই গোস্বামী হতে অনেক দূবে এসে পড়েছে, তবু এই বর্ত্তমান, অতীতকে অস্বীকার করতে পারে না দেখলাম।

বুঝলাম - তাদের মনে ক্ষোভ জমে উঠেছে। বিভেদ বিচ্ছেদে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে রাক্ষুসীব মত হাত বাড়াচ্ছে ; গ্রাস করতে চাইছে মন বৃদ্ধিকে।

কাশ্মীরে ধনী গরীবের পার্থক্য খুবই চোখে পড়ে। যত দেখছি বাদশাহদেব বিলাস কাননগুলো, তাঁদের সৌন্দর্য্যবোধ, রুচিমার্জিত আরাম ইত্যাদি, আমাকে অভিভূত করেছে। ঐসব দেখবাব জন্য দূর দূরান্তর হতে ফরেনাররাও আসে। তেমনি - কাশ্মীরীদের দুর্গত অবস্থা, শিক্ষাব অভাব দেখে অভিভূত হয়েছি। ওরা সরল ছিল ; এখনও বিশ্বাস করে, আমাদের পব ভাবতে পারে নাই, আমরা ষ্টেটের মানুষ। রাজপরিবারের। এখনও আমাদের এমন কিছু একটা ছাপ আছেবোধ হয়, যা ওদের পরিচিত। আমাব মন ও কাশ্মীরীদের সুখ দুঃখ গ্রাহ্য কবে দেখছি : (ইংরাজদের সময়) ভারতের একছত্রে সব বাজা ছিল ; ভারত স্বাধীন হবার কালে কিছু অংশ, জনশান্তি রক্ষা হবে বলে বিভক্ত কবা হয় ; মূল উদ্দেশ্য শান্তি নাকি ?

অখণ্ড ভারতে স্ব স্ব স্থানে সবাই ছিলাম ; সুখ-দুঃখ তখন যেমন ছিল, এখনও আছে। শান্তি এটা বোধ হয কল্পনা করা হয়েছিল।

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, দেখলাম জাতীয় সঙ্গীতে কেউ উঠে না, সিনেমা শেষ হওয়াব মাত্রই হুড হুড় করে বেরিয়ে যায় হল হতে। অন্ধভাবে তারা পরিচালিত হচ্ছে। 'ঈশ্বর, আল্লা, গড্, তেরা নাম ' এ সব ওরা বুঝতে চায় না ; আমার ঈশ্বর তোমার আল্লা, এরূপ বিশ্বাসে কাশ্মীরের ধৃতরাষ্ট্রেরা আছেন। এখন জানছি, ভারতের হিন্দু মুসলমান - দুহাতই জনশান্তি রক্ষায় অপারগ।

ভারতে বহু মতবাদ আছে ; বেদ-বেদান্ত, কোরান, বাইবেল, বৃদ্ধ, জৈন ইত্যাদি। এরজন্য, মানুষের সম্পর্ক যদি ছিন্ন হয়, বিশেষ বিশেষ গুরুদেবরা অবতীর্ণ হবেন। ঈশ্বর, আল্লা, গড্ কীর্তনীয়ার রঙ্গভূমি ভারত রণভূমিতে পরিণত হবে। পাশ্চাত্য দেশগুলিও বেহাই পাবে না নিশ্চয়। এতে পৃথিবীর কিছু ভার লাঘব হবে, মানচিত্রের রেখাগুলো থাকবে না। হতাহতদের জন্য মন কি কাঁদবে না ? তবু মন আবৃত্তি কবল - " যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য সম্ভবামি যুগে যুগে " গীতা পাঠ করছিলাম, কখন যে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম- বুঝতেও পারলাম না। যখন ঘুম ভাঙ্গল, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হলাম। আমরা সকলে ঘোড়ায় চড়ে গুলমার্গে গিয়েছিলাম।

সহিসকে বলেছিলাম -তোমাদের কাশ্মীর খুবই সুন্দর।

সে বলল "সুন্দরতো বহুতহী হৈ" শীতের সময় আমাদের অবস্থা তো জানেন না। " ঐ নীচে ছোট ছোট ঘর দেখতে পাচ্ছেন ? শীতকালে আমরা ওখানে চলে যাই। এই যে দু পয়সা

কামাই করছি তখনের জন্য। এত শীত - মরতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরুল - এ তুমি কী বলছ, তোমার ভাই বিরাদররা যাঁরা কাশ্মীর পরিচালনা করেন, তারা কি কোন ব্যবস্থা করেন নি? " ভাই, বিরাদর, যাই বলুন, আমাদের অবস্থার হেরফের হবে না। শীতের সময় থাক কী করে? সে বলল, একটা বড় কোঠরীতে আগুন জ্বেলে সবাই এক সঙ্গে থাকি। সমিতে চা'র জন্য জল গরম করি একটা কোঠায় রান্না হয় কাপড় শুকাই, খাই, ঘুমাই। বড় লোকেদের আলাদা ব্যবস্থা আছে। ঝেলম ত দেখেছেন? ওটার জলও বরফ হয়ে যায়। আমি আশ্চর্য্য হলাম -(এ ছোড়াটা বলে কি)!

"আপনি দুদিন জন্য বেড়াতে এসেছেন, আমাদের দুঃখ বুঝবেন না।"

আর একদিন অলিগলি পথ হেঁটে গিয়েছিলাম রূপার সামগ্রী, শাল দেখতে। কাঠের কারুকার্য্য দেখবার মত। এত সুক্ষ্ম -আশ্চর্য্য হতে হয়। শালত (কাশ্মীরের) সর্বস্থানে প্রখ্যাত আছে।

রাস্তার দুধারে শেওলাধরা ভগ্ন প্রায় অনেক বাড়ী পেরিয়ে, নর্দ্দমা পেরিয়ে, সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে পৌঁছিলাম যিনি আমার ড্রাফট্ ভাঙ্গাতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ওখানে ঐরকম বাড়ীতে, শাল পসমিনা দেখে অবাক হলাম। শাল পসমিনা সাথে কিছু কিছু পরিচয় ছিল। এত যে দেখব অর্দ্ধ ভগ্ন বাড়ীতে তা আশা করিনি। পুস্তক লাইব্রেরীর মত সাজিয়ে রাখা ছিল। আমরা ফরাসে এসে বসেছিলাম ওতে পরিস্কার আসন মত কাপড় পাতা ছিল। মহাজন বললেন আপনার পছন্দ হলে অর্ডার দিন পাঠিয়ে দেব। আমি শাল পসমিনা হাউস কোট দেখলাম। তিনি খুলে দেখালেন। শাল হাউসকোট ২/৪ টা নিলাম ; ভদ্রলোক বললেন এ সবই পাঠিয়ে দেব আপনার ঠিকানাটা লিখে দিন। এডভান্স কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা করায় বললেন ও সব কিছু লাগবে না, ঠিকানা দিলাম, আমার ঠিকানা পড়ে - একটা খাতা খুললেন ; বললেন - এই দেখুন কত শাল আমি আপনাদের বাজ্যে বিক্রি করেছি। (সে অনেকদিনের) আমি পরিচিত অনেকের সিগনেচার দেখে অবাক হলাম ; মার্চেন্টরা দেখি পাণ্ডাদের মত খাতা রাখেন। মহাজন কি - ত্রিপুরায় গিয়েছিলেন?

যারা শাল পসমিনা কিনেছিলেন আজ ওরা কেউ বেঁচে নেই, আমি আছি কাশ্মীরে।

আমাদের জন্য চা জলখাবার এল, মেওয়া এল (পেস্তা বাদাম) খেলাম। চারটা হাউস কোট, একটা শাল, অর্ডার দিয়েছিলাম, যথাসময়েই পেয়েছিলাম।

কাল আমরা ফিরে যাব মালপত্র গুছিয়ে নিয়েছি।

মহম্মদ বক্তর বলল, মাইজী আপনি সোজা বাড়ী যান, আমি হলপ করে বলছি চারিদিকে যুদ্ধ লাগবে আবার। মেয়েদের নিয়ে এদিক সেদিক যাবেন না আর।

শ্রীমান সহদেব আমাদের প্লেনে তুলেছিল, সে ফিরে যাবে বৃন্দাবনে। আমরা যাচ্ছি দিল্লী।

কাশ্মীর আসার আগে বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম পিসীমাদের দেখতে। সেখান থেকে সহদেব আমাদের সঙ্গে এসেছিল ; সে থাকায় বেঁচে গেলাম। বলল মোটরে যাওয়া নিরাপদ নয়, বাসে যেতে হবে। পথে একরাত যদি থাকতে হয় মোটরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। সহদেব আমাদের মতই ফিরস্তা ; আমাদের দাদার ছেলে। কেশবও সঙ্গে ছিল। পথে একরাত থাকতে হল একটা সরাইখানার সামনে। সে স্থান নিরাপদ মনে হল না। মেয়েদের নিয়ে একটা আধভাঙ্গা নরবরে

ছোট একটা কোঠায় থেকেছিলাম। দরজা পর্যন্ত বন্ধ হচ্ছিল না। কোনমতে খাটিয়া দিয়ে ওর উপর মালপত্র তুলে রেখেছিলাম। এরমধ্যে - ভূমিকম্প হল, ফাটা দেয়ালটা নড়ে উঠেছিল, ওই ভূতুড়ে বাড়ীটা আগলে রেখেছিল আমাদের। সহদেব, কেশব, একটা খালি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল। খুব ভোরে আসতে বলেছিলাম ওদের। ক্যাম্পে কেউ ছিল না, ওখানে আমরা স্নান ইত্যাদি সেরে প্রস্তুত হলাম যাবার জন্য, চা রুটি খেয়ে বাসে সকলে উঠলাম। এ একটা ভীষণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পৌঁছেছিলাম কাশ্মীরে।

প্লেনে বসে ভাবছি অনেক বিপদ দুঃখ তোলা ছিল আমার জন্য, কিন্তু একটাও পেতে হল না। নির্বিঘ্নে চলেছি। কোনরূপ ভাবনা চিন্তা উঁকি দিচ্ছে না। ঝুপড়ি প্যালেস, ডানলোপ বিছানা, খাটিয়া, প্লেন, বাস সবই মন মেনে নিচ্ছে। মেয়েদেরও কোন আপত্তি হচ্ছে না। আনন্দেই আছে।

পঁচিশ হাজার টাকা, মেয়েদের অলঙ্কার, টিকিটও আগ্রায় ফেলে মথুরার পথে মোটর ছুটেছিল। হঠাৎ খেয়াল হল প্রায় অর্দ্ধপথে। ড্রাইভারকে বললাম যে, হোটেলে ফিরে চল , সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম আমার বড় রকম ভুল হয়েছে। যখন হোটেলে পৌঁছলাম- হোটেলের বেয়ারা বলল আমরা আপনাকে ডাকতে না ডাকতে মোটরটা গেল। আপনার ফ্লাস্ক ড্রেসিং গাউন ম্যানেজারকে দিয়েছি। বললাম এনে দাও। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। ম্যানেজার ফ্লাস্ক ড্রেসিং গাউনটা দিলেন। ওঁকে ধন্যবাদ দিয়ে মোটরে আবার উঠে বসলাম আমরা। মেয়েরা কাঁদো কাঁদো হয়েছিল। ওরা জানত আমার ফ্লাস্ক হারানো মানে -কী।

কিছুক্ষণ পর প্লেন থেকে নামব, তারপর ? রাজস্থান যাব নাকি ? কি থেকে কি হয়ে যাচ্ছে, কোন প্ল্যান করে বেরোইনি, খরচের কথাও মনে আসেনি। দেখাই যাক্, কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়ি। লাগামত আমার নাই! ছোটমেয়েটাও স্কুল ছেড়ে আমার পিছু নিয়েছে। ছেলেটার জন্য কষ্ট বোধ হচ্ছে।

শ্রীমতী অনু মুখার্জী দিল্লীতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। জনপথে এম.এল.এ হোস্টেলে (তাঁর একজন পরিচিত বান্ধবীর রুম) খুবই আনন্দে আমরা সেখানে প্রায় ১৫ দিন থাকলাম, বেড়ালাম ; সেখানে আমাদের বড় মেয়ে (দেবিকা) দেখা করতে এসেছিল, সে জয়পুরে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। জয়পুর ওর শ্বশুড়বাড়ী।

দিল্লীতে কিছু বিশ্রাম নিয়ে, যা তা কিনে, যত্রতত্র ঘুরে জয়পুর রওয়ানা হলাম। টেক্সীতে হরিদ্বারে গিয়ে (কোন কারণে) জয়পুর পৌঁছলাম সেখান থেকে ৯ ঘন্টায়। সেখানে আমাদের জন্য সুব্যবস্থা ছিল, বেশ আনন্দে দশদিন ছিলাম। সর্ব্বদা একটা মোটর রাখা ছিল, গোবিন্দজী দর্শন জন্য, বাজার হাট শহর দেখার জন্য। প্রভাবতী দেবী আমাদের জন্য প্রতিদিন আসতেন বেড়াতে নিয়ে যেতেন, হাওয়া মহল, শিশমহল, যা যা দেখবার সব দেখালাম।

রামবাগ হোটেলের একটা বাংলোয় আমাদের রাখা হয়েছিল, হোটেলে আমাদের টেবিল বিশেষভাবে রিজার্ভ থাকে। স্টুয়ার্ড স্পেশাল মেনু করে খাওয়াতেন। প্রতিদিনি মহারাজ কুমার পৃথীরাজও মহারাজ কুমার জয়সিং সঙ্গে বসনে। ব্রেকফাষ্ট আমরা যেখানে থাকি,

আনিয়ে খেতাম।

জয়পুরের আদপ কায়দা ব্যবহার ভাল ; এখানের মেয়েরা ঘাগরা উড়নী পরেন। জয়পুরের চদেরী, লহেরোয় রংয়ের বাহার, ছাপ, পরম্পরাগত বিশেষত্বের খ্যাতি আছে। যারা জয়পুরে এর বাহার দেখেছেন - অন্য কোনখানে সীমিত দোকানে তা দেখে আনন্দ পাবে না বলে মনে হয়। জয়পুরের মেয়েদের হাঁটা, চলন বলন প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে যা জীবন্ত হয়ে আছে। তা কি শো কেসে রাখা যায়? জয়পুরের রংয়ের মিল দেখে আমার চোখ জুড়াল। চদেরী লহেরোর রামধনু দেখে মন খুশী হল।

গিয়েছিলাম মিউজিয়াম দেখতে, পরিস্কারভাবে সাজানো গোছানো। আগেরকার দিনের শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম, তলোয়াব, বন্দুক কামান ছিল। মহারাজাদের যুদ্ধে পরার সরু শিকল দেওয়া বহিরাবরণ, তাঁদের হাতিয়ার, একে একে দেখলাম। একজন রাজার পোষাক দেখে আশ্চর্য্য হলাম, দৈর্ঘে প্রস্থে কি রকম বিরাট শরীর ছিল তাঁর। ঐ রাজাদের সরু করে কাটা নক্সা কাগজটাও কম আশ্চর্য্য করল না। যোদ্ধা রাজাদের এই চমকপ্রদ নক্সা কাটা কাগজগুলো খুবই চমৎকার ছিল। তাঁরা এতে মনোযোগ দিতে পারেন দেখলাম।

জয়পুরে অনেকের সাথে আমাদের পরিচয় হল ;

এক কোটিপতি ভদ্রলোক এ্যামেরিকান বললেন - একটা রেকর্ড ঘুরছে, ছেলেমেয়েরা ঘুরছে সাথে সাথে। এই ভদ্রলোক ছবি আঁকিয়ে ক্যারেক্টার বলেন। বেশ মজার খেলা মত ছিল ওটা। প্রফেসার রেগুামের সাথে অ্যামেরিকান মেয়ের ভারত নৃত্য দেখতে গিয়েছিলাম আমরা সবাই। তাঁর নৃত্য, সাজ পোষাক নথ পরতে দেখে আশ্চর্য্য হলাম। নিখুঁত ভাবে সেজে চমৎকার নেচেছিল।

'আমরা কাল উদয়পুর যাচ্ছি' জয়পুর থেকে পৃথিরাজ সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমরা চলেছি মোটরে, বিকাল প্রায় পাঁচটায় পৌঁছলাম বোধ হয়। একজন ভদ্রলোক অপেক্ষায় ছিলেন, আমাদের মোটরে এসে বসলেন, নিয়ে গেলেন লেকের ধারে। বোটে করে নিয়ে গেলেন লেক প্যালেসে।

সাদা পাথরের প্যালেস হোটেল, দেখবার মত ছিল। এমন যে দেখব আশা করিনি। আগে থেকে রুম রিজার্ভ করা ছিল। আমার ছোট মেয়ে ওআমি যে রুমে ছিলাম ওটা খুবই চমৎকার ছিল। আমরা নিজেদের রুমে হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, ড্রইং রুমে এসে বসলাম। সেতাঙ্গ তরুণ তরুণীরা ঝরোখায় বসে লেকের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন, কারুকার্য্য করা রেলিং ঘেরা ঝরোখাগুলো ছোট ছোট গুম্বুজে কিছু আলাদা মত দেখায় ; স্বচ্ছ পর্দাগুলো হাওয়ায় উড়ছে রূপসীর চাদরের মত।

উদয়পুর লেকে দুটা প্যালেস আছে, তা দেখার মত সুন্দর। একটা মহারাজের, আর একটা তৈরী করা হয়েছিল শাহ্জাহান জন্য, শাহ্জাহান কিছুকাল ঐ প্যালেসে অতিথী ছিলেন নাকি।

'আমরা হোটেলে থেকে বেরুলাম শহর দেখতে। জয়পুরের মত তেমন খুব ভাল লাগেনি। বর্ত্তমান মহারাজ যে প্যালেসে থাকছেন, দেয়াল ঘেরা ছিল। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব চোখে পড়ছে। যে হোটেলে খেতে বসলাম তা মাঝারি ধরণের মনে হল। কুরিয়ার ছেলেটা

দূরে বসে ছিল, খেতে বলেছিলাম, খায়নি।

ফিরে এসে খুব বিশ্রাম করলাম। রাতে ডিনারের জন্য গেলাম ডাইনিং হলে, দেখলাম - সেই অ্যামেরিকান ও সেক্রেটারী বসে আছেন ; আমাদের দেখতেই তাঁরা টেবিল ছেড়ে চেয়ার টেনে এনে আমাদের সাথে বসলেন, একসঙ্গে খেতে বসলাম। বুড়ো ভদ্রলোক খুব অমায়িক ছিলেন। তাঁর যুবক সেক্রেটারীটি সেজেগুজে খুস মেজাজে মেয়েদের সাথে কথা বলছে, আমরা কোথায়, কোথায় গেছি, ত্রিপুরা কেমন জিজ্ঞাসা করছিল। আমি মেয়েদের বললাম, বল- আকাশ এক হলেও ত্রিপুরাতে ছয় ঋতু দেখা যায়, আমাদের প্যালেসের সাদা গম্বুজটা শরৎকালে নীল আকাশে, খণ্ড খণ্ড মেঘের সাথে খুব ভাল দেখা যায়। প্যালেসের চারদিকে কম্পাউন্ড নাই, ওখানে মহারাজা মহারাণী আমরা কেউ থাকি না, রাজার সিংহাসন ওখানে আছে। আমার বড় মেয়ে যখন ওটা বলল ওরা আমাদের দিকে অবাক হয়ে দেখল। ভদ্রলোক বললেন তোমার মা, তোমাদের দেখে ঐ রকমই অনুমান করেছিলাম ; আপনাদের চালচলনটা কিছু আলাদা ; আমার দিকে তাকিয়ে বললেন।

এখানে রামবাগ হোটেলের মত সুস্বাদু খাবার ছিলনা, কোনমতে রুটি মাখনটুকু খেয়েছিলাম। ভদ্রলোক বললেন আর খেয়ে কাজ নেই; আমাদের সঙ্গে চলুন, এক্ষুনি মোটর বোট আসবে। উদয়পুরের মহারাণী আমাদের স্বজাতীয়; তিনি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেক্রেটারীকে বললেন, বোট এসেছে কিনা দেখ। চাঁদনী রাতেই নাকি লেক প্যালেস দেখতে হয়।

বোট হাজির, সবাই গেলাম। দু ধারের বেঞ্চে কুসন রাখা ছিল, ওতে সারি দিয়ে সবাই বসলাম। বোট চলল ..... বিরাট লেকে ছোট ছোট ঢেউ তুলে চলেছে, ধপ ধপে চাঁদের আলোয় মার্বেল পাথরের প্যালেসটা সেই তখনকার কাহিনী নিয়ে যেন মগ্ন হয়ে আছে। শাহ্‌জাহানের সাথে তাঁর প্রিয়তমা মমতাজ ছিলেন নিশ্চয়। দেখলাম বিরাট হাতী সুঁড় তুলে ঐ প্যালেসের চারকোণে চারটা। মনে হল পা' টা জলের ভেতর আছে। তখনকার কারিগরদের রুচিবুদ্ধি কাজ দেখবার মত। সাদা গম্বুজগুলোর সাথে মিশে চন্দ্রিমা রাত নিঝুম, নিবিড় হয়ে আছে। আমরা কথা হারালাম। সারা লেক অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে প্রায় রাত এগারটায় ফিরে এলাম। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানালাম। নমস্কার করেছিলাম। তিনি হাত বাড়ালেন, হেন্ড সেক করলেন সকলের সঙ্গে একে একে, বললেন বোম্বে যদি যান তাজ হোটেলে থাকলে আবার দেখা হবে।

উদয়পুরে আমার রুম ছিল দোতালায় - লেকের দিকে। হৈমন্তিকা ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে, ধপধপে বিছানায় চাঁদের আলো পড়েছিল। জলের ছলাত্ ছলাত্ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। এসে দাঁড়ালাম জানালার ধারে ; দেখলাম সিঁড়ির নীচের ধাপে ছোট ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ছে, এরই শব্দ অনবরত শুনতে পাচ্ছিলাম। কোথাও আর কোন সাড়া নাই। চাঁদ ডুবছে, ঘুমাতে চেষ্টা করছি ; সকালে উঠতে হবে। চিতোর দুর্গ শহর। সহেলিকী বাগ (সখীর বাগান) দেখতে যাব। কিছুতেই ঘুমাতে পারছিনা। ঘুমের বড়ী খেলাম কিন্তু আমাকে গানে পেয়ে বসল। লেক প্যালেসের আরামে ঘুম এল না, অবগুণ্ঠনে আবৃত হয়ে একটা কবিতা এল।

রাত্রি এল ধীরে

সূর্যেরে আড়াল করে রাত্রি এল ধীরে ;

নিয়ে এল হাসি-কান্না ভরা স্বপ্নের পসরা।
ঘন পলকে তার- ঘুমে ঢাকা আঁখি,
অন্তরে কুহেরিল বসন্তের পাখি।
এলায়িত ঘন কুন্তল কালো, অধরে রয়েছে সন্ধ্যার আলো,
নয়নে নেমেছে ঘন নীলছায়া, দিবসের দাহে ক্লান্ত কায়া,
অস্ত রবির রক্ত আভা ললাট ছুয়েছে তার।
আলো - আঁধারে রেখে গেছে যে তারে,
তাই বিচিত্র স্বপ্ন - জাগেকি অন্তরে?
এ-এক নীরব ছবি, বিষাদ বেদনাভার।।

মনের ক্লান্ত সুর কখন যে থেমে গেল জানলাম না।

যখন ভোর হল, চোখে আলো এসে লাগল, দেখলাম বেডটি টেবিলে রাখা হয়েছে। তাড়াতাড়ি চা পান করে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ব্রেক ফাষ্ট রুমের দিকে চললাম .... ।

তৈরী হয়ে আমরা বসেছিলাম ড্রইং রুমে, কিছুক্ষণ পর ফোনে জানলাম কবিয়াব এসেছেন। আমরা গেলাম বোটে। যে ছেলেটি প্রথম দিন নিতে এসেছিল, সেই আমাদের মোটরে করে নিয়ে এল সহেলিকীবাগে। 'খুব ভাল লাগল' সহজ সুন্দর অকৃত্রিম সখী যেন মর্নবিনোদন জন্য মধুর হাসি হেসে বলছে এমন কিছু কথা। মনে করিয়ে দিচ্ছে, কাছে এসে বলছে যেন - ' মনে পড়েনা- সেই ছোটবেলার আমাদের বাগান? স্থানে স্থানে ছিল মালি, যুঁই, (বেলী, যুথী) কৃষ্ণচূঁড়া। বড় একটা ফালচা গাছ ছিল। 'সে কত ফুল', সহেলীরা মালা গাঁথত, খোঁপায় পরিয়ে দিত ; বলত কত কথা।

উদয়পুরের সহেলী আমার খুব ভাল লাগল এর ঝোপঝাড়গুলো।

চিতোর

চিতোর দুর্গের ভেতর অলিগলি পথ ছিল ; সেখানে গেলাম যেখানটায় মীরাবাঈয়ের গিরীধারীলালের মন্দির আছে। মন্দিরের দরজায় লোহার শিক দেওয়া, অন্ধকার ছিল মন্দিরটা ;ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না মীরার সেই কৃষ্ণ মূর্ত্তিটি।

হায় পূজারিনী তুমি নাই বলে জ্বলে না দীপ, উঠে না সঙ্গীত সুর। মূর্ত্তি আকারে পড়ে আছেন ভগবান - চিতোর দুর্গে। আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছত? কারাগারে জন্মাষ্টমী অপেক্ষায় যেন আছেন।

ভক্ত হরিদাস যেখানটায় বসে ভজন গাইতেন, ঐ স্থানটি পিলারযুক্ত, গম্বুজ দেওয়া হয়েছে। এর চারদিক খোলা। ওটা মন্দিরের সামনে তৈরী হয়েছে। ভক্ত হরিদাস, আজো আমরা তোমাকে ভুলিনি, ভুলিনি মীরাবাঈকে। ইতিহাসের পাতায় চৈতন্য মহাপ্রভু সাথে- হরিদাস, নরোত্তম ঠাকুর আছেন। মীরাবাঈ আছেন সুমধুর সঙ্গীতে। একদা ভারতের শিক্ষা কৃষ্টি সবই

লুপ্ত হবে। সেদিন আমি থাকব না, এ আমার সৌভাগ্য। এরপর রাজপুত নারীর সেই চিতা, যেখানটায় মহারাণী পদ্মিনী তাঁর রূপলাবন্য ভষ্মীভূত করেছিলেন, তা দেখতে চাইলাম। কুরয়িার দেখালেন একটা চৌকো গম্বুজও পিলারযুক্ত স্থান, অল্প একটু স্থানে - মাঝখানটা কিছু দাবানো। কিন্তু - না, এ হতে পারে না এখানে , এই ছাদদেওয়া স্থানে। জ্বলেছিল খোলা জায়গায ; আর জ্বলেছিল - মনে। শত শত নারী— স্বামী পুত্র শোকে দেহত্যাগ করেছিলেন। আলাউদ্দিন অপমান করে যুদ্ধেব সূত্রপাত করেছিলেন. শত শত রাজপুত স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে বশ্যতা স্বীকাব কবতে মহারাজাবা অভ্যস্ত ছিলেন না। উদয়পুরের মহারাণী পদ্মিনী, ইতিহাসে প্রসিদ্ধা। মহারাণী মীরাবাঈ কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিতে আজো স্মরণীয়া আছেন।

নাথদ্বারা

উদয়পুর হতে নাথদ্বারা বেশ দূরে। কুরিযার বাজপুতের সৌর্যবীর্জ কাহিনী বলে যাচ্ছিল। নাথদ্বারা পৌঁছলাম, মন্দিরের আশেপাশে লোকেব ভীড়। এখানে বোধ হয় দুধ, দৈ, ঘি'র অভাব নাই। গ্রামটা বোধ হয় সম্পদশালী। মেয়েরা প্রায় কম হলেও ৬০/৭০ জন হবে ঝক ঝকে ঘটিতে দুধ বিক্রি করার জন্য বসে আছেন। আমিও এক ঘটি নিলাম, ফুল নিলাম, মহাদেবের উপর ঢাললাম। প্রণাম করলাম বিশ্বেশ্বরকে। সর্ব্বময় প্রভু ভোবেব আলোকস্তম্ভমনি ধাবণ কবে উদয় হন। শত শত মানুয পূজা পাঠ করে যাচ্ছিলেন নাথদ্বাবায়। আমি ও ধৃতী গেলাম নাথদ্বারাব ভণ্ডাবা দেখতে। প্রথমে কিছু অবাক হলাম ; মস্ত বড় কোঠায় পাঁচ ছয়টা কূয়োঁ মত ছিল, ওতে ভর্ত্তি ছিল - আটা, ময়দা, তেল, ঘি। বস্তা বস্তা চিনি গুড় ওমেপে ঢালা হচ্ছিল। প্রথমে ভ্রম হয গভীর কূয়ো বলে কিন্তু তা নয়। মাটি থেকে তিন চাব ফুট উঁচু করে ইটের গাঁথনী তুলে বাধাই করা হয়েছে। কূয়ো বলেই ভ্রম হয়। ভারি ভারি সের পাল্লা দেখলাম। বস্তা বস্তা মাল আসছে, অনেক লোক ওখানে কাজ করছে। এত মাল আসছে কোথা থেকে, কার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম না, মনকে সুস্থ রাখতে চাইলাম।

লীলাময় জগতের লীলা দেখে উদযপুবে ফিরে এলাম। সাবাদিন বিশ্রাম কবলাম। বিকেলে লাউঞ্জে এসে বসলাম। এর চারদিকে বারান্দা মাঝখানটা ঘাসে ঢাকা উঠান মত স্থান ; এখানে বিনোদ সেতাব বাজাল, আমার তেমন ভাল লাগেনি।

আমরা ডিনার খেয়ে রুমে বসে গল্প করলাম, এরপব আবাব কোথায় যাব ঠিক করছিলাম।

জয়পুরের ষ্টুয়ার্ড গোয়ানিজ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম- গোয়ার বৃত্তান্ত। গোয়া গেলে সমুদ্র যাত্রা ও হবে বেড়ানও হবে। ওরা সমুদ্র যাত্রা যে কেমন জানে না, এরপর আউরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা ইলোরা, তারপর গোয়া। এ পর্যন্ত প্রোগ্রাম হয়েছিল। রেঙ্গুন যাবাব জাহাজটা চমৎকার ছিল, তেমন বোধ হয় হবে না।

বোম্বে

পূর্ব্বে বোম্বেতে আমি অনেকদিন ছিলাম, ঐ সময় পেডার রোডের ধারে বারিয়া মহারাজের দোতালা বাড়ী ছিল, বাড়ীর নাম ছিল Sunnymore house (সানি মোর হাউস)। এখন আম্রনা নামে সুউচ্চ ফ্ল্যাট হয়েছে। ওখান থেকে মফতলালের বাড়ী দেখা যাচ্ছে - ছোট পুরোনো দালানের মত। একসময় মফতলাল গর্ব করেছিলেন এই বাড়ী নিয়ে।

যুদ্ধের সময় মাথেরান নোনাওলায় ও দু চার মাস ছিলাম। ছোটদিদির এমন একটা কথায় - দুঃখ বোধ করেছিলাম, বারিয়ায় থাকিনি। বোম্বে থেকে লোনাওয়ালায় যাবার জন্য ডাকানকুইন রেল আছে। ঐটায় যেতে খুবই ভাল লাগত। মাত্র একঘন্টা সময় লাগে। ওখানেও নামকরা দেখবার মত শত শত বর্ষ পূর্ব্বের কেভ আছে দোতালা উপরে। পাহাড় গর্ত করে কী প্রকারে সুড়ঙ্গ তৈরী হল - ভাবা যায় না। যুদ্ধের সময় অদৃষ্ট বিপাকে ঘুরছিলাম, এখন ও ঘুরছি মেয়েদের নিয়ে। তখন আমি দিশাহারা ছিলাম, এখন যে খুব সুস্থ তা নয়। ঘোরার জন্যই ঘুরছি, কিছু দেখব বলে ঘুরছি না। কিন্তু বেশ কিছু পরিবর্ত্তন চোখে পড়ছে। দেখলাম বোম্বের উপর নূতন প্রলেপ পড়েছে। নূতন ফ্যাসন নূতন বাড়ী, গাড়ী, দেখে যাচ্ছি। কোলাবায়, বাদরায় গিয়েছিলাম, সমুদ্রের নূতন চেহারা সেখানে দেখলাম ; কালো পাথরের গায়ে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে, এই সমুদ্রই স্থান বিশেষে অন্যরকম দেখায়।

এখন বোম্বে সহরে - আকাশে নজর যায় না। ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে এক টুকরো সাদা আকাশ মনটাকে ক্লান্তই করে। আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না আমরা কী চাই ; ঐটা কিনছি ওটা কিনছি ; সন্তুষ্ট হতে পারছিনা। বোধ হয় সুন্দর পরিবেশে ভাল সঙ্গ, আনন্দ, চাইছি কিন্তু ওটা সুলভ নয়। বিশেষ করে ভ্রমণ পথে।

নিরুদ্দেশ যাত্রায় আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করছি ; পথে-বিপথে কুড়িয়ে পাওয়া সুখ-দুঃখটাই সম্পদ যেন।

বুঝতে পারছি আমরা অবসর চাইনা ; কিছু না কিছু নিয়ে থাকতে চাই। থাকতে চাই মাদকতায়। নেশা ছাড়া জীবন - ভাবলে দুঃ হয়। পান করার নেশা বেশীক্ষণ থাকে না। একটার পর একটা পান করে নিঝুম মাত্র হতে হয় ; ঘুমের বড়ী খাওয়া মত। প্রতিদিনি তিলে তিলে মরতে হয়। বলতে হয় - " হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ, লইনু শরণ" তাও বলতে পারে না।

শিল্প ও অনুসন্ধান নেশা - সারাটা জীবন থাকে। পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা কৃতকার্য্য হতে না পারলে এখানেও একটা যন্ত্রনা আছে। বলতে হয় লইনু শরণ লইনু শরণ।

আমরা আম্রনায় একটা সুইটে আছি। বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বুঝতে পারছি - এটা ও বেশীদিন থাকবে না ; জয়দ্বীপের কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। সে শিল্পী, তার রুচি খুবই সুন্দর, ছবি আঁকার মত ঘর সাজিয়েছে (ঘুমন্তপুরী বলে মনে হয়)।

বোম্বেতে আমাদের বোন বীণা থাকে, তার ফ্ল্যাটে রোজই আমাদের নিমন্ত্রণ। সে প্রতিদিনি আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকে। সেখানেই সকালে বিকালে আমাদের খাওয়া হয়। মেয়েরা বোম্বে সহর ঘুরছে, সপিং করছে ; আমিও মাঝে মাঝে যাই। ব্লুফক্সে ডান্স হয়, ডিনার খাই।

বোম্বে থেকে আমরা আওরঙ্গাবাদে গেলাম। দেখলাম - অজন্তা, ইলোরা, কৈলাশ। আশ্চর্য্যা হবার মত ভাস্কর্য্য কার্য্যগুলো একে একে দেখলাম। মূর্ত্তিগুলোর ভঙ্গি, অলঙ্কার, সাজসজ্জা, বুদ্ধ যুগের নরনারীর রুচি, তখনকার বেশভূষা দেখে খুবই আশ্চর্য্য হলাম। বুদ্ধ স্তুপ ও আছে। ভারতীয় স্থপতিদের পাথর কাটা কাজও প্রাসাদ নির্ম্মান দেখে মনে হল এর পেছনে বিজ্ঞান কত উন্নত ছিল। এমন কিছু ছিল কি পাথর কাটার জন্য? সিলিং ও ফ্লোর দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়। মূর্তিগুলোর ঐ ভঙ্গি অলঙ্কারগুলো রং, ঝলমল হয়ে কি যেন বলতে চায়। আমার ধারণায় শিল্প ও বিজ্ঞান মিশ্রিত অজন্তা, ইলোরা, ভারতের গৌরবময় অতীত ইতিহাস বহন করে - কি যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আমরা যা দেখি তা মনে প্রবিষ্ট হয়, মন অনুসন্ধান করে অনেক কিছু। ঐ যে অজন্তা গুহায় বিরাট বুদ্ধমূর্তি দেখা যাচ্ছে, এর একদিকে যখন আলো ফেলা হয় - অত্যন্ত উদাশ দেখায়, আর এক দিকটায় আলো পড়লে প্রসন্ন হাসি দেখা যাচ্ছে। মাঝে যখন আলো পড়ল কী দেখছি? ধ্যান গম্ভীর বিরাট পুরুষ মগ্ন হয়ে আছেন। এটা কি শুধু আলোর খেল।

যাঁরা এমন মূর্ত্তি জীবন্ত করে সমাধিস্থ করে রেখেছেন, তাঁরা আমাদের মত সাধারণ নন। শিল্প ও বিজ্ঞান তাঁদের আয়ত্বে ছিল বলে এমন গড়তে পেরেছেনে। বুদ্ধিমত্তার সাথে শিল্প প্রকাশ অজন্তায় দেখলাম। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ স্থানেতে, অর্থাৎ - যেখান দিয়ে আলো আসে ঐসবখানে ছবি, মূর্ত্তি, রাখা হয়েছে। শুনেছি এগুলো ভোরের আলোয় চমকপ্রদ হয়, কোন কোনটা নাকি সন্ধ্যায়। অলঙ্কারুগলো ঝলমল হয়ে উঠে নাকি. তথাগতের মূর্ত্তিতে আলো ফেলে দেখানোর পর তা সম্ভব বলে বিশ্বাস করি।

তখনকার রংয়ে এমন কিছু ছিল - শত শত বর্ষ পরও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ঠ হয়। সার্থক হল আমাদের ভ্রমণ। আনন্দ নিয়ে বোম্বে ফিরে এলাম।

এরপর আমরা গোয়া যাব ; বীনাও তার ছোট বোন গায়ত্রীও আমাদের সঙ্গে যাবে। সুপার কেবিন একটা, ডিলাক্স একটা, ফাষ্ট ক্লাস একটা কেবিন নিলাম ; আগে থেকে বুক করতে হয়।

যথাসময়ে আমরা ছয়জন যাত্রী রওয়ানা হলাম। আড়াই দিনে পৌঁছলাম গোয়াতে। সমুদ্র যাত্রাই সবচেয়ে আনন্দ দিল আমাকে।

গোয়ায় অনেকগুলো গীর্জা আছে। এক ধর্মযাজকের শরীর এখনো একটা কাঁচের লম্বা বাক্সে রক্ষিত আছে সেখানে। আমরা প্রণাম করতে গেলাম। পূর্ব্বে নাকি গোয়াতে বিদেশ থেকে বহু নরনারী আসতেন।

গোয়ায় আমরা মাত্র সাতদিন ছিলাম। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। গোয়াতে মেঙ্গেনিস নামে মাটির ঢেলা পাওয়া যায় তা রপ্তানী হয়। গোয়ার লোকেরা ভদ্র। এখানে অনেকের বাড়ী আছে দেখলাম। কাদের জানি না, খালি পড়ে আছে। মেয়েরা রেষ্টুরেন্টে খেয়ে সমুদ্র স্নান করে খুশী আছে। আমিও বীণা বসে বসে বিয়ার স্নেকস্ খাই।

আমরা বোম্বে ফিরে এলাম, দেখি - বীণার বড় মেয়ের জামাই নার্সিংহোমে, অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করতে হল। ও সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে এলে আমরা দিল্লী হয়ে নৈনিতাল গেলাম।

নৈনিতাল

পূর্ব্বে আমি যে নৈনিতালে ছিলাম প্রায় তিনটা মাস, এ যেন সে নৈনিতাল নয়। পুরাণে বর্ণিত উর্ব্বশীর মত নবীনা যৌবনা। যৌবনা কেন বলছি জান? এখানে কিছু মাদকতা আছে। সবুজ হ্রদ, ফুলের বাহারি প্রসাধন, আকর্ষণীয় হয়ে আছে। হ্রদে নৌকাগুলো লাল নীল সবুজ পাল তুলে আকাশের গায়ে মিশে আছে। ছবির মত দেখা যায় পাহাড়ের গা ঘেষে। যাত্রীর জন্য প্রতীক্ষায় আছে, যখন জলে তরঙ্গ তুলে ভাসে মনে হয় খুসীর লহর।

রেলিং দেওয়া রাস্তার উপর ফুলগুলো হ্রদটাকে বেষ্টন করে আছে। এর উপর আর একটা রাস্তা, তাও ফুলে ফুলে সেজে আছে। একটা রাস্তায় লোক চলাচল করে, আর একটায় গাড়ী চলে। ঘোড়সোযাররাও নীচের রাস্তায় বেড়াতে যায়।

শহরের মাঝখানটায় খোলা ময়দানমত বিস্তৃত, এর চারিদিকে দোকান সাজানো গুছানো। উপরের দ্বিতীয় রাস্তার পাশে অনেক হোটেল আছে । আমরা অলকাপুরীতে আছি। এটাই তখন ভাল হোটেল, হোটেলের মালিক বোধ হয় আর্টিষ্ট মানুষ। মোঘল কমটা আমাদের কি চমৎকার।ব্যালকনি থেকে দেখছি -নীলাকাশে মেঘের খেলা। কখনো হাসি, কখনো ঘন কুয়াশায় ম্লান ; বৃষ্টি পড়ল কিছু কিছু। আলো ছায়ায় কুহেলীকা সৃষ্টি করে হাসল, আবার রাতে দেখলাম দূরে পাহাড়ের গায়ে জোনাকির মত শত শত আলো কুয়াশার আবরণ ভেদ্ করে উর্ব্বশীটি চাকচিক্যময়ী হয়ে উঠল। রূপসীর চাদরে, বুটি দেওয়া মত রূপালী তারাগুলো দেখা গেল। আকাশের মুগ্ধ আলিঙ্গনে স্বপ্ন রচনা করে, মোহময়ী হয়ে নৈনিতাল আমাকে ঘুম পাড়াল। বেশ আরামে ঘুমালাম, কী হারালাম, কী পেলাম হিসাব মেলাতে পারলাম না, চেষ্টাও করলাম না। এক একটা মূল্যবান মুহূর্ত্তের আনন্দই পরম লাভ। আমার শালগ্রাম স্বামী বিশ্বময় হয়ে তার বিশাল বক্ষে আমাকে ঘুম পাড়ালেন।

নৈনিতালে নৈনাদেবীর সুন্দর মূর্ত্তি, মন্দির আছে। গেলাম, প্রণাম করলাম। শুনলাম, রাণী খেত আলমোড়া নাকি ভারি মনোরম। ওসব দেখবার সাধ নাকি ছেলেমেয়েদের নাই। তারা স্কেটিং করছে, পড়ছে ; হাত পা ভাঙ্গেনি এই ভাগ্য।

আমার কিছু করার নাই ; আমি সিনেমা দেখছি, সেখানেই লাঞ্চ খাচ্ছি। চলছিল আলফ্রেড দ্যগ্রেট, ভাল লাগল। ঐ ছবিতে জানবার মত বিষয় অনেক ছিল। তাঁর বিষয় লিখতে ইচ্ছে করছে কিন্তু ভ্রমণ কাহিনীতে লিখলে তুমি রাগ করবে। বলবে বিষয়ান্তর হল।।

মাউন্ট আবু

প্রকৃতির সৃষ্টিতে মাউন্ট আবু একটি সৌন্দর্য্যের মিষ্টি বিন্দু। সেখানে গিরি শিখর যাবার পথে - পাথরের কত শত রূপ দেখে চলেছি..., মনে হল পাথরে প্রাণ আছে, ওতে মমতাময় আশ্রয় আছে। নির্জীব নিরসঙ্গ নয়। দেখলাম কত রকম গুহা গহ্বর। আমার মনটা কিছুক্ষণ

সেখানে বিশ্রাম নিল। কেউ কোনদিন এই গুহায়. এমনি গুহায় ছিল কি? পথের দুধারে কত রঙের জঙ্গলা ফুল ফুটে আছে, পাতার আড়ালে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ফুলের উৎসব দেখে চলেছি। প্রীতি সম্বর্দ্ধনা নিয়ে পথ আলো করে আছে। মাউন্ট আবুর পাথরগুলো কোন কোন স্থানে সবুজ আস্তরণে ঢাকা। ঝাড়ে ঝোপে দেখা যায় ঝর্ণার ক্ষীণ ধারা। ঘন বনের নিরিবিলিতে বিস্তৃত হ্রদ মানচিত্রের মত এঁকে এঁকে রয়েছে। কোথাও আবার বিরাট বাটীর আকারে কানায় কানায় ভরা নীলজল। উপচে পড়ে যাবে না ত? এমনি দেখায়। মাউন্ট আবু, উদাসিনী উমা যেন। সুন্দরী কিন্তু এ যেন তাপসী। গেরুয়া মাটি বসনে সন্ন্যাসিনী যেন।

সুনীল আকাশ, শ্যাম সুন্দরের উদার প্রকাশে মন বলে -

এতরূপ তুমি কোথা পেলে শ্যাম,
এত সুর তুমি কোথা পেলে?
শ্যামবন ছায়ে তব সুরে সুরে পাপিয়া ধরেছে গান,
উদাস করিয়া প্রাণ।
ওহে সুন্দর, চির মনোহর,
কুঞ্জ কাননচারি। এত রূপ কোথা পেলে?
তব রূপছবি আকাশের নীলে যমুনায় ছায়া ফেলে,
বিভোর হইয়া চেয়ে থাকি আমি, কলস ভাসায়ে জলে।
এত রূপ কোথা পেলে।।

মাউন্ট আবুর ধ্যান মগ্নতায় মন ডুবে গেল। এখানে এলে সূর্যাস্ত দেখতে হয়, একটা উঁচু পাহাড়ে ভাল ব্যবস্থা করা আছে। পাথর সাজিয়ে সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে নানা ধরণের খাঁচ আছে, ঢিপি আছে। পাথর দিয়ে রেলিং আছে। আমরা পাহাড়ে উঠলাম, হৈমন্তিকা বলছে - দেখ, দেখ, চাঁদ সূর্য এখান থেকে দুটোই দেখা যায়। বললাম - সূর্যাস্ত দেখতে এসেছি, আবার চাঁদের কথা কেন?

হৈমন্তিকার সাথে আমি মাউন্ট আবু এসেছিলাম। সে আমার ছোটমেয়ে। বিয়ে হয়েছে। আমাদের সঙ্গে অনেকে ছিলেন একসঙ্গে সবাই চলেছি, দুই চার জন করে কেউ খাঁচে বসলাম, কেউ ঢিপিতে, কেউ বসল আরো উঁচুতে উঠে।

অস্তপথে নিজের জীবনটাকে যেতে দেখলাম।

উষাকালে পাখীর কলরবে উদয়াচলে দেখেছি রবির স্নিগ্ধ আলো। তারপর - দ্যুতিময় সূর্য্যের যৌবন জ্যোতিতে জীবজগৎ উদ্দীপনায় কর্ম্মব্যস্ত জীবন সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। এরপর - মধ্যাহ্নে তাপিত হয়ে ক্লান্তিতে অস্তপথে যেতে থাকে অরুণ। - শেষ রশ্মিতে রাঙা হয়. আবির ছাড়িয়ে যেন শেষ খেলা খেলে, মায়াময় রংখেলা শেষ করে। এরপর বিদায় ব্যথায় ম্লান হয়ে অস্ত যায়। তা দেখবার জন্য বসে আছি। পাহাড়ের উপর থেকে দেখছি - শেষ দেখার মত মাউন্ট আবুর শোভা। ছবির মত দেখা যাচ্ছে নদীনালা, ক্ষেত, উপত্যকা, কতকি..... এইত এক্ষুনি ঢাকা পড়ে যাবে সব। ঐ যে গেল গেল পড়ে গেল - শ্রীমান সলিল কৃষ্ণের হোলী গানের মত।

" অরুণ রাঙা দিন, অঙ্গে হয়েছে লীন, ..."

অন্ধকারে বসে আর কি দেখব, আমরা সেখান থেকে নেমে এলাম একটা কাফের সামনে বেঞ্চে বসলাম। চারিদিকে দোকান হাট, এখানে মিনা কাজ করা অলঙ্কার পাওয়া যায়। ছাপা কাপড়গুলোও চমৎকার। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে অলিগলি পথে লেকের ধারে গেলাম। তা গভীর বলে মনে হল, রেলিংয়ে ঘেরা ছিল তা। এত ভীড়েও ঐ লেক নিরিবিলি ছিল, ওতে চাঁদের টুকর টুকর আলো ছিল। আকাশে মেঘ নাই। আশপাশের গাছগুলো ছায়া ফেলেছে হ্রদের অর্দ্ধেকটায়। আমি রেলিংয়ে ভর দিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছি। মেয়ে নাতনীরা এদিকেই আসছে (হৈমন্তিকার তখন ছেলেমেয়ে হয়নি) ইন্দ্রবর্ম্মার মেয়ে শালিনী বলল - এই যে দেবী (শালিনীর মা দিদির মেয়ে) তা এর চেহারা আমার প্রিয়বান্ধবী মল্লিকা দিদিরই মত।

আমরা দলবেঁধে বাজারে গেলাম। বাড়ীর মেয়েদের জন্য কিছু মালা কিনে আবার বসলাম কফির জন্য। হৈমন্তিকা বসল আমার পাশে। ওরা গল্প করছে। আকাশে আমার চোখ গেল। দেখলাম কুচকুচে আকাশে ঝকঝকে চাঁদ। কাছে কাছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ।

কতবার মেঘের খেলা দেখেছি, চাঁদ দেখেছি, মাউন্ট আবুর কালো আকাশ, চাঁদের ঝকমক, এমনটা দেখিনি কোথাও।

ছোটমেয়ে শালিনী বলল - তুমি তারা খুঁজছ? ঐ দেখ - একটা গাছের উপর। দেখলাম - একফোঁটা আলো বিন্দু, অনেক অনেক দূর থেকে মিটমিট করছে।

মাউন্ট আবুতে দিলওয়ারা জৈনমন্দির আছে। কথা হচ্ছিল আমরা তা দেখতে যাব।

দিলওয়ারা

শিল্পীদের কর্ম্মশক্তি, রুচি ধারণ করে - জৈন মন্দিরটি আছে। সাদাপাথর খোদই করে মন্দিরের ফ্লোর পিলারগুলো ও দেয়াল সেজে উঠেছে। দিলওয়ারা মন্দির নির্ম্মাতা শিল্পীদের স্মরণ করে প্রণাম করলাম। মহাবীরের প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখে আমার মন পরিতুষ্ট হল। মাটিতে মাথা রেখে তাঁকে স্মরণ করে প্রনাম করলাম।

তপস্বিনী আবুর দিলওয়ারা দিলদার। শিল্পীদের স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে ধ্যানমগ্ন। বার বার বলতে ইচ্ছা করে - আমার দিলদার, দিলওয়ালা ; অহিংসার প্রতীক মহাবীর।

দেখলামদ্বারেদ্বারে খোদাই করা আল্পনা। শঙ্খ, ফুল, লতাপাতা,দ্বারে দ্বারে। অনেক রকমের পদ্ম করা হয়েছে । দরজার প্রতিটি কাজ , আমি বর্ণনা করতে পারছিনা, কত রকমের শঙ্খ প্রতিদ্বারের সামনে রাখা হয়েছে এর কারুকার্য্য বর্ণনা করতে আমি অক্ষম। শিল্পীদের স্ববৈশিষ্ট্য ওতে প্রকাশ পেয়েছে। নির্ব্বাক হয়ে ঐ গুলো চেয়ে থাকা ছাড়া কিছু বলতে পারছিনা। খিলানের কাজগুলো খুব সুন্দর। দেয়ালে জালি কাজগুলো চেয়ে থাকতে হয়। চেয়ে থাকা ছাড়া কিছু বলার নেই সেখানে।

পাশ্চাত্যের তুলনায় - বলতে হয় কোথাও কোন স্থুলতা নেই, যা অশোভন ভাবে চোখে পড়ে।

দ্বীপ

সৌরাষ্ট্রদ্বীপ নামে একটা স্থান আছে, তা গোয়ার অন্তর্গত। এই স্থানটি এককালে পোর্টুগীজদের দখলে ছিল। জুনাগড় থেকে মোটরে করে ঐদ্বীপ দেখতে গিয়েছিলাম। হৈমন্তিকাও যশপালের বন্ধুবান্ধবীরাও অনেকে ছিলেন। ওখানে আমরা তিনদিন থেকেদ্বীপ ভ্রমন করে দেখেছিলাম। সমুদ্রপারে স্থানে স্থানে নারকেলগাছগুলো পাথর খণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। এমন যেদেখব আশা করিনি। আমাদের দেশের মত সুদীর্ঘ নারকেল গাছ দেখে অভ্যস্ত চোখটা মনকে আশ্চর্য্য করল। গাছগুলো কেমন বার্ণ রং দেখাচ্ছিল। খাটো খাটো গুচ্ছ একসঙ্গে কোথাও ৪/৫ টা কোথাও দুটা একটা বার্ণ ও সবুজ মিশ্রণে পাথরের ঢিপিতে ঐগুলো কুঞ্জ রচনা করে ছবির মত দেখাচ্ছিল। সামনে এর সমুদ্র, দূর হতে ফেনীল উচ্ছ্বাস দেখা যায়,শব্দ ভেসে আসছে, মনটাকে কেমন যেন করেছিল। সুখ নয়, দুঃখও নয়, খুব যে আশ্চর্য্য হচ্ছি তা ও না। এতজনের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম।

সমুদ্রের সাথে মিশে ছিল ঐ নির্জ্জন স্থানটি; আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম....., দেখলাম একটা নোনাধরা ঘরে একদিকে ছিল কিছু মানুষ, তাঁদের নীল চোখ, উসকো খুসকো ব্রাউন চুল, গেরু কাপড়, শ্রীহীন ক্লান্ত চেহারা ছিল। এরা সর্বসুখ ছেড়ে এখানে এই অবস্থায় কেন? এরা পথের ডাক শুনতে পেয়েছে কি? অস্বাস্থ্যকর নিরানন্দের জীবন বিসর্জ্জন দিতে, এরা এখানে আছে মনে হল। 'ভালো লাগল না' আমি ঐ ভাঙ্গাঘরে বিশ্রাম নিতে চাইলাম না। উঠে পড়লাম, সবাইকে আসতে হল আমার সাথে। ফিরে এলাম রেষ্ট হাউসে।

পর্টুগীজদের ঐতিহাসিক জাহাজটা সকলে দেখতে গেলেন, আমি ও গিয়েছিলাম। একটা খোলা বাড়ীও সমুদ্রের ধারে ছিল। মনে হল এটা বাড়ীর একটা অংশ। সরু সিঁড়ি উপরে উঠার জন্য আছে। উপর থেকে চারিদিক লক্ষ করা যায়। রেলিং ঘেরা সমুদ্র পার অনেক অনেক দূর পর্যন্ত গেছে; মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও গোলাকার করা হয়েছে - তা না বলে বাঁক নিয়েছে বললে ঠিক হয় দ্বীপের এই রেলিং ঘেরা স্থানটি চমৎকার, কিন্তু চূড়ান্ত অবহেলায় আছে দেখলাম। এমন কি টিন শেড দিয়ে গোডাউন উঠেছে কোন কোন স্থানে।

যে কোন সুন্দর সৃষ্টি বিকৃত অবস্থায় পীড়াদায়ক, তা কোনদিনই কারো জন্য আনন্দ প্রদ হয়না। যেকোন সময়ের প্রশংসনীয় সৃষ্টি তা সর্ব্বদেশে রক্ষিত হতেই দেখা যায়; দ্বীপে সেরূপ কোন চেষ্টাই দেখলাম না। ঐ গোডাউনগুলো যদি আমি ভেঙ্গে দিতে পারতাম - কাজের মত কাজ করেছি বলে আমার মনে হতো।

মুসৌরী

এই সেই মুসৌরী? এককালে এস্থান জাঁকজমকে ঝলমল ছিল। ষ্টি ফুল, হ্যাকম্যান, এই দুটো স্থান, প্রতিরাত্রে আনন্দে উচ্ছল থাকত। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে ব্যাণ্ড বাজত; রাজা রাণীরা প্রতি বছর গ্রীষ্মের সময় মুসৌরীতে আসতেন। তাঁদের অনেকেরই বাড়ী ছিল সেখানে। পার্টির পর

পার্টি চলত। রূপসী রাণীদের রূপে রসে মুসৌরী ছিল চমকপ্রদ। এখনো মুসৌরীতে রিক্সা চলে কিন্তু রিক্সা চালকদের তখনকার সাজপোষাক তকমা পাগড়ী আজ আর নাই। এদের মতই উসকো খুসকো হয়ে ধূসর মুসৌরী আছে, । প্রাণহীন বলে মনে হল।

সুখের সাড়া নাই বা থাকল, দুঃখবোধ ও কি কারুর নাই? এখন এখানে, একঘেয়েমি নিরানন্দে সূর্য উঠে, ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে অস্ত যায়। ঠণ্ডি সড়কের উপর ইসেকসলজ বাড়ীটা ছিল। আমরা একসময় ঐ বাড়ীতে ছিলাম। দেখলাম আজও তা যেন কোনমতে টিকে আছে। এর জরাজীর্ণ শ্রীহীন অবস্থা দেখে দুঃখ হল বৈকি।

কুয়াশা ভেদ করে কোলাহল তুলে, অনেক দিনের কাহিনী ভীড় করে এল। স্মৃতিবহুল মাদকতায় তিন দিন সেখানে ছিলাম। মুসৌরীতে দেখবার মত এমন কিছু নাই। বুঝবার মত কথা অনেক আছে।

যাঁদের জন্য মুসৌরীর রাত আলোকিত ছিল, তাঁরা অস্তপথে চলে গেছে, হাওয়ায় মিশে গেছে তাঁদের ক্যাসেল। আমি ভাবছি তাঁদের কথা, এখন কোথায়? কিছু খুঁজছেন কি? মায়া মরিচিকা সোনার হরিণের জন্য সীতাহরণ হয়েছিল, এঁরা গেল কোথায়? রূপের চাকচিক্কে হীরাগুলো চমকে উঠত, মুগ্ধ ছিল মুসৌরী রাত। যেমন - হোলী উৎসব শেষে আবর্জ্জনার মত ফুল আবির পড়ে থাকে ; ক্লান্ত সন্ধ্যা ঢুলুঢুলু চোখে যেমন চেয়ে থাকে, মুসৌবী আমার কাছে ঐরকম দেখাল। অতীত সাথে জড়িত হয়ে, মন দীর্ঘ নিঃশ্বাস তুলল, আমি একটু হাসলাম। প্রথম যখন মুসৌরী আসি, আমি ছোট ছিলাম। পুরোটা সিসিল হোটেল ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। তা রাজভবনে পবিণত করা হয়।

মণিদের লোকজন, বাবার ষ্টাফ কম ছিলনা। ঐত, ছবিতে সবাই আছেন। দাদা যুবরাজ, বোধজং, দাদা লেবুকর্ত্তা, মলয়ঠাকুর, যাদব ঠাকুর, ভগবান ঠাকুর, বসন্ত ঠাকুর, জর্ম্মান ক্যাপ সাহেব, দাদু ছুটবীকর্ত্তা, কাকা ব্রজেন্দ্রকিশোর, ললিত ডাক্তার, মনি ডাক্তার।

আমাদের দলবলও কম নয়। বড়দিদি বসন্ত প্রভা, ছোটদিদি বিভাস প্রভা, ইলা আমি ছিলাম ; আমাদের ধাইমারাও। ঐ ত আমাদের ছবি আমি নেপালী পোষাক পরে আছি, দিদিরা শাড়ী পরে, ইলা বসে আছে ফ্রক পরে, দাদা যুবরাজ স্যুট পাগড়ী পরে আছেন। আমার বয়স তখন মাত্র ৫/৬ হবে, আমার স্মরণ শক্তির জন্য সবইকে চিনতে পেরেছি, (ষ্টুডিও নাম কানজি নাকি)

এরপর পনের বৎসর বয়সে আবার এসেছিলাম এখানে। তখন একদল ছিলাম ইসেক্সলজে. আর একদল ছিল নারায়নী নিবাসে। সে সময়েব কথা লিখছি, কারা উষ্ণ রেখেছিল মুসৌরীব আবহাওয়া। কিছুটা পাশ্চাত্যের ছোঁয়া ছিল ; গরমের সময় সেতাঙ্গরা এখানে আসত। তারাই মুসৌরী হিল ষ্টেশন গড়ে তুলেছিল।

'পিসীমা ও আমি, ইলা, ইসেস্কসে ছিলাম ' আমাদের বড় দিদি বসন্তপ্রভা ও ছোটমানির লাংস টি. বি. হওয়াতে ডাক্তার বুচারের চিকিৎসাধীনে ইসেস্কলজে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। রোগটা ছোয়াচে নাকি, তখনকার দিনে বাঁচান খুবই দুস্কর ছিল। দাদা মহারাজ যখন মুসৌরী এলেন ইলা ও আমাকে দুদুমনীর (রাজমাতা অরুন্ধুতী) সাথে রাখলেন। বলতে শুনলাম - ও

কেন ওখানে? ও মেয়ে আমাকে অশান্তি ভোগাবে , একেও পাঠাতে হবে.... সুইজ্জারল্যাণ্ডে। ছোট মানীকে আমি মুখ দেখাতে পারবনা।"

থাকলাম নারায়নী নিবাসে। (নারায়নই রক্ষা করেন) আমার মানি চতুর্থ ঈশ্বরী যে কেন উদ্বিগ্ন হতেন আমাকে কোথাও নিয়ে গেলে, তা তখন বুঝতাম না। আমার ভাবনা চিন্তা নাই, আমিত মুসৌরীতে বেশ ছিলাম। গোপালপুরেও ছিলাম বাইমনা বসন্তপ্রভাব সঙ্গে প্রায় ৩/৪ মাস। এখন আমি নিজেই অবাক হই আমার কেন কোন অসুখ করে না? মনে পড়ে না কোনদিন বিছানায় পড়েছি। রোদ বৃষ্টি জল সবই আমার গা সহা। এটা ভাবলে আমাব অবাক লাগে। আমি ঠাই এমন এক জায়গায় আছি - আমার কোন পরিবর্ত্তনই হয়না শরীর একদিকে, আমি আর একদিকে। ত্রিশ বৎসব বয়সে আমার মাথার মাঝখানটায় চুল পাকতে আরম্ভ করে, আব কিছু হচ্ছে না? দীর্ঘকাল আছি, কেউ কেউ বলে অল্প বয়সে না জানি কত সুন্দব ছিলাম। আমি হাসি, কি অদ্ভুত ধারণা। একটা চুলও এখন আমার কালো নাই। মুসৌরীর বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের রূপ বর্ণনা কবছি। বর্ত্তমান মুসৌবীব চেহাবা যে অনেকটা আমার মত এখন। বারিয়া থেকে দিদি এসেছেন (আমবা দিদিদের বাইমনা বলি) সঙ্গে ছিল ছেলে মেয়ে (জুগ্গু, টাইনী)। এদের আসল নাম জযদীপ সিং ও সংযুক্তা। একমাস তারা ছিল। প্রায়ই আমরা একটা না একটা পার্টিতে যেতাম। সেজে গুজে যেতাম, মন্দ লাগেনি।

দেখলাম ছোটদিদি লুকিয়ে সিগারেট টানেন, দু এক বাব ছোট গ্লাস ও দেখলাম - ওটা কী? জিজ্ঞাসা কবলে বলে ছিল খেয়ে দেখ। দেখলাম - কেমন কেমন লাগে। ঘ্রানটা ও চেনা চেনা মনে হল। দিদি বললেন খবরদার কাউকে বলবে না। আমার শ্বশুরবাড়ীতে ককটেল পার্টি হয় প্রত্যেকের জন্মদিনে, বাজপুত মেযেবা সবাই এসব খায। আমার মহারাজকুমার ছোটামার (দেওররা) ননদরা সকলে খায়। আমি খাই জানলে দুদুমানী রাগ করবে, ছোটমানীকেও বলবি না বুঝলি? (খুব ভালই বুঝলাম) দিদির সঙ্গে কিছু কিছু ভাব জমে উঠেছিল।

দাদা যুবরাজ এখন দাদা মহারাজ হয়েছেন। তিনি আমাদের কাপড় কেনার জন্য বেশ কিছু টাকা দিয়েছিলেন। পার্টিতে পড়াব শাড়ী আনতেন বাইমনা বড়। বাইমনা ছোট বললেন - তুই আমার শাড়ী পরনা . অনেকত আছে। বলেছিলাম তোমার চোলীসদরী আমার গাযে লাগবে কেন?

"দূব পাগল, ভেতরে ডোরা দিলেই হয।"

রাজপিপলা পার্টিতে আমবা যাব। ঝি বিজলী আমাদেব জন্য জোড়া মিলিয়ে শাড়ী গহনা রেখেছিল। ওসব পরে আযনায দেখেছিলাম, কেন জানি না- লজ্জা করছিল, ভালও লাগছিল। কিন্তু একটা শাল গায়ে রাখলাম, দিদি টান দিয়ে খুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলাম - আমার শীত লাগে। ফ্রেঞ্চ ব্রোকেটের কাপড পরলেও শীত লাগে না কি ! বুড়ীর মত টপ পরলে কেন, ইয়ারিং 'দুল' পর। মুসৌরীতে পিসীমার বেশভূষাও বদলে গিয়েছিল। সাদা থান পরা হতনা, আমাদের মতই কাপড় পরতে হয়েছিল। ইসেক্সসে ছিলেন। পার্টিতে প্রায় দেখা হতো, একদিন তিনি আমাকে আসতে বললেন। পিসীমার বয়স তখন মাত্র ত্রিশ কিন্তু আমরা তাঁকে কত বড মনে করতাম। আমি ইসেক্সসে গিয়েছিলাম। বললেন - তোর জনাই আমার মুসৌরী আসা ;

তোকে দিব্যি দিচ্ছি গ্লাস ছুঁয়োনা, সিগারেট টেনো না, তোমার মানী জানলে খুব দুঃখ পাবেন।

মানীর জন্য মনটা কেমন করল ; বললাম - না ছুঁব না। আমি ত ওসব গ্লাস ছুঁইনা। একদিন মাত্র খেয়ে দেখেছি।

ছোট বাইমনার সিগারেট দু একটা টান দিতাম। এটা সুদীর্ঘকাল ১/২ টা ছিল। প্রতিদিন ১টা সিগারেট আমার জন্য থাকে। এর বেশী এমন কোন অভ্যাস আমার নাই। মাঝে মাঝে পান খেতাম, তাও মধ্যে মধ্যে পড়ে থাকে টেবিলে রেকাবিতে।

মুসৌরীর রাণী মহারাণীরা খুবই নব্যা ছিলেন। তাঁরা ত্রিপুরার মাতা ঈশ্বরীদের মত ছিলেন না। আমাদের রুচি, সাজসজ্জা, কিছু আলাদা ছিল। মুসৌরীর রঙ্গমঞ্চে আমরা দর্শক ছিলাম। ষ্টিফুলের বেলকনিতে আমরা বসতাম, খেতাম, তামাসা দেখতাম, হৈ হল্লা শুনতাম। মহারাণীদের পরদা পার্টি হত, এর বিশেষত্ব হল- রূপের সম্মেলন ও ফ্যাশন। কোন পুরুষ পরদা পার্টিতে থাকতেন না।

মহারাণী রাজপিপলার ও মহারাণী মদালসার (নাহানের) সুন্দরী বলে নাম ছিল। রাজপিপলা আমাদের ভাউজের (ভাজ)পিসী। মুসৌরীতে বিয়ের কথা হয়ে ছিল দাদার, কিন্তু প্রথমে হল বলরাম পুরের রাজকন্যার সাথে। তাঁর মৃত্যুর পর হল পান্নার রাজকুমারীর সাথে। তিনিও তাঁর পিসীর মত সুন্দরী ছিলেন। আমাদের ওখানেও পর্দা পার্টি হয়। মহারাণীরা রাজকন্যারা আসেন। আমি দেখলাম কপুরথলার সুশীলা উর্ম্মিলা ইন্দিরা আমাদের সমবয়সী। ইন্দিরা একটু বড়, খুবই সুন্দর। কর্দিময় মহারাণী রামগড় কুন্দা বারোয়ারী কাসমণ্ডা, ভুজবলকে কমলা, মাধুরী, খৈরীর রাণী ভুবন, বুদ্ধি, সকলেই আসেন। পিসীমা অমিয়াকে সকলে দেখেন - লক্ষ্য করলাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে অনেকেই চায়। পিসীমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী ভাষা। সাজ, তাঁরা অত্যন্ত লক্ষ্য করেন দেখলাম। বিশেষ করে তার লাজুক ভাব। দেখছি, শুনছি, হাসছি, ওদের রাঙা ঠোঁট, চকচকে নেলপালিশ, চুলের বাহার, সেন্টের গন্ধ, সবটা মিলে, মাদকতা সৃষ্টি করে - মুসৌরীর আবহাওয়া মোহিত ছিল। ঝাঁসির রাণীকে আমার সুন্দর লাগত, তিনি নেপালের মোহন সমসুরের মেয়ে। কমলা, মাধুরী, দুবোন ওরা। খুব মিশুক ছিলেন, ওদের ব্যবহার সহজ সুন্দর ছিল। মুসৌরীতে দাদা মহারাজ গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকেন তাঁর স্টাফদের নিয়ে। প্রতিদিন আসেন আমাদের খোঁজ খবর নিতে, মানীদের প্রণাম করতে। এটা ত্রিপুরার প্রথা। সকালে বিকালে মাকে প্রণাম করতে হয়। দাদার সঙ্গে এসেছিল বিভোর। আমাকে দেখে বলল তোমার দেখি ভোল বদলে গেছে, চিনতেই পারছিনা। কোথায় মহারাস, কোথায় ডান্স, এও একটা লীলা, কি বল?

বলেছিলাম - তোমার শিক্ষয়িত্রী দিদি লীলার মত নয়, ছেড়ে এলে কী করে? আমিও কম আশ্চর্য্য হচ্ছিনা।

"বড় কুমারী সুইর্জাল্যাণ্ড যাবে, ছোটকুমারীও আসবে, দেখা করতে এলাম। তা তুমি কেমন আছ বল?

আমি তাকে একটা পরদা পার্টির কথা শুনিয়েছিলাম।

আমাদের সামনে মস্ত বড় একটা আয়না ছিল বুঝলে?

চরখারী মহারাণী, বাইমনা বড় ও আমাকে ঐ আয়নার সামনে বসালেন বুঝলে? পার্টিতে আমরা দুজন মাত্র ছিলাম। চা সেণ্ডুইচ কত কি এল। বাইমনা বললেন দেখ, পরদার আড়াল হতে কে যেন দেখছে, আয়নায় দেখ; পার্টিতে কাকেও ডাকেনি, তুই আর আমি ছাড়া কেউ নেই। এ কেমন পার্টি; এখানে বেশীক্ষন থাকব না। রাজকুমার জানলে রাগ করবেন। আমরা উঠে এসেছিলাম চা পান শেষ করেই।

" ও তোমাকে বিয়ে করবে বলেছে। নেপালজং তাই বলল। ওর পেটে মহারাজের দু একটা ঘুষি পড়েছে।"

স্থবিবা মুসৌরী রাজা রাণীদের অনেক কাহিনী বহন করে।

কুযাশায় আচ্ছন্ন হয়ে আমাব মনকে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন কবল।

এবপরও আমার লোকজন নিয়ে আমি তিনমাস ছিলাম, কিন্তু এত বেশী সুখ সহ্য হলনা। তখন আমার বয়স সাতাশ, পর্দার বালাই ছিলনা। পরিচিত রাণী মহারাণীরা এখন প্রৌঢ়া। কিন্তু চলন, বলন, বদলায় নি।

মুসৌরীতে মহারাজ মণ্ডেলেশ্বরের সাথে সন্ন্যাসীরা এসেছিলেন, ওখানে তাদের আশ্রম আছে। আমাকে তারা ভোজন জন্য নিয়ে গেলেন।

সর্ব্বানন্দজী বললেন - আপনাকে অত্যন্ত রোগা দেখাচ্ছে, অসুখ করেনিত?

হ্যাঁ, অসুখ আমার মনেব। আমি অতান্ত চিন্তাভাবনায় আছি, আমার দুঃখের শেষ নাই। " আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

না, না, আপনি ঝামেলায় পডবেন। আমার অবস্থা দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন " মহারাজকে বলব না কি? মা'র কথাও ভাবেন না?"

এই যে ছবি দেখছেন, একে বিয়ে করা ছাড়া গতি নাই। তাঁর পরিচয় বললাম। বললাম- অসামাজিক বিয়ে করছি। সাধু বললেন সবই ঈশ্বর ইচ্ছা, আপনি সুখী হলে দুর্ভাগোর কি আছে। বললাম না- এ'ত সে নয়। সাধুকে প্রতারণা করলাম। সর্ব্বানন্দজী বললেন মহাবাজ আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, আমি আপনার শুভেচ্ছুক। এটা সর্ব্বদা মনে রাখবেন। যখন যা সাহায্য প্রয়োজন হলে লিখবেন।

শিলং

শিলংয়ে আমরা প্রতিবছর আসতাম, সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করে নংপোতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতাম। নংপো থেকে পরিবর্ত্তন চোখে পড়ত। শিলংয়ের স্থানীয়দের চেহারা বেশভূষা, ভাষা, রুচি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের লোকদেব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মনিপুরী ত্রিপুরীদের মত কিছুটা দেখা যায় তারা খুবই ফর্সা মেয়েরা দেখতে সুন্দর। শিলং পরীর দেশ, পুরাণের বর্ণনা মত। সারা শিলং ফুলে ঢাকা ছিল বললে চলে। প্রত্যেকের বাড়ীরদ্বারে গেট মত করে গোলাপের ঝাড় থাকেই। ছোট ছোট সাদা গোলাপী লাল, খাসি মেয়েদের ফর্সা গালের মত সুন্দর ছিল।

হালকা নীল রংয়ের ফুলগুলো - কি নাম জানি না, যত্রতত্র সবুজ ঘাসের উপর বড় বড় পাতায় থোকা, থোকা ফুটে থাকে। সারা পাহাড়ের গায়ে বাটার কাপ 'হলুদ রংয়ের' ফুল ছেয়ে আছে। কত রকম নাম নাজানা ফুলে সেজে থাকে সারা শিলংয়ের পাহাড়গুলো। এখানে কাঠের ঘরেই সবাই থাকেন। চেরাপুঞ্জির - পুঞ্জিভূত মেঘবর্ষন, শিলংয়ের শীত, পাইন গাছের ঘনছায়া, নাসপাতি গাছ, ঝর্ণালেক, স্পেডিগিরিফলস, এলিফ্যান্টফলস নামে ঝর্ণা আছে, লেক আছে, বিস্তৃত গলফকোর্স, বড়াপানি। এ সবটা মিলে শিলংয়ের শোভা। ওয়েল মিশন নামে নার্সিংহোম বিশেষ একটা স্থান ; এটা ডাক্তার হিউজেব সেবার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অনেক স্থান নিয়ে হাসপাতালটা আছে। এমন পরিচ্ছন্ন সুন্দর যে - রোগীর অসুখ লাঘব হয় এব পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যে ও নার্সদের ব্যবহারে।

ওয়েল মিশন -আদর্শ নার্সিংহোম বললে সম্পূর্ণ বলা হবে না। আমিত বলি এ স্থান পবিত্র, শ্রীমণ্ডিত। মানস সরোবরের পদ্ম সত্যিকার রূপ পেয়েছিল ওয়েল মিশনে। এরি জন্য শিলংয়ের গীর্জেবি ঘন্টাধ্বনি আমাব কাছে বাঁশীর সুরের মত মধুর ছিল।

লরেটো কনভ্যান্ট, সেন্ট এডমাণ্ডস সেন্টপল ইত্যাদি নামে অনেক স্কুল কলেজ ছিল এখনো আছে। কিন্তু এখন আর সেই প্রাণ স্পর্শ নাই। গীর্জ্জার সেই সুরসঙ্গীত যা অত্যন্ত মিষ্ঠ মধুর ছিল তা আর মর্ম্ম স্পর্শ করে না।

প্রাকৃতিক রূপ অফুরন্ত ভাবে সর্বদাই আছে, আমিও আছি, সেই আমি - ঘোর পরিবর্ত্তনের মধ্যে দৃষ্টি হারিয়েছি, তখনকার চেনা আবহাওযা নাই বলে গীর্জ্জার ঘন্টা, মন্দিরের বাঁশী, শিলংয়ের সৌন্দর্য্য আর মুগ্ধ করে না। মায়া মমতা জড়িত আমাব লুন্ঠিত আনন্দ- অশ্রু বিসর্জ্জন করে। কি যেন হারালাম, যার জন্য ব্যাকুল মন বিলাপ করে।

আমার ছেলে মেযেরা শিলংযে পড়তো, বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে স্কুলের ছেলেমেয়েরা ইউনিফর্ম পরে পথ পরিক্রমা করতো। কি সুন্দব দেখাতো ওদের। আমার সুখ দুঃখের কত স্মৃতি বহন করে আজকের এই শিলং।

পরিচিত না হয়ে ও কত চোখেব মমতা দেখেছিলাম।

শিলংয়ে আবহাওযায় ছিল উদারতা।

শিলং রাজধানী। মেঘালয় নাম পেয়েছে রাজ্যটি। এখন শিলং আমাব মনে মেঘই সৃষ্টি করে। ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি কবাব জন্য আপার শিলংয়ে ৩/৪ মাস ছিলাম সাহারির বাড়ীতে। আমার ছেলে একটা বড় পাথরেব ঢিপিব উপর বসে শিব পূজা করত। মেয়েরা প্রতি শনিবাব বিকেলে আসত, রবিবার দিন বিকেলে তাঁদের আমি পৌঁছে দিতাম। এরপর ডাকাতির মত একটা ঘটনা আশেপাশে হওয়াতে কেঞ্চেস ট্রেসে, একটা বাড়ীতে তাড়াতাড়ি উঠে যেতে হল। সেখানেও আমার কোন অসুবিধা ছিল না। জন্মেজয় বর্ম্মন, রাজকুমারী ইরা বর্ম্মন, আমাদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁদের সৌজন্যে শিলংয়ে কোন কষ্ঠ আমাব ছিল না। নিজের মোটর, ড্রাইভার থাকায় প্রতিদিন ছেলেকে নিয়ে যেতাম স্কুলে সেই আপার শিলং ক্যানঞ্চাস ট্রেস হতে । নন্দী আমার মোটর চালাত। বংশীঠাকুর আমার সঙ্গে এসেছিলেন। সঙ্গে অনেক লোকজন ছিল। ঐজন্য একটু অসুবিধায় পড়তে হল। ব্রাদার ওমান এরপরবর্তী বছর ছেলেকে

ভর্ত্তী করে নিয়েছিলেন, ডে স্কলার করে রাখতে হল ৩/৪ মাস। ওদের নিয়ে আমি সুখেই ছিলাম। ছেলেমেয়ে লোকজনরাই আমার জীবন জুড়ে ছিল। প্রতি বছর শিলং আসতাম, ঝরঝর বর্ষণরাতে শিলংয়ের নংথুমাই আমার বুক জুড়ে বসে। ওখানে শেষবারের মত সকলে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমার বড় মেয়ে মেজো মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। দেবযানী জন্মগ্রহন করেছে শিলংয়ে, নাজরত নার্সিংহোম হতে বিমল ধৃতী মেয়ে নিয়ে এল, সেদিন বৃষ্টির পর রোদ উঠার মত - কত যে আনন্দের ছিল। নাসু সিং ওদের ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছিল। আমার মেজো মেয়ে স্মৃতিও এসেছিল যে। হৈমন্তিকা, মৃত্তিকা, যিষ্ণু সকলে একসঙ্গে ছিলাম। বিমলের সুব্যবস্থার জন্য থাকার কোন অসুবিধাই ছিল না। জান অনুপ? ঐ সময় শিলংয়ে কত ছবি এঁকে ছিলাম? 'আমার জানালা" নামে ছবি এঁকেছিলাম, নিশি শেষেও ঐ সময়ের ওয়েলকাম এঁকেছিল হৈমন্তিকা। একই শিলং মনের অবস্থায় বর্ণনা হচ্ছে। আমার হাসি-কান্নায় শিলংয়ের কথা লিখেছি, যা অত্যন্ত ব্যক্তিগত হয়ে পড়েছে।

তুমি শিলংয়ে বড়াপানি গলফকোর্স ঝর্ণা ফুল, দেখবে, লেক দেখবে কিন্তু যে আকাশে আমি এসব দেখেছি, তা তুমি দেখতে পাবে না।

বলতে পার- আকাশত সর্ব্বক্ষণ আছে, শিলংয়ের সবই আছে, এ সত্য। কিন্তু আকাশের রং বদলায় প্রতি মুহূর্তে। পরিবেশও বদলায়, অবস্থার সাথে সাথে বেশভূষা ও পূর্ব্বের মত থাকে না। পরিবর্তনের মধ্যে বর্ত্তমান রূপে দেখছ ; আমি কালের পদক্ষেপ দেখে চলেছি - দীর্ঘ জীবন ইতিহাস বহন করে। পূর্ব্বে আমরা শিলচর হয়ে আসতাম ট্রেনে, তারপর আমাদের মোটর সারি দিয়ে যেত শিলংয়ের পথে। এপথে একটা সবুজ লেক দেখতাম, ওটা বোধ হয় ঝর্ণা জলে পূর্ণ ; এ মানুষের সৃষ্টি নয়।

প্রথমে আমরা থেকেছি মণিপুর ভবনে, তা ছিল লেকের কাছে।

পরের বছর তিনটা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল (আব্দুল গফুরের)। এরপর ত্রিপুরা ক্যাসেল নির্ম্মান হল। ডর্মিলজ নামে ত্রিপুরার আর এক বাড়ী ছিল। আমি আমার লোকজন নিয়ে সেখানে থাকতাম। তা গলফ কোর্সের খুব কাছে ছিল। সবই মনে পড়ছে ছায়াছবির মত। সে অনেক কথা.....। এখন, আমরা স্কুল ছুটি শেষ হলে চোরাইবাড়ী হয়ে, বদরপুর হয়ে, শিলং আসি। থাকতাম শিলং ক্লাবে। শিলং পথে প্রাকৃতিক দৃশ্যে স্রষ্টার অঙ্গুলী খেলায় তাঁকেই অত্যন্ত কাছে পেতাম, আমাকে গানে পেয়ে বসত। বর্ত্তমানে আগের সেই শিলংয়ের চেহারা বদলে গেছে ; আগে দেখেছি বলে এর পরিবর্ত্তন বুঝছি। তখন শিলংয়ের বৃষ্টিতে কান্না অনুভব করিনি ; বেশ নিবিড় হয়ে ঘুম আসত।

এক একটা পরিস্থিতিতে মন সুখদুঃখ ভোগ করে। বিচার করে কী হল, কেন হল। ভ্রমন বৃত্তান্তে শুধুমাত্র স্থান ও প্রাকৃতিক শোভা রেখে লিখতে পারছিনা। পরিস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শিলংয়ের বর্ণনা লিখেছি। সেখানে এখনও পাহাড়ের গায়ে ফুল ফুটে বৃষ্টি পড়ে, রোদ উঠে ; সবই আছে, তবে কী হল? নন্দন কাননে কেন ঝড় উঠল? সেন্ট এডমাণ্ডস্ যাবার পথে যিশাস মূর্ত্তির দিকে যখন তাকাই মনটা লুটিয়ে পড়ে, হায় যিশাস্, হায় কৃষ্ণ! এমনি করে কি যুগে যুগে আস?

কলিকাতা

আমরা বছরে ২/৩ বার কলকাতায় যেতাম আখাউড়া স্টেশনে রেলপথে। রাত চারটায় চাঁদপুর পৌঁছতাম, সেখান থেকে জাহাজে করে পৌঁছতাম গোয়ালন্দে।

পদ্মানদীতে জাহাজ যাত্রা যে কি আনন্দের ছিল। সমুদ্রযাত্রা ও নদীর জাহাজে যাবার পার্থক্য অনেক। আমার জন্য অত্যন্ত আকর্ষনীয় ছিল পদ্মার জাহাজ। ঐ জাহাজে দিনের পর দিন থাকলেও বোধ হয় সাধ মিটত না, এমনি ছিল পদ্মানদীব জাহাজ। এ যেন জীবন্ত, ভরপুর আনন্দে ভেসে যেতাম ; তাই কলিকাতার কথা লিখতে গিয়ে পদ্মার জাহাজেব কথা লিখছি। জাহাজের কেবিন গুলোতে ধপধপে বিছানা, সাজানো গুছানো ডাইনিং হল, চওড়া ডক, গোল্ডেন টি ব্রেকফাস্ট, সুস্বাদু কারী রাইস ওসবত ছিলই, তার চেয়েও সুখের ছিল পদ্মার হাওয়ায় ভোরের স্পর্শ। জাহাজ ছাড়ত খুব ভোরে। যখন জাহাজের চুঙ্গি হতে শঙ্খ মত শব্দ উঠত, আনন্দে মন ভরে যেত। তরঙ্গ তুলে, আকাশ ছুয়া অথৈ জলে জাহাজ ভাসত। পদ্মার গা ঘেষে সূর্য উঠত যখন সে যে কি পুলক আনতো, বিষ্ময় আনন্দে দেখতাম, শুনতাম- মনের কত গান!

অবিরাম শব্দতুলে তরঙ্গে তরঙ্গে জাহাজ চলে....., দেখতে দেখতে রূপ বদলে যায়। যখন সন্ধ্যা নামে - বিদায়ের ম্লান হাসির মত দেখায়। এইত, এক্ষুনি নামতে হবে ; মন্থর গতিতে জাহাজ এগোয়, ভারি শেকল ফেলার শব্দে জানতাম নোঙ্গর ফেলা হয়েছে। এই এক্ষুনি জাহাজ থামবে, নামতে হবে। অপরিতৃপ্ত মন জাহাজটাকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিত। ঐত গান মনে পড়ছে, " না মিটিতে মনসাধ যেও না" এ যেন জীবন্ত, ক্ষনিকের বন্ধু। গোয়ালন্দে পৌঁছেই আবার জাহাজের দীর্ঘশব্দ উঠে; অত্যন্ত প্রিয় কাউকে যেন ফেলে যাচ্ছি বলে মনে হয়েছে। যতবার কলিকাতায় আসি এর জন্যই আসি, জানিনা এ কিসের এত মায়ামোহ।

আমরা বালিগঞ্জ বাড়ীতে পৌঁছতাম প্রায় রাত আটটায়। বালিগঞ্জের ড্রইংরুমটিতে ডালরোজ রংয়ের পর্দা ছিল-সার্টিনের ডোরা দেওয়া, ওতে গোল গোল মালামত রেশম সূতায় মোড়া ঝালর ছিল ; তা রেশম দড়ি দিয়ে পর্দা বাঁধা থাকে। পেতলের ঝকঝকে কারুকার্য্য করা হুকে। বিজলী আলোয় ঝলমল ছিল - শিলিংয়ে ঝুলানো সেন্ড্রেলিয়ার। লতাপাতা কাজ করা সোফাসেট টেবিল চেয়ার ছিল, দেয়ালে বড় সিনসিনারী ছবি, আয়না মত কি দিয়ে সাজান ছিল। টেবিলে ফুলদানী এসট্রে, কোথাও সুন্দর ঘড়ী টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি, বোধহয় কিউরিয়ো। কাঠের সিঁড়ি ছিল উপরে যাবার, তা জুট কার্পেটের। সবুজ পাতা লাল ফুল ছিল ওতে। কত যে ধুলা জমেছিল ওতে, খুবই পরিচিত ছিল যে তা।

রংচঙ্গে কাঁচ দিয়ে সিঁড়িতে আলো পড়ত দুপুরের দিকে। (জানালামত) ছেলেবেলায় ঐ রামধনু আলো মত রংগুলো আনন্দ দিতো আমাদের। লাফিয়ে লাফিয়ে নামতাম উঠতাম। ঐ আলোটা গায়ে লাগাতাম। জুট কার্পেটটা নাকি অনেক দিনের (পুরান) অনেকের পদধূলা স্মৃতি নিয়ে অনেক কাল ছিল। ঐ পুরান বাড়ীটার সামনে, রাস্তার আর একদিকে আর একটা বাড়ী ছিল, চীনা ভদ্রলোক নাকি থাকেন, এর সামনে ছিল মস্ত বড় শালগাছ বোধ হয়। ওটার তলায় বড়া

ভাজা বেগুনী ভাজা পেয়াজি বিক্রি হত খুব সকালে। গরম গরম ঐগুলো শালপাতায় মুড়িয়ে ঠোঙ্গায় আসত। বাড়ীর মেয়েরা আনাত। আমার ধাইমার কোলে বসে ওটা খাবার জন্য আমি আব্দার তুলতাম, প্রায়ই খেতাম, খুব ভাল লাগত, তা আজো ভুলিনি। আমাদের বাড়ীতে ওরকম বড়া হয়না, সে স্বাদটাই আলাদা। পার্থক্য বুঝতে পারছি। দুপুরে আসত কুলফিওযালা, হাঁক দিত। ওটা খাওযা মানা।

সকালে বিকালে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয। গঙ্গাপারে ঘোড়ার গাড়ী থাকে, মোটব থেকে নেমে ওটায় বসতাম মুখোমুখী হযে, 'হুডখোলা গাড়ী' চাব পাঁচজন বসা যায়। ঐ ঘোড়ার গাড়ীটাকে ভিক্টোরিয়া বলা হতো। বেশ মজাদার ছিল তা। সবুজ ছিল গড়ের মাঠ। শীতেব দিনে কুযাশা থাকতো। বড়দিনে প্রতিবছরই আমরা আসি, বিশেষভাবে সাজাত থাকত, এমনিতেও নিউমার্কেট সাজান থাকে, বড়দিনে চমকদার হয়। কলিকাতা শহরটি পরিস্কার পবিচ্ছন্ন ছিল : ট্রাম বাস রিক্সা, সবই ঝকঝকে ; রাস্তায় রাস্তায় বাতি ছিল ; এখনকার মত উজ্জ্বল ছিল না। তবু শ্রীহীন দেখাত না। দীনহীন চেহারা চোখে পড়েনি। বোধহয় আমার ঘোলাটে দৃষ্টিটাই বর্ত্তমানকে ঘোলাটে দেখছে ; কলিকাতার সেই সুন্দর চেহারা বোধহয় আর দেখতে পাব না।

কলিকাতাব নিউমার্কেট, তা বোম্বে দিল্লী সাবা ইউরোপ কোথাও দেখতেপেলাম না। এর জুড়ি নেই। উল্লেখযোগ্য ঐ নিউমার্কেট, এখনো যা টিকে আছে, ওটাকে আনন্দমেলা বলতে হয়। সেখানে ছোটবড সবাই যায়, শুধু কিনব বলে ওখানে যায় না। ও যে মিলনমেলা। কেউ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আইসক্রিম চা সেণ্ডুইচকেক খাচ্ছে। কেউ ছোট বাচ্চাকে ঠেলাগাড়িতে বসিযে বেডাচ্ছেন। ছোটবড সবাই ছিমছাম হয়ে ঐ মার্কেটে আসেন। হেন বস্তু নাই -যা পাওয়া যায় না। ফুল পাখী গহনা কাপড় থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় বস্তু ওতে আছে। এর লিষ্টি দিতে গেলে যে আর একটা বই লিখতে হয়। খেলনা, সবজী, মেওয়া, ফল, ফুল কি যে নাই এটাই ভাবি। চার্লির কেক, জোজফ, চেবী, এখনও আছে। পুস্তকেব দোকানও ছিল। এ একটা নন্দন কানন বলা যায় ; নিউমার্কেটটা সর্বজনের মিলন ক্ষেত্র। তকমাওয়ালা কুলীরা মাল বহন করে, কোথায় কোনদিকে কী পাওযা যায় বলে দেয়।

নিউমার্কেট আনন্দে ভরপুর ছিল, সেখানে একটা পরিবেশ দীর্ঘকাল থেকে আছে, তা আকর্ষনীয় বিশেষ স্থান।

জানা যায় ঐ কলিকাতা গড়ে উঠেছিল ইংরাজদের সময়ে। বলতে হচ্ছে "তোমরা জান শহর গড়তে, স্কুল হাসপাতাল বানাতে, ইণ্ডাষ্ট্রিজ গড়ে তুলে বেকার সমস্যা লাঘর করতে। চা বাগান করেছ নীল চাষ করেছ, আমদানী রপ্তানী করতে তোমরা জান।"

মোগল থেকে ভারত ছিনিয়ে নিয়েছিল ইংরাজ। সে, তখন থেকে গড়ে উঠেছিল কলিকাতা। চলল - রিক্সা, ট্রাম, বাস, মোটর, উড়ল এরোপ্লেন, ভাসল জাহাজ। বটানিক্যাল গার্ডেন, মিউজিয়াম হল, হল বন্দর, দেখলাম চিড়িয়াখানা, সিনেমা, হোটেল, কোনারক সূর্য্যমন্দির রক্ষার ব্যবস্থা হল , যা কিছু ঐতিহ্যময় সুন্দর, সবই রাখল। একটা নিয়ম শৃঙ্খলায় চলল সব। এ আমরা অস্বীকার করতে পারি ? (নারী শিক্ষা জন্য বেথুন কলেজ) ইউনিভার্সিটি হাইকোর্ট হল

পূর্ব্বে যাঁরা কলিকাতা দেখেছেন, এখন তারা ইডেন গার্ডেনের কী নাম দেবেন?

ইংরাজ শাসন শোষণ দুটাই জানত, তাঁরা টাকাও বস্তুমূল্য ঠিক রাখতে পেরেছিল। আমদানী রপ্তানীতে আয়ের পথ যেমন ছিল - সে পথ দিয়েই কণ্ঠ লংগোটি (টাই) প্যান্ট সার্ট, এমন অনেক কিছু এলং ভারতীয়দের বেশভূষা রুচি বদলে গেল, টিকি পৈতেও লোপ পেতে থাকল।

ইংরাজ তন্ত্র মন্ত্র ভালই জানত ; তারা তোপের মুখে সেলামী দিয়ে রাজাদের পদানত করে মুগ্ধ রেখেছিল।

তোপের মুখে সেলামী মানে - বুঝতে পারছ অনুপ? বর্ত্তমানে অনেকে আজ একথা জানেন না। রাজারাও অনেকে অজ্ঞ ছিলেন বোধ হয়। তোপের মুখে সেলামি মানে বুঝেন নাই। বুঝলেও কিছু করার সাধ্য নাই। আমার পিতা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য আর্টিষ্ট ছিলেন। বৈষয়িক জ্ঞান কম ছিল বোধ হয়। তিনি ইংরাজদের ডিনার টেবিলে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাননি। পুতুল রাজা হতে লজ্জা বোধ করেছিলেন। মন্ত্রী ছিলেন - ব্রজেন্দ্র কিশোর ছোট ভাই ; কি সব বলে নাকি সামাল দিলেন। রাজাদের কারুর সেলাম হয় ৪০/৫০/১০০, কারুর হয় ৫০/৬০। মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে মাতৃমন্ত্রে অনেকেই দীক্ষিত হলেন ভারত সন্তানরা। তাঁদের উপরও মন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল। এতে লবকুশ সৃষ্টি হয়ে গেল, এমনিই ছিল ইংরাজের তন্ত্রমন্ত্র। মহাত্মাজীর আপত্তি কারুর কানে গেল না, অনশনেও মন টলল না, মন্ত্রমোহে আচ্ছন্ন ছিল বলতে হবে। তখন দেশপ্রেমটেম থাকেনি, সিংহাসনটাই জ্বলজ্বল হল। লব-কুশ যুদ্ধে বাস্তুহারাদের কান্নাটাও গ্রাহ্য হল না। রাখাল, যদুমধু, চাঁদ মিঞা এদের সাধ্য হবে না ভারতের শান্তি ফিরিয়ে আনতে, এটা ইংরাজ ভালই জানে। নগন্য রাজারা মন্ত্রী হওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করে -কেউ মন্ত্রী কেউ এম.পি, রাজ প্রমুখ ইত্যাদি হলেন। কিন্তু পূর্ব্বের সেই রাজ্যশ্রী ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। এরজন্য বেচারা রাজাদের দোষ দেওয়া যায় না। বর্ত্তমান তন্ত্রে সবইত রাজা, সুলতান। মাথার উপর আর একটা মাথা আছে যে। বিয়েতে বরপক্ষ কনেপক্ষ বলত - বর ভারি না কনে ভারি? অনেকটা সে মত দল ভারি না মন্ত্রী ভারি?

ঐ রাখাল ছেলেটাকে আমরাইত মন্ত্রী করেছি। সে রাজ্য পরিচালনা করতে পারুক না পারুক, আমার পাড়ার ছেলেত? যা হয়েছে বিধান মতই হয়েছে। লব-কুশ রাজ্যে হাকিম বদলায়, হুকুম বদলায় না যে, এমনি হুকুম? স্বাক্ষরি হুকুম ওঁদের অনড। ইংরাজের তন্ত্রমন্ত্র বৃথা যায় না বুঝলে?

ওদের বাস্তববাদ, জ্ঞান বুদ্ধি, তারিফ করতে হয়। দেখ ওদের পোষাক, নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে - যুদ্ধে ধুতি চাদর পাঞ্জাবী পরে যুদ্ধ করা যায় না। আমাদের লুপ্ত বিদ্যা ওরাই দিয়ে গেছে। আজ আমাদের সৈন্যরা বাস্তবিকই যোদ্ধা হতে পেরেছে।

রাজারা কিন্তু সখ থাকলেও রাজা হতে পারলেন না। খদ্দর ধারী পতাকা ধারী, গেরুয়াধারী, হয়ে আছেন।

" তুমি কলিকাতার কথা লিখতে গিয়ে এসব কি লিখছ? মাথা ঠিক আছেত?
হায় পদ্মানদীর জাহাজ, হায় - কলিকাতার কথা বলে শেষ কর।"

আমি ইচ্ছা করে কিছু লিখি নাকি? পাগল মন প্রশ্ন তোলে যে। তখন সম্পদ যেত না কি ইংল্যাণ্ডে এখন যায় কোথায়?

" যেখানেই যাক্, তুমি ত কিছু করতে পারবে না?"

লিখতেও পারব না নাকি? এত দেশ বিদেশ ঘুরলাম,যা জানলাম তাও লিখব না?

"তোমার সব কটি বইত বাতিল হল। এটাও ছাপাবেনা কেউ।

তোমার মত পথের যাত্রী ত নয় কেউ, তোমাকে ত ঘাটের যাত্রীও বলা যায়। আরে' তুমি দেখছি নাস্তিক, "ন হন্যতে হন্যমান শরীরে" মান না দেখছি।

"আমাকে নাস্তিক বলছ? তুমি দেখছি বোকা। যথা সময়েই আসেন ভগবান, আমাদের মধ্যেই প্রকট হন। এঁরই প্রতীক্ষায় তুমি আছ, এঁরই প্রতীক্ষায় থাক। দেখ না কি হতে কি হয়।"

একটি ছবির কাহিনী

ইংল্যাণ্ডে আর্ট গ্যালারিতে রক্ষিত একটি ছবি তা বলবার মত বিষয় বলে মনে হল। তাই লিখছি। দেখলাম টেবিলের দুধারে দুজন ব্যক্তি, বৃদ্ধ ও যুবক। গভীর রাত। তাদের মাঝে একটি মোমদানে আলো রক্ষিত, ঐ আলোতে তাঁদের পরিস্ফুট করা হয়েছে। বৃদ্ধ টেবিলে ঝুঁকে মুখ তুলে কি যেন বলছেন 'মনযোগ দিলে তা যেন শোনা যাবে।' বার্দ্ধক্যের রেখাবলী ও চোখের দৃষ্টিতে অভিজ্ঞতার সুনিশ্চিত ভাব দেখা যায়। জ্ঞানী, চিন্তাশীল ব্যক্তি ব'লে তাঁকে মনে হয়।

যুবক দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শুনছেন। তার চোখে মুখে একটা সম্ভাবনার আভাস দেখা যাচ্ছে। বাহুর পেসিতে, ঠোটে, তাঁর অবয়বে অচঞ্চল দৃঢ়তা সুস্পষ্ট। অন্ধকার ঘরের আসবাব, স্ব'ভাবিক ভাবে। কছু কিছু দেখা যায়, যা পুরো ছবিটাকে জীবন্ত করে রেখেছে। মনে হলো উক্ত ছবি অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতীক হয়ে রূপ নিয়ে আছে একটা বর্ত্তিকায়। বৃদ্ধের নিশ্চয় স্থিরতা ও যুবকের দৃঢ়তা প্রকাশ করে যে, আলোটা উজ্জ্বল হয়ে আছে ভাবা যায় তা এক আদর্শের আলোতে আলোকিত। আগামী দিনের সম্ভাবনার আলো, যা আমরা চাই। জ্ঞানের নির্দ্দেশ শক্তির দৃঢ়তায় এমনি একটি আলো আমরা চাই যা জীবন প্রশ্নের মীমাংসা করে মানুষকে চাওয়া পাওয়ার অধিকার দেবে।

ছবি দেখার আনন্দ সার্থক হবে মনে করে বর্ণনার দ্বারা পরিবেশন করেছি যদিও অঙ্কন কার্য্য দেখানো গেল না। কিন্তু ভাব ধারণার মধ্যে আলোকপাত হওয়াতে, তাই লিখে গেলাম। অনেক ছবি দেখার পর যে ছবির কথা উল্লেখ করা হলো তাতে মনোযোগ দেবার বিষয় ছিল। কবিতার মত ছবিও মানুষের চিন্তাধারা বহন করে রূপ নেয়, ভাব প্রকাশ করে নীরবে। সেই নীরবতার মধ্যে অনেক বিষয় বস্তু প্রকাশ থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস'দি মন অনুভব করে মনেই প্রতিফলিত হয়, মন দিয়েই আমরা সবকিছু গ্রহন করি। সেই মনই আবার চোখে মুখে ভাব ভঙ্গিমা হয়ে প্রকাশ পায় সর্ব্ব অবয়বে। (তা ছবিতে

প্রকাশ পায়)
ছবির বিষয় বর্ণনায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি, তা অনেকের মনে রূপ নিতে পারে।
আরো বিশদ ভাবে লিখলে এটাও লিখতে হয় - শিল্পী গভীর রাতের নিরিবিলিতে একটা বাতি জ্বেলে দিলেন, দেখা গেল, ভাবা গেল অনেক কিছু....... উক্ত ছবিটি অঙ্কিত হয়েছে ইয়েলো অরচার, সাদা মিশ্রণে, কালচে ব্রাউন, বার্ণ সায়না, এই তিন রংয়ে।
যেমন গভীর ছিল ; তেমনি ছিল আলো ; সে দেশের খ্যাত শিল্পীদের অঙ্কনের মধ্যে ওদের বুদ্ধিমত্তার আভাস পাওয়া যায় ; একটুও আড়ষ্টতা কোন ছবিতে নেই। এলোমেলো কাপড়ের ভাঁজগুলো এমনভাবে পড়ে তা বর্ণনাতীত; এখানেই লেখা স্থগিত করতে হয়।

ডেনমার্ক

আমি একসময় ইউরোপ ভ্রমনে গিয়েছিলাম। দেখলাম লিটিল সার্মিট মূর্ত্তিটি। তা সমুদ্র পারে একটা উঁচু সাধারণ পাথরের ঢিপির উপর পাথরের মূর্ত্তিটা বসে আছে। সামনে তার অপার সমুদ্র, স্থান বড় নির্জ্জন। একফোঁটা চোখের জলমত নিঃসঙ্গ করুণ মূর্ত্তি। অতল জলের ব্যথিত কাহিনী নিয়ে যেন মৌন।
লিটিল সার্মিটের বসার ভঙ্গিতে এমন একটা অভিব্যক্তি আছে যা নীরব কান্নার প্রতিমূর্ত্তি বলে মনে হয়। ঐ জ্বলন্ত আকাশ, ঐ সমুদ্রকে বেদনাময় করে তুলেছে ঐ মূর্ত্তিটি।
মনে পড়ল গল্পটা, ধৃতি বলেছিল।
" মনিমাণিক্যের আলোতে আলোকিত স্বপ্নসুন্দর রাজ্যের রাজকন্যা লিটিল মার্মিট" যখন ভেসে উঠল - পৃথিবীর উত্তাপ, কঠিন বাস্তব স্পর্শ, তাকে প্রস্তরময়ী করেছিল কি?
যিনি ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মান করেছেন, সেই ভাস্কর শিল্পীর মমতা স্পর্শ ঐ মূর্ত্তিটিকে জড়িয়ে আছে যেন।
আমার মনে পড়ে পুরাণে বর্ণিতা অহল্যার কথা। অভিশপ্তা হয়েছিলেন ; দীর্ঘকাল পাষাণে পরিণত ছিলেন। গৌতম আশ্রম উজাড় হয়ে গিয়েছিল তাপে দগ্ধ শরীর, দীর্ণ ভূমিতে প্রার্থনায় স্থির মূর্ত্তিতে ছিল কি?
মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা " কি স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি" ঐ একটি লাইন, মার্মিটের ভাব অসহায় রূপটিকে স্নেহস্পর্শ দিয়ে আঁচলে মুছে দিতে হয়েছে তার নীরব চোখের জল। মনে হয়েছে, মনের নিভৃতে বসে আছে।
পরিত্যক্তা অহল্যার কাহিনী যা রামায়ণে আছে; সে নারীর অন্তর ব্যথা ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করে এই কঠিনা পৃথিবীকে সিক্ত করেছে। সিক্ত করেছে বিশ্ব কবিকে। তাঁর দরদিমন ধরিত্রির মাতৃস্নেহে, অভিশপ্তার হৃদয় ক্রন্দন কবিতা ছন্দে স্পন্দিত করে - মা'র স্নেহস্পর্শে জাগরণ দিতেছে মনে হল।
ডেনমার্কের মূর্ত্তির দিকে চেয়ে আমার মন আবৃত্তি করেছিল-

কি স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি
অহল্যা পাষাণ রূপে ধরা তলে মিশি।

এও অহল্যা, অন্তর হতে তাকে নাড়ান যায় না। সুদীর্ঘকাল এমনি ভাবে বসে আছে। সারা ইউরোপে এ একটা মুক্তা বিন্দু যেন।

যা দেখলাম যা বুঝলাম

সেবারে লণ্ডনের আর্ট গ্যালারিতে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। সেবারে বহুচিত্র দেখলাম, ঈশ্বর বিষয সিলিংয়ে এঁকেছেন মাইকেল এ্যাঞ্জেলো। ঈশ্বর ও মানুষ হাত বাড়িয়ে আছেন- উভয়ে উভয়ের দিকে। মানুষ ও ঈশ্বরের দূরত্ব খুবই কম। ঈশ্বরকে পিতা ভাবে ভাবিত করেছেন (পিতা জন্ম দাতা, সৃষ্টির কারণ)।

আমরা ভারতীয়দের মতে চির নবীন কিশোর। সমগ্র জগৎটাই ঈশ্বরের অঙ্গীভূত করে কৃষ্ণরূপে নীলাকাশ রাখা হয়। ঈশ্বর হতে কোন কিছু ভিন্ন নয়, ঈশ্বরই জগৎ ধারক, কারক, এই মতবাদ স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে আছে। ছবিতে দেখলাম - মত পার্থক্য একটু থাকলেও প্রকাশ তারতম্যে তেমন পার্থক্য নেই।

আর একটি ছবি, কে এঁকেছেন মনে নেই। তা ছিল বনের আলিঙ্গনে, চাঁদের আলোয় সুপ্ত একটি মেয়ে এলিয়ে আছে। নির্জ্জন, কেউ কোথাও নেই, গভীর ঘুমে মগ্ন স্নিগ্ধ আলো ঠোঁটে মুখে পড়েছে। হাওয়ার রূপ নাই, এর স্পর্শ দেখা যাচ্ছে এলোচুলে। নির্জ্জন চন্দ্রিমা রাতে নীলবসনা শুয়ে আছে- মাটির বুকে নীলচাঁদ যেন। এক একটা করে দেখলাম অনেক ছবি। আবার আর একদিন একটা বিরাট ছবির সামনে এসে দাঁড়ালাম। তা ছিল দীর্ঘে প্রায় ছয়ফুট, চওড়ায় পাঁচফুটের কম হবে না অনেক খানি জায়গা জুড়ে ছিল ঐ ছবিটা। হিসেবি মন তা মাপ ঝোক করে দেখল। বুঝল এ ছবি একদিনে আঁকা হয়নি। দিনের পর দিন যন্ত্রনায় উৎপীড়িত ক্ষুব্ধ শিল্পী এই চিত্রে আলোকপাত করে যা প্রকাশ করেছেন, তা বেশ কিছুক্ষণ দেখছিলাম ; দেখতে দেখতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি দর্শক।

ঐ ছবিতে সসস্ত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে শত শত দুর্গত মানুষের লাঞ্ছনা বিদ্রোহ, আঁকা হয়েছিল। ওতে অর্দ্ধ উলঙ্গ শিশু ও নারীর চিৎকার, ক্রন্দন, অসহায় বৃদ্ধের অভিশাপ, যুবকের ভ্রুকুটি, ক্ষমতা দম্ভে মানুষের প্রতি নির্দয়তা, বেত্রাঘাত, রথচক্রের ঘর্ষণ ও দুরন্ত অশ্বের হ্রেষা, অবাধ্যতা, উন্মত্ত শক্তি তুমুল হয়ে উঠেছে। আমি যে কখন ঐ ক্ষুব্ধ জনতার ভীড়ে পড়ে গেলাম, ইচ্ছে হল ঘোড়াটার লাগাম ধরে ঝটকা দিতে। বলতে চাইলাম -না, এ হবে না। নিরস্ত্রের প্রতি অস্ত্রাঘাত এ অন্যায়, অন্যায়। ঝড় আমার উপর দিয়ে গেল যেন। কখন যে চিত্রের সামিল হয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি। সর্ব্বহারাদের হাহাকার ও ক্ষমতা গর্জ্জনের মধ্যে আমি শিল্পীকে খুঁজছি....., ছেলে মেয়ে বলল - চল যাবে না? এই একটা ছবিতেই চেয়ে থাকবে? ঐ দিকে আরো কত আছে।

শিল্পী কেবল বিশেষ বিশেষ মূহুর্তই রক্ষা করেন না, রাষ্ট্র ইতিহাস ও তাঁরা বহন করেন দেখলাম। ওরা স্বাধীন, বাস্তবিকই ওরা বীর, রাজরোষ, দারিদ্রতা ভয় করে না। সিদ্ধহস্ত ওরা কি চমৎকার আঁকতে পারেন। এঁদের চিত্রে চোখে মুখে মনোভাব আগ্রহ, ব্যস্ততা, চিন্তান্বিত চেহারা, হাসিকান্না প্রকাশ - বুদ্ধিমত্তার সহিত অঙ্কিত হয় দেখলাম। পিকাসোর আঁকা চিত্রে রংয়ের খেলা উঁচু হয়ে এগিয়ে আসে, এমন চিত্র এঁকেছেন - মনে ভাব জাগায়। জীবনময়, নাড়ি ভূঁড়ি নয়, তবু চেয়ে থাকতে হয় কেন? বুদ্ধিমত্তার সহিত রংয়ে পোচ দিয়ে মনকে টানে, কখনো দুটো সরু পাতামত, কোনটা অদ্ভুত গাছমত দেখায়। রংয়ের বৈচিত্র্যে মনমুগ্ধ হয়। বুদ্ধিমত্তা দেখে নমস্কার করতে হয়।

ছবি ও সঙ্গীত সার্বজনীন

এক একটা বিষয় ও কাহিনী বহু ভাষায় বর্ণনা হয়ে শত শত পৃষ্টায় থাকে, কিন্তু শব্দ ও বহু ভাষা চিত্রে থাকে না।
একটা বোর্ডে আঁকা হয়ে ভাব ও বিষয় চিত্রে প্রকাশ পায়, ভাষার ব্যবধান সেখানে নাই। স্বভাবতই জনদৃষ্টি চিত্রে আকৃষ্ট হয়, দর্শকরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঘনিষ্টভাবে অঙ্কিত বিষয় গ্রহন করেন। অঙ্কনে থাকে সকলের পরিচিত হাসি-কান্না, জল মাটি আকাশ প্রাকৃতিক বিষয় সমূহ দৃশ্যাদি, অন্তরঙ্গ হয়ে চেতনাকে স্পর্শ করে বলে বুঝতে কারোর ভুল হয় না। চিত্রে শিল্পীর অন্তরের আলোড়ন থাকে। ঐ যে লিখেছি - নীলবসনা নির্জনরাতে স্বপ্নাবেশে শুয়ে আছে? অনুভব জাগাচ্ছে এ শিল্পীর একান্ত অন্তরের মানুষ, প্রিয়তমা, তা বুঝতে ভাষায় প্রয়োজন হয়নি। এঁকেছেন ইংরাজ শিল্পী।
ছবি যেমন অনেক কিছু ভাবায়। এক একটা গান ও সুরে ছন্দে শ্রোতার মনে ভাব জাগায়। এক একটা বিশেষ শব্দ প্রয়োগ বিশেষভাবে অনুভব দেয় বলে সঙ্গীতে মানুষ ভাবাপন্ন হয়। তুলিতে রং তুলে দেয়।
রেকর্ডে একটা গান শুনেছিলাম, দীর্ঘদিন পর মনে আসছে
কাজল নদীজলে, ঢেউ ভরা ছলছলে
প্রদীপ ভাসাও কারে স্মরিয়া।
সোনার বরণী মেয়ে, বল কার পথ চেয়ে,
আঁখি দুটি উঠে জলে ভরিয়া।
সাঁঝের আকাশে এত রং কে গো ছড়াল
মনের বীনার তারে সুর কেগো ঝরাল,
কারে মালা দেবে বলে অঝোরে বকুল পড়ে ঝরিয়া।
আঁখি দুটি উঠে জলে ভরিয়া।।
মনের ভ্রমর বুঝি গুঞ্জরে অনুক্ষণ,

স্মৃতির কমলটিরে ঘিরে,
যে পাখী হারায় নীড় সুদূর আকাশে
সে কি কভু আসে ফিরে!
শিউলী ঝরানো আজি সন্ধ্যার বাতাসে,
কে গো সাড়া দিয়ে যায় স্বপ্নের আভাসে,
কার লাগি দুলে উঠে ক্ষনে ক্ষনে থরথর এহিয়া,
আঁখি দুটি উঠে জলে ভরিয়া।।

এগানটিতে সুদীর্ঘ একটা বিচ্ছেদ কাহিনী রূপ পেয়ে সঙ্গীতে উদ্ভাসিত হয়েছে। যা এক শত পৃষ্টায় একটা মেয়ের দুঃখময় জীবনকাহিনী পুস্তকাকারে বিন্যাস হতো, সঙ্গীতে তা একটা পাতায় সম্পূর্ণ হয়েছে।

কাজল কালো নদী বলে কবি অনুভব করেছেন - সোনার বরনীর কাজল কালো চোখ, ভরা নদী মত ছল ছল ছিল। তার অন্তর ব্যথা সাঁঝের আকাশকে গাঢ করে তুলেছে। কবি বলছেন - মনের বীনায় সুর ঝবাল, " অঝোর ধারায় যেমন বকুল পড়ে ঝরিয়া"। এককথায় ভালবাসাময় সুরভীতে কান্নাই ঝরালেন নাকি? মনের ভ্রমর গুঞ্জন তুলেছে ' স্মৃতির কমলটিকে ঘিরে' সৌবভময় স্মৃতি যে সুখের ছিল, প্রস্ফুটিত কমলের মত - সুন্দর, সুবাসিত, আনন্দে ভরপুব ছিল। অবিস্মরণীয় দিনগুলো তাই ভ্রমরের মত গুনগুন করে -সঙ্গীত রচনা করায়। কাব্যে, সঙ্গীতে যা সুর তুলে জনমনকে পরশ দেয় একটা গানে, কবিতায। তা শত কথায় মধু বিন্দুটি তেমন মিষ্টি হয় না। দীর্ঘগল্পে সুবটা হারায়। কবি ঐ গানে, সঙ্গোপনে চোখের জলে মুক্তা গেঁথেছেন, যা শিশিরমত ছলছল। ঝরা ফুলটিকে সিক্ত করেছে। বলছেন - শিউলি ঝরানো সন্ধ্যা বাতাসে ; শরৎকালের কথাই মনে জাগায়। বালক বালিকার ফুল কুড়ানো দিনগুলো যখন দিনান্তে চোখের জল ঝরায- অঝোর হয়েই ঝরে।

" যে পাখী হারায় নীড় সুদূর আকাশে, সে কি কভু আসে ফিরে!"

ফিরে আসে না বলেই এতো চোখের জল।

সোনার বরণী মেয়েটি যে কবির স্বর্ণময়ী সীতা, অশ্রুপূর্ণা।

তার হাতের প্রদীপটিই তাকে সোনার বরণ করে তুলেছে। মনে হল একজন কিশোরী সঙ্গীতে পরিণত হয়ে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নিয়ে মূর্ত্ত হয়ে যেন চিত্র পটে আঁকা ছবি। হাতে তার প্রদীপ, সে মৃত্যু বিশ্বাস করতে চায় না। আছে আছে, বলে প্রদীপ ভাসায় সূর্য্য ডুবে গেলে। "নহন্যতে হন্যমান শরীরে" এমন বিশ্বাসে কত শত প্রদীপ ভেসে গেছে অন্ধকারে।

শিল্পী ও কবিদের গানে, অঙ্কনে. সোনার বরণীকে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ ভাবে। বজ্রাহত বনস্পতিকেও আমি দেখেছি। স্মরণীয়া বলেই সোনার বরণী নয় কি?

গানে, কবিতায়, অঙ্কনে যারা ঝর্ণা ঝরান, যাঁরা সকলকে এক স্পন্দনে স্পন্দিত করতে পেরেছেন, তাঁরা যুগান্তর ঘটান ; তাঁরা নমস্য। তাঁরা অত্যন্ত কাছের মানুষ, তাঁরা প্রেরণা দিয়ে মানুষকে অগ্রসর করেছেন, স্বাধীনতা এনেছেন। আমাদের অন্তর, গতি যে অভিন্ন। সঙ্গীত যখন বিশেষত্ব নিয়ে প্রকাশ পায়, কিছুক্ষণ হলেও বিশ্রাম দেয়। শিল্প কার্য্যাদিও সকলের জীবন

ধারণে সাহায্যই করে।

দেখলে অনুপ ? একটা গান - কোথা হতে কোথায় নিয়ে এল। জান ? কাজের মধ্যেও মানুষ গান গায়। একে সঙ্গীতসঙ্গ ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি ? শ্রান্ত পরিশ্রান্তরা গানে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে কাজ করে। কোন কোন শিল্পীরাও গেয়ে গেয়ে আঁকেন।

ফ্লোরেন্স

ফ্লোরেন্সে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর নির্ম্মিত মা'র মূর্তি রক্ষিত আছে। সেখানে যদি যাও, দেখবে - করুণায় বিগলিত মা'র করুণ মূর্ত্তি। কঠিন পাথরে শিল্পী কেমন কোমল সরল করে তুলেছেন মা'র রূপ। আর দেখবে - তুলতুলে শিশুগুলো মসৃণ পেলবে শুভ্র সুন্দর, মনে স্নেহ সঞ্চার করে।

আমরা বহুকাল হতে শুনে এসেছি - বীরভোগ্যা পৃথিবী।

(অস্ত্রে শস্ত্রে, লোক লস্কর নিয়ে - ভূমি অধিকার করা হয়) সেখানে দেখতে পেয়েছি একজন শিল্পী শত শত মানুষের মন জয় করেছেন কোমল তুলিতে ও পাথরে রূপ দিয়ে।

শুনেছি -ফ্লোরেন্সে স্থানীয়দের চেয়ে দর্শক ফরেনাররা সংখ্যায় অধিক। সে দেশে শিল্পীদের অক্ষয় কীর্ত্তি বহুস্থানে, বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখা হয়েছে। দেশের সম্পদ স্বরূপ তাঁদের দান সেখানে অনেককে বাঁচতে সাহায্য করেছে। ডেভিড পার্ক দেখতে আমরা গিয়েছিলাম, তার, সমুদ্র চরে রাখা হয়েছে ডেভিডের মূর্ত্তি। তা দেখতে দর্শকরা যায়। সেখানে আইসক্রীম পানিয় ইত্যাদি সহ মেলা সাজিয়ে রেখেছে যারা তাদের বেশ উপার্জ্জন হয়।

আদিম যুগ হতে শিল্প সঙ্গীত প্রবাহ যখন থেকে জনজীবনে এল, সেই তখন থেকেই শিল্পের সাথে বিজ্ঞান আছে। শিল্পীরাই এসরাজ, বেহালা, বীণায়, বাঁশীতে, সুর তুলেছে। তবল মৃদঙ্গ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন।

সুর যখন সঙ্গীতে পরিণত হল, অঙ্কন দ্বারা যখন মানুষ ভাষা পেল, বিজ্ঞানের সূচনা তখন থেকে হয়েছে বললে ভুল হবে না বোধ হয়।

দর্শনজ্ঞানই শিল্পের জনক, বিজ্ঞানের ভূমিকা। বিজ্ঞান ও শিল্প, এক চেহারায় প্রকাশ না পেলেও বৈমাত্রেয় মত সাদৃশ্য নিয়ে পাশাপাশিই আছে।

জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শন

আত্মবাদি অনাত্মবাদী জীবমাত্রই মৃত্যু বিচ্ছেদ মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিজ্ঞানের চেষ্টা চলে, আত্মবাদীর দর্শন জ্ঞান ঐ রূপ চেষ্টা করে না। প্রাকৃতিক লীলাভূমিতে দার্শনিকরা অঙ্গিভূত হন, বিশ্বসাথে অঙ্গাঅঙ্গি হয়ে চৈতন্যময় সত্তায় সর্ব্বময় অদ্বিতীয় ঈশ্বরে

সমর্পিত হন। তারা অশ্রুবিসর্জন করেন বিচ্ছেদে ভালবাসার জন্য। কিন্তু সান্ত্বনা তাঁদের আছে। বিজ্ঞানীরা সান্ত্বনা পান না কেন? প্রশ্ন নিয়ে সন্ধান করেন - মৃত্যুর কারণ।

আমরা সবাই জানি - শিশু যৌবনে পদার্পণ করে স্থাবিরত্ব প্রাপ্ত হয়। সুনিশ্চিত মৃত্যু অবসান ও জন্ম জীবন, বিস্ময় সৃষ্টি করে বলেই প্রশ্ন উঠে এ কি! কেন? প্রশ্ন দ্বারা সন্ধান হয় (এটা বিজ্ঞানের প্রশ্ন)

মনীষীরা পুরাণ গ্রন্থাদির বিষয় 'আত্মবাদ' যুক্তিতে বিশ্বাসী। শরীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলে মৃত্তিকায় মিশে বলে ইহাকে মৃত্যু বলা হয়। জন্ম মৃত্যু কারুর ইচ্ছাধীন নয়। 'আমি' চেতনা, দেহান্তে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায় (বাসনা রহিত হলে)। 'আমি', এই স্বজ্ঞান, বিশ্বঅঙ্গে উৎপন্ন হযে ওতেই মিশে, ওতেই পূর্ণজন্ম হয়। উক্ত কারণে -'আমি' অমর।

ওতে মানে-ব্রহ্মাণ্ডে, ব্রহ্মাণ্ড (বিশ্ব) ধারকব্রহ্ম(ঈশ্বর), সর্ব্বশক্তিমান। আমি ব্রহ্মের প্রকাশ,ব্রহ্ম ইচ্ছাই সব কিছু ঘটায়। আমি, আমার চৈতনাময় সত্ত্বা অস্তিত্ব প্রার্থনা সিদ্ধ করে নিশ্চয়। প্রার্থনাতে আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ থাকে। নিজ নিজ চিত্ত বৃত্তিদ্বারা আমরা প্রার্থনা করি কিন্তু সকলের সব প্রার্থনা পূরণ হয় না ; এর কারণ - যোগযুক্ত হতে জানি না, জানলেও মন বিভ্রান্তি ঘটায়।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা -অন্তর মম বিকশিত কর অন্তর তর হে।

আর একটি - " সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিগো জীবননাথ"

সঙ্গীতে, চিত্রে, কবি শিল্পীদের বিভোরতাই উৎসের সন্ধান দেয়। অনুপ, কেউ যেন বলছেন - আমি ছাড়া কেউ না কিছু না। আমিই প্রশ্ন তুলে মীমাংসা করি। আমি সুপ্তসিন্ধু, সৃষ্টিতে মগ্ন। ঢেউয়ের পর ঢেউ, সাগরে বিলীন হয় ; তেমনি শতরূপে আমি লীলাময়। বিশ্বরূপে আমার স্পন্দই সর্বক্ষণ আছে। আমি চিন্তামনি ; বিজ্ঞানে শিল্পে, আমি বিভোর।

ঐ মৃর্ত শরীর, শব আমার , আমিই জন্ম-মৃত্যুর কারণ। আমি সর্ব্বেসর্ব্বা।

মৃত্যু এক একটা কাহিনীর সমাপ্তিমাত্র।

বিশ্ব রচয়িতা শিল্পীই সাহিত্যের উৎস, এ থেকেই শিল্পীরা অনুপ্রেরণা পান ; বিজ্ঞানীরা সন্ধান করেন জন্ম-মৃত্যুর কারণ। শিল্প ও বিজ্ঞান সন্ধি বিচ্ছেদে পাশাপাশিই চলেছে।

সন্ধি বিচ্ছেদ

দর্শন, শ্রবন, মনন, (চিন্তা) এই তিন ক্রিয়াতে জ্ঞান সঞ্চার হওয়ার পর যা দেখেছি, শুনেছি, বুঝেছি, তাই প্রশ্ন এনে বিজ্ঞানীদের পরিচালনা করে জ্ঞানের প্রতিক্রিয়াতে। তাঁরা অনেক কিছু সৃষ্টি করেন, পরীক্ষা নীরিক্ষা দ্বারা, যেমন- চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, সম্বন্ধ বিজ্ঞান, যান্ত্রিক বিজ্ঞান ও মনো বিজ্ঞান আছে। তেমনি শিল্পেও আছে যথা- ভাস্কর শিল্প, কারুশিল্প, চিত্র শিল্প, মৃত শিল্প, বাদ্য যন্ত্রাদি ও সুর সঙ্গীত আছে।

জানার আগ্রহে বিজ্ঞানীদের সন্ধান চলতে থাকে, শিল্পীরা অনেক সময় বিভোর হয়ে যান। বিজ্ঞানীরা বহির্মুখী, শিল্পীরা অন্তরমুখী, এভাবে শিল্প ওবিজ্ঞান সন্ধিবিচ্ছেদ হয়ে চলেছে। উভয়ের মধ্যেই আবেগ আছে এবং তা সব কিছুতে দেখা যায়।

জীবন গতিতে, প্রপাতে উদ্ভিদে বিশেষভাবে দেখা যায়। মানুষের অন্তরবেগ চলনে, বলনে

কাজকর্মে প্রকাশ পায়। যে শক্তিতে বীজ মাটি ফুরে অঙ্কুরিত হয়ে গাছ পরিণত হয়, সে শক্তিই শিশুকে যৌবনে পরিণত করে - ধাবিত করায়। ঐ শক্তিই শিল্পী ও বিজ্ঞানীকে পরিচালনা করে। শিল্পীর অন্তরস্রোতে- সাহিত্যে, সঙ্গীতে, বিবিধ কার্য্যে অঙ্কনে, যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি বিজ্ঞানীকে গ্রহ উপগ্রহে যেতে সক্ষম করে। আবেগই সৃষ্টির কারণ, এর মূল উৎস বিজ্ঞানে ব্যক্ত হয়নি। 'সুখ দুঃখাদি কারণ হতে উৎপন্ন' এ হল বিজ্ঞানের মত। বিজ্ঞানের প্রশ্ন অনবরত হয়ে চলেছে। তারপর ? তারপর ? বলে চলেছে। শিল্পীরা রঙেরসে জীবনের সুখদুঃখ উল্লাস, আনন্দের এক একটা মুহূর্ত, ছন্দে, গানে ভাস্কর কার্য্যাদিতে প্রকাশ করেন, স্বভাবতঃই বিশ্বরূপ দেখেন। বস্তু ছাড়িয়ে অন্তরে প্রবিষ্ট হন, যেমন - আনন্দ ও উল্লাস, এ দুটো শব্দ মনের অবস্থায় প্রয়োগ হয়। আকারে প্রকারে ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়।

'উল্লাসে আস্ফালন থাকে, আনন্দে থাকে প্রসন্ন হাসি' ভিন্নভাবে কার্য্যকারণদ্বারা প্রকাশ পায়। শিল্পীরা শরীরে মনের ভাবই দেখেন, আত্মভাবে ভাবিত হন। তাঁদের সঙ্গীত জনমনকে স্পর্শ করে।

বিজ্ঞান যে স্পর্শ করে না তা নয়। বিশেষ ভাবেই চমৎকারিতা দেয় ; মনের খোরাক দেয় কি ? তা আমি জানি না। তবে এটা নিশ্চয় যে - কৌতুহল এনে আরো অগ্রসর হতে সাহস দেয়, উল্লাস দেয়। রোগ আরোগ্য করে, জনহিতকর কাজে, বহু বিষয়ে এগিয়ে গেছে বিজ্ঞানী। তাঁরা চায় প্রমাণ, শিল্পী দেয় অনুভব, বিজ্ঞান মন্থন ফলে ভালো মন্দ দুটাই প্রয়োগ হয়। শিল্পে মন্দ থাকে না।

বিজ্ঞানীরা শরীর সর্বস্য হওয়াতে শরীর প্রয়োজনে বস্তু সৃষ্টি করেন। শিল্পীরা সৃষ্টি করেন আনন্দ। বিজ্ঞানীরা যন্ত্রদ্বারা সময়ের মূল্য রক্ষা করেন, শিল্পীরা প্রবাহমান সময়কে ধরে রাখেন চিত্রে, সঙ্গীতে। শিল্পী আদি স্রষ্টা, বরাবরই তাঁরা দর্শন জ্ঞান অনুসরণ করে সৃজন আনন্দে আত্মভাব প্রকাশ করেছেন। স্বভাব, তাই আত্মভাব।

সন্ধি বিচ্ছেদের মধ্যে বিজ্ঞানী ও শিল্পী এগিয়ে চলেছেন।

বিশ্বের রূপ বৈচিত্র্য, জীবের চৈতন্যময় প্রকাশ চিত্রে শিল্পীরা রাখেন।

সুর শিল্পী - জনমনে তরঙ্গ তোলেন, ভাবাবেশ দেন। মরমিয়া কবিরা ছন্দময় বানীতে আত্মচেতনা সঞ্চার করেন। মনের নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্ত করেন গায়করা। কারু শিল্পীরা রংয়ে সমাবেশিত করে জন প্রয়োজনে সামগ্রী সাজিয়ে তোলেন ; অভিনব আগ্রহে তাঁদের পরিপাটি সেবা যত্ন ভোগ করেন, শত শত জন। বিজ্ঞানের সাথে সাথে শিল্প সেবা চলেছে। শিল্পীদের বাদ দিলে, অবহেলিত হলে, বিজ্ঞান যন্ত্রের কোন মূল্য থাকে না। আজ আমরা যা কিছু দেখছি, এমন কোন বস্তু নাই যাতে শিল্পের ছোয়া লাগেনি। উপন্যাস রচয়িতারা বর্ণনার মধ্যে এক একটা জীবন ঘটনার সাথে স্থান কাল সমাজ ব্যবস্থা, কাহিনীতে রাখেন বলে জানতে পেরেছি, শতবর্ষ পূর্বের কথা। ভাস্কর শিল্পে পুরুষের যৌবন দীপ্তি, নারীর কোমলতা , বৃদ্ধের ক্লান্তিই কেবল রাখে নাই, এই শিল্প অজন্তা ইলোরা পর্যন্ত গেছে। তাজমহলাদি কি ঐ শিল্পে পড়ে না? মৃতশিল্প আজও ধারাগত হয়ে আছে জন প্রয়োজনে।

অঙ্কন কার্য্য মুমূর্ষের মূক মনে 'রেখা চিত্র সৃষ্টি করার পর, অক্ষর সৃষ্টি করে ভাষা দিয়েছে জানা

যায়, ইতিহাস তাই বলে।

ভাষা ছিল না, ভাবনা ছিল, স্বর ছিল, শিশুর অবোধ ক্রন্দন ক্রমে ক্রমে জানায় সে কী চায়। ঠিক সে মত, নিরক্ষর অনুভূতিগুলো রেখায় বিবিধ আকারে, প্রকারে অঙ্কিত হয়ে আদিম যুগ থেকে অক্ষরে পরিণত হয়ে এসেছে, ইহা শিল্পের অবদান স্বীকৃত। আমরা বিজ্ঞান কার্য্য দেখি, শিল্প অনুভব করি। উভয় চিন্তাতে স্রোত আছে, তাহা বাধাপ্রাপ্ত হলে, ক্ষুব্ধ হলে, কি হতে পারে আমি তা ভাবি।

তীক্ষ্ণ লেখনী ও কোমল তুলিতে বন্যা সৃষ্টি হয় না কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম, নজরুলের ছন্দে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অগ্রসর হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথঠাকুর মানুষের বুকের রক্তে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলেন। শিল্পের গতি মন বুদ্ধিকে পরিচালনা করে যুগ পরিবর্ত্তন ঘটায়।

বিজ্ঞানে বুঝছি— আমি শরীর, কিন্তু সবকিছু আমার বলি। হৃদপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি ক্রিয়াতে বেঁচে আছি, শরীরদ্বারাই ভাবিত হচ্ছি এবং আমার মৃত্যু অবশ্যই হবে। দেখাশোনা বলা, সবই মস্তিষ্ক ক্রিয়াতে হচ্ছে, এ হল বিজ্ঞানের মত।

দর্শন জ্ঞান বলে— ফুলের মধ্যে সৌরভমত স্ববোধ, অস্তিত্ব আছে, তা বাদ দিলে ভালবাসাবাসি চিত্তবৃত্তিগুলো কিছুই থাকে না। যাবতীয় রূপশোভা আমার বিলুপ্তিতে অর্থহীন হয়ে যায়। আমাকেই আমি ভালবাসি।

যতদিন শরীর, ততদিন আমি, এরপর আর নাই। এখানে বিজ্ঞান অচল হয়ে মৃত্যু মেনে নিচ্ছে। পূর্ণজন্ম স্বীকার করে না। কিন্তু দেখো ছয় ঋতুর পুনরাবর্ত্ত, গাছের জীবনচক্র বিষয় ব্যাখ্যা করে।

শরীর বিভিন্ন আকারে আছে এবং যতদিন শরীর, ততদিন তুমি, আমি সে। পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলে ভিন্নাকৃতি থাকে না। ইহা কী প্রমাণ করে?

এক হতে উৎপত্তি একেতে লয় হচ্ছে। এ কি সত্য নয়? (পৃথিবীতেই শরীরের উৎপত্তি) মৃত্যু আঘাত সকলকে চমকে দেয়। মানুষ এর প্রতিকার খোঁজে। মৃত্যু চায় না বলে বিজ্ঞানে মৃত্যুর কারণ হল - হার্ট বন্ধ হলে, রসরক্ত শূন্য হলে, মাথার রগ ছিড়ে গেলে রোগে স্বাস্থ্যহানি হলে মৃত্যু ঘটায়। এটুকু তাঁরা জানেন। কিন্তু বার্দ্ধক্য এড়াতে পারেন নাই। বার্দ্ধক্যের কারণ ও জানেন নিশ্চয়।

দর্শনজ্ঞান মতে - ক্রমাগত ধারায় যা সর্ব্বদা আছে এর বিনাশ নাই, আবার বিন্যাস হয়। রূপ মাত্র বদলায়। অবিনশ্বরত্বের 'আমি' সত্ত্বা স্বীকৃত হচ্ছে। আমরা জানছি - সময়ের সাথে শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে - আমার অবসান হয়। পৃথিরীর ঘূর্ণন মধ্যে পৃথিবীরও ধারণ শক্তি এসে পড়ছে, জীবায়ু এখন একশত বৎসর কদাচিৎ দেখা যায়। ঐ ঘুর্ণণ চক্র পুরান গ্রন্থে বিষ্ণু চক্র বলে, এর বিষয় তাঁরা চিন্তা করেন। বলেন প্রকৃতির মূল উৎস আছে। এবং তা অনন্তকাল অন্ত শযায়। এঁর স্বপ্ন সৃষ্টিতে ঐশ্বর্য্যময় বিশ্বরূপ, তাই ঈশ্বর শব্দ দ্বারা এর বিষয় বাখ্যা হয়েছে। বলেন জন্ম, জীবন, মৃত্যু, এই তিন অবস্থাকে মায়াময় লীলা বলা হয়েছে। যাঁরা লীলা বলেন, তাঁরা রূপময়ের অক্ষিভূত লীলা সহচর, লীলাসঙ্গিনী হন।

যাঁরা মায়া বলেন, তাঁরা রূপের মধ্যে থেকে অনুপম ব্রহ্মভাবে থাকেন । যোগীরা ঐ উভয় ভাব মধ্যে যোগ স্থাপন করে স্বরূপ জেনে ইচ্ছা সিদ্ধিলাভ করেন । তাঁদের কমপুটারের প্রয়োজন হয় না । শরীর বিভিন্ন আকারে আছে, আত্মা একা, জীবের সুখ দুঃখাদি রোগ-শোক, যৌবন-বার্দ্ধক্য, শরীর ক্রিয়া কর্মাদি ও এবং জন্ম-মৃত্যু ও একই রকম হচ্ছে। এক হতে বহু রূপ, একেতেই সব সমাপ্ত হয়। ঐ একে নিবিষ্ট ইচ্ছা বা প্রার্থণা পূর্ণ হয় (একাগ্র ইচ্ছাই এর কারণ)।

বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য্য ।

অসংখ্য প্রয়োজনের তুলনায় জীবন খুবই কম। অনেক কাজ পড়ে থাকে। বিজ্ঞানে, মেশিনের সাহায্যে বহুবিধ কাজ সমাপ্ত করার চেষ্টা করা হয় । পূর্বে কোথাও যেতে হলে অনেকদিন লাগত। এখন ২/১ ঘন্টায় পৌছে যাচ্ছি। যে সব কাজ করতে বেশ কিছু দিন লাগত, তা মেশিনে অনায়াসে হচ্ছে। বিজ্ঞান নানা দিক দিয়ে আমাদের তাগিদ পূরণ করে, রোগ ও সারায়, চিকিৎসা হয় (যদি ও মৃত্যু রোধ করতে অক্ষম)। বিজ্ঞান শরীরের প্রযোজন মেটাতে পারে, মনে-শান্তি আনতে পারে নাই । এখানে-শিল্পীরা বলতে পারেন মনের খোরাক কী, ফুলদানে ফুলরাখি, কান্নাকে মধুর করি ।

বিজ্ঞানের মতে, হাসি কান্না শরীরের নার্ভের ক্রিয়াতে হয়। বলতে হচ্ছে জীবন-সংঘাতে নার্ভের ক্রিয়াতে হয না, কোন না কোন কারণ বশতঃ মনেতে এর প্রভাব নার্ভকে স্পর্শ করে। শরীরে আমি প্রকাশে আছি, অন্তে অপ্রকাশ, তা মানতে হয় । এ ও বলতে হয় বিজ্ঞান - গাছ সবুজ হওয়ার কারণ প্রমান করে, গাছকে সবুজ করেনি । যথা-সবুজ হয়েছে বিজ্ঞান দ্বারা টমেটো ইত্যাদি, এখন অনেক কিছু মিশ্রনদ্বারা ঐ মিশ্রন বস্তুটি সৃজন করেনি । তাঁরা জানেন কারণ ও কৌশল। জাগতিক বিষয় বস্তু কিন্তু শোকে সান্ত্বনা কোথায়?

সন্ধি বিচ্ছেদ অধ্যায়ে বিজ্ঞান ও শিল্পের তুলনা করে মনে হচ্ছে হয়ত একদিন হিসাব মিলবে। যেহেতু সমগ্রভাবে আকর্ষিত হয়ে বিশ্বচরাচর আছে, তা প্রমাণ দিয়ে, বিজ্ঞান অধিকতর স্বীকার করে বলে সেখানে আছে আকর্ষণ শক্তির কথা । ঈশ্বরবাদীদের মতে, বিশ্বাধার - চিন্তার অগম্য । 'তবু ভবিত হচ্ছেন' । এঁর বিষয় জানতে, প্রকাশ করতে চাইছেন যাঁরা তারা বলেন - ঈশ্বর জগৎ ধারক, সর্ব্বনিয়ন্তা, সমগ্র বিশ্ব-কৃষ্ণ আকর্ষণে আছে ।

বিজ্ঞান যেমন অনু পরমানু বিষয় বলে, প্রমান করে, ব্যাখ্যা করে । ঠিক সেরকম ঈশ্বর চিন্তকরা ঈশ্বরকে প্রমাণ করতে পারে না। এর কারণ বলা হয়েছে - ঈশ্বর অদ্বিতীয়, তুলনা রহিত । এর মত, তুলনা দেবার এমন আর একটা দ্বিতীয় বস্তু নাই। যে সর্বময় সম্পূর্ণ, মনীষীরা ইহাকেই ঈশ্বর বলেন । যেমন বিজ্ঞানীরা বলেন - পৃথিবী। পৃথিবীর মত, আর একটা তুল্যযোগ্য বস্তু নাই ।

প্রমাণ ছাড়া যাঁরা কোন কিছু বিশ্বাস করেন না, কোন দিনই বিশ্বাস করবেনা তা বলা যায় না। যারা বিশ্বাস করেন, তাঁরা ও ঈশ্বরের সাড়া পান কিনা জানি না, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী। উভয়ের

জন্য, সময় প্রতিক্ষায় থাকে । যা সর্বদা আছে, তা আবিষ্কার হচ্ছে । চোখে দেখা বস্তু অনেক স্থলে মিথ্যা হয়ে যায় । অনেক স্থলে বিজ্ঞান নীরব আছে । জীব শরীরস্থ কিছু ব্যাখ্যা আমরা শুনেছি । পিপড়ের বিষয় ও বাদ পড়েনি ।

পিঁপড়ের ক্ষুদ্রতার তুলনায় এর শক্তি হাতীর চেয়ে অধিক তা দেখা যায়। অঙ্ককষে অনেকে না জানলেও, বোঝাযায় তার বহন শক্তিতে । এও জানছি এর বোধ শক্তি আছে, কিন্তু জানি না লাংস হার্ট আছে কিনা, শিরা উপশিরা আছে কিনা । এরা চলা ফেরা করে। জীবন ধারা আছে, বংশ উৎপাদন হয় । সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও দেখা যায়। বোধ শক্তি ও আছে, খুব তাড়াতাড়ি বোঝে। স্ববোধ, যাকে আত্মা বলা হয়, তা পিপড়েব মত ছোট নয়, হাতীব মত ও বড় নয। কী করে যদি জিজ্ঞাসা কর বলব বিদেহি, আমি বোধ চৈতন্য । চৈতন্য ক্রিযা ক্রমাগত ধারায় দেখা যায় জীবে উদ্ভিদে । বিশ্ব অঙ্গে ব্রহ্ম বিস্তার , তা এক ব্যাকগ্রাউন্ডে অঙ্কিত ছবির মত দৃশ্যমান হযেও অসীম হওয়াতে লক্ষের বর্হিভূত। পূর্ণ হয়ে, আমাদের শরীরে ও বিশেষ, বিশেষ রূপে খণ্ডিত । ঐ রূপধারক, একের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান পরিচালিত হচ্ছে । আত্ম চেতনাই হাঁ - না বলে । যা হাঁ - না বলেনা আমরা তাদের অবোধ বলি কিন্তু সবই একেরই প্রকাশ, এ হল ব্রহ্মবাদী মত । যারা প্রেরণা পান, যোগ যুক্ত হন, তাঁরা ধারণা দেন, ঐ একককে বহু নামে আখ্যায়িত করেন । তাঁরাই ঘুট ঘুটে অন্ধকারে আলোকপাত করে আমাদের সম্পূর্ণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণে ।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা - শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীতময় বাণী বহন করে । আত্মবাদ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, গীতাতে বলা হয়েছে। তা থেকে জানেছি শবীবে আত্মা প্রকাশ পান, শরীর অন্তে অপ্রকাশ, তাহা বিনাশ নয় । বহুরূপে যা ভিন্নভাবে ছিল, দেহান্তে ভিন্ন ভাবে থাকে না, কিন্তু বাসনাই পূণর্জন্ম ঘটায় । বৌদ্ধরা ও ইহা বলেন, "বাসনা বিলোপ হলে নির্ব্বান লাভ হয়, বাসনাই পূণর্জন্মের কারণ" ।

আমরা দেখছি - শত শত রূপ ধারাগত ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, তা ভেবে দেখলে, পরমায়ু স্বীকার করতে হয়, স্বীকার করতে হয় নব, নব জন্ম । শরীরে উপাদান গুলোও থাকছে নিজ, নিজ অংশে । ভেবে দেখলে তা ও অবিনাশী । অবিনাস্ত মাত্র হয়ে থাকে । আমি শুনেছি, আয়ুর্বেদ মতে 'শবীরে', অগ্নি, বায়ূ, জল, মেদ (মাটি), আকাশ, এই পাঁচ বস্তুদ্বারা শরীরের প্রকাশ । একে বলে পঞ্চত্বত্ত (পাঁচ বিষয়) । মৃত্যুতে নিজ, নিজ, অংশে থাকে ইহা খোলা চোখেই দেখা যায়। কিন্তু তাঁবা উল্লেখ করাতে তা বুঝতে পেরেছি ।

বিজ্ঞান দর্শিত বিষযবস্তু প্রমাণ দিয়ে স্পষ্ট বলে কী থেকে কী হয়, এবং কী হতে পারে, কিন্তু আত্ম (স্ব), বিষয়ে নীবব আছে । থম্‌কে আছে যেন । আয়ূর্বেদ নীরব থাকে নাই ; ঐ বিষয় বলে এবং স্টেথিস্কোপ তাদের প্রয়োজন হয় না । ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, এই তিন নাড়ীর গতি দ্বারা তাঁরা চিকিৎসা করেন ।।

(কালক্রমে উক্ত চিকিৎসা ভারতে লোপ পেয়েছে, তিব্বতে এখন ও নাড়ির গতিদ্বারা চিকিৎসা হয়, ভূটানের চিকিৎসকরা এখন অনেক রোগ সারাচ্ছেন ।)

দর্শন শুধু জাগতিক বস্তুই লক্ষ করে নাই। সৃষ্টির কারণ ও স্ব বিষয় চিন্তাকরে (বিশ্বের) পরিপূর্ণতায়-পরিপূর্ণকে বুঝবার চেষ্টায়, "ঋষীদের ধ্যান ধারণা - চিন্তায় আলোকপাত করে

বলে - মানুষ ঈশ্বর বিষয় ও আত্ম বিষয় ত্যাগ করতে পারে নাই। ভারতীয় বেদান্ত গ্রন্থ সমূহ আমি পড়িনাই কিন্তু অত্যন্ত ছোট বেলা থেকে শুনে এসেছি (আমাদের জ্যেঠা নবেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মার থেকে) তাই আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। গ্রন্থ বিষয় গুলো সবই আমার মনে থেকে গেছে, সুদীর্ঘ কালপর আজ আমি ঐ বিষয় গুলো চিন্তা করছি ও লিখছি ।।

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ জন্ম বিষয় ও তাঁর বাল্য লীলা, তাঁর সরূপ লিখেছেন ; শ্রী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদাব্যাস তিনিই মহাভারত প্রনেতা।' তিনিই মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাণী গীতা রেখেছেন। কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে কৃষ্ণই অর্জ্জুন সারথী। যুধিষ্ঠীর রাজসুয় যজ্ঞে, তাঁকেই পুরুষোত্তম বলে প্রথম অর্ঘ্যদেওয়া হয়। তিনি মথুরা হতে দারকায়-স্বরাজ্য স্থাপন করেন। তাঁকেই দ্বারকানাথ বলা হয়। কিন্তু তিনি ভারতের নায়ক ; তাঁর দ্বারাই ভারত একছত্রে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের দেহ ত্যাগ হলেপর যুধিষ্ঠীরের সহিত চার ভাই ও দ্রৌপদী সহ, বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন ; হিমালয় পথে যান। নূতন যুগের সূচনা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব পুত্র, তাঁর মাতার নাম দেবকী। তিনি কংসের ভগ্নী; উগ্রসেন তাঁর পিতা, তিনি মথুরার রাজাছিলেন। কংসই রাজ্য পরিচালনা করতেন ; কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহন করেন। ... ... সে অনেক কথা। নন্দ গৃহে যশোদার কোলে লালিত পালিত হন। যমুনা পুলিনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা ও রাসলীলা বর্ণনা হয়েছে। ব্রজ গোপালের মধ্যে তিনি বড় হন, কৈশোরে কংসকে বধ করে কারাগারদ্বার মুক্ত করেন। তিনিই ব্রহ্ম গোপল রূপে ভাবিত হয়েছেন। যুদ্ধারম্ভ কালে অর্জ্জুন ময়ামোহগ্রস্ত হলে, তাঁকে তিনি প্রবুদ্ধ করেন এবং বিশ্বরূপ তাকে দেখান। জগতের রূপ দেখে অর্জুন ভীতহন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতাবাণী সঞ্জয় দ্বারা অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র শ্রবন করেন ; আমরাও শুনতে পাচ্ছি "ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বাল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরমতপ।

গীতাবাণী অনুযায়ী, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্ম। ভাগবত ও মহাভারতে জানা যায় মানুষ যখনি ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়ে উঠে - তিনি এর প্রতিবিধান করেন।

বলেন - যদা যাদাহি ধর্ম্মস্য গ্লার্ণিভবতি ভারত।

অভ্যূত্থানমধর্মস্য সম্ভবামি যুগে যুগে ।।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস

যিনি ভাগবত ও মহাভারত গ্রন্থ লিখেছেন, তাঁর নামও কৃষ্ণ। যমুনাদ্বীপে জন্মের জন্য কৃষ্ণ নাম সাথে দ্বৈপায়ন যুক্ত হয়, এর পর বেদ বিস্তার করার জন্য নাম সাথে যুক্ত হয় বেদব্যাস।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসেব লেখনী মুখে শ্রীমদ্ভাগবত (আমার ভগবানের কথা)। আমরা জানেছি যমুনা পুলিনে লীলাময় কৃষ্ণ বিষয় এবং কংস কারাগারে নারায়ণের আবির্ভাব হয়ে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে একিভূত হয়ে যান; কারাগার উন্মোচন হয়। ঘোর রাত্রি যোগে, রাতের মধ্যে, যমুনা পাব হয়ে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে রেখেদেন যশোদার কোলে, নন্দ গৃহে গোপ-গোপিনী, বালক-বালিকাদের সাথে কৈশোর পদার্পণ করেন, তথা হতে ব্রহ্ম গোপাল রাস লীলা শেষে মথুরায় যান।........

কৃষ্ণ লিখেছেন - কৃষ্ণ কথা ; আমারা ভগবানেব কথা "শ্রীমদ্ভাগবত। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম গোপাল, সর্ব্বরূপে-ঈশ্বর, রূপময় ; এ ধারণায় ভারতে শালগ্রাম শিলা ও পূজা হয়। (ব্রহ্ম বিষয় যা বুঝেছি তা লিখছি) আকাশ-ব্রহ্মাণ্ড, এব সীমা ব্রহ্ম, ব্রহ্মেতে সম্পূর্ণ (অন্তরশরীর, বহির্শরীরের মত) মহাশূন্যের আকৃতি নাই, বিশ্বরূপ বিশালতারও অন্ত নাই ; ঐ শূণ্যের পূরণ হয় না। অচিন্তনীয় নিরাকার প্রতিয়মান হয়। কিন্তু সর্ব্বরূপে সাকার, গুণময়, সর্বরূপ ধারক। যাঁদের মনে সর্ব্বরূপে ভাবিত হচ্ছেন, তাঁরাই ব্রহ্মবিষয় ও ব্রহ্মান্ডের বিষয় ব্যাখা করেন। আমি শ্রোতা মাত্র, ইহাই সৌভাগ্য।

অমরত্ব ও আত্মবাদ ঈশ্বর চিন্তায় আছে। নিজেকে পাওয়া একবিন্দু আত্ম অনুভূতি, ইহাই ব্রহ্ম বীজ, সৃষ্টির কারণ। এর প্রকৃতিতে (স্বভাব নিয়মে) গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী ঘূর্ণিত হচ্ছে, জন্ম, জীবন, মৃত্যু, এরই ক্রিয়া। ইচ্ছা আগ্রহ প্রার্থনা। আস্তিক নাস্তিক বাদ, প্রতিবাদ, ভাল-মন্দ সব ঘটনা এতে সংঘটিত হচ্ছে। দোষারোপ অনুযোগ শ্রদ্ধা প্রীতি, যাঁদের-ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত কবছে, তাঁরা একান্তাই ঈশ্বরেব। তাঁরাই যোগযুক্ত যোগী হন। ইহা ঈশ্বর মহীমা।

ব্রহ্ম বীজদ্বারা সব কিছু আকার পাচ্ছে. ইহা বিজ্ঞান স্বীকার করে কিনা জানি না। আয়ু শেষ হয়, জানি পরমায়ু শেষ হয় না। ধারাগত থাকে ; যদি বিনাশ হত এত দিনে কিছুই থাকত না। "প্রলয়ের পর পৃথিবী - আবার সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিতা হয়"

এখন প্রশ্ন হল - হাত-পা, চোখ-কান, মুখ, সর্ব্ব শরীর নিয়ে আমি ও আমার বলার পব, শরীরে আমি কোথায় আছি। চৈতন্য বোধে আছি বলে ধারণা হয় কিন্তু চৈতন্য না থাকলে ও থাকি। স্পন্দন রহিত হলে, শরীর ক্রিয়া ব্যঘাত হলে শরীর রাখা যায় না। প্রাণ হীন শরীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। বিদেহী প্রাণ, চেতনায় যার প্রকাশ ও শরীরে যার ব্যক্তিত্ব ছিল, যে-আমি, তুমি সে, বলে-জীবন কাহিনী বহন করেছিল, এর বিষয়ে বিজ্ঞান নীরব আছে, কিন্তু মানুষ নিঃশ্চিন্ত হয়ে নেই। দার্শণিকরা বলেন - শরীর আমাকে নিয়ে জ্ঞান ধারণ করে আছে, আমি ব্রহ্ম বিন্দু আত্মা; শরীর আমাকে বহনকরে, আমিই জ্ঞান ধারক। প্রথমে আমি, তারপর শরীর। আমিই শরীর ধারন করি। শরীরে ক্রিয়া বিনষ্ট হলে শরীর ত্যাগ করি।।

কালের ঘুর্ণন চক্রে "ঋতু পরিবর্ত্তন হয়, বালক বালিকারা যৌবন অতিক্রম করে বার্দ্ধক্যে পরিণত হয় ; চলন-বলন বদলে যায়। এর দরুন বলতে পারিনা এরা তারা নয়। ঐ অনস্বীকার্য্য আমি-নিজ সত্ত্বায় (অস্তিত্বে) মিশে, যা হতে সব কিছু উৎপত্তি তাঁকে পরিব্যাপ্তি ব্রহ্ম শব্দে আখ্যায়িত করে সব কিছু উৎপত্তির কারণ বলা হয়েছে। এর পরিধির তুলনা হয় নাই। নিজ ভাবনায় নিজেই শরীর বন্ধনে মায়া মোহে মুগ্ধ থাকে দেখা যায়।

ব্যাক্তির আস্তিত্বে ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত আছে - শরীরে অভিব্যক্তিত্বে। শরীর অন্তে, মৃতের অভিব্যক্তি থাকে না। ব্যক্তির জন্যই আমরা কাঁদি শোকগ্রস্ত হই। ক্রমে ক্রমে সভাবতঃই আত্মা শরীর ত্যাগ করে। একদিনে কোন কিছুই হয় নাই। যেমন ক্রমবিকাশ দেখা যায়, সে রকম ক্রমমৃত্যু দেখা যায় না (সকলে তা বোঝেনা)। "ঋষীদের মতে পরমাত্মাই জগৎ ধারক ও কারক এবং এর সাথে সব কিছু যুক্ত"। জন্ম ও মৃত্যু, দিবা রাত্রি মত প্রকাশ ও অপ্রকাশ।

আকাশ ব্রহ্মাণ্ড, আকাশই বিবিধ রূপ ব্যবধান, সৃষ্টি করে, এব অন্তর্গত বিষয়বস্তু, কিছু বিজ্ঞান দ্বারা জানতে পাই, কিন্তু অনেক স্থলে-জানি না বলতে হচ্ছে।

গাছ দেখে বীজের সন্ধান হয়, তেমনি মাতা-পিতাকে দেখে সন্তান উৎপত্তির কারণ মনে করি। তাঁদের স্নেহে যত্নে পালিত হওয়ার পর নিজ সন্তানকে তেমনি পালন করি। এ প্রকারে সর্ব্বজীব গতানুগতিক ভাবে প্রকৃতি গত ধারায় জীবন ধারণ করে আছে; ঐ টুকই আমরা জানি।

প্রথম বীজ অনুসন্ধানকারীরা জগৎ ছাড়িয়ে ব্রহ্মবীজে যাচ্ছেন; সেখানে গতি আছে; এখানে বিজ্ঞান অচল। প্রথমত, ঐ এককে বাদ দিলে বিজ্ঞানের সমাপ্তিঘটে। এক খণ্ডিত হয়ে, বহু রূপে রূপময় হয়ে, শরীর ও বস্তুতে ভিন্নাকারে আছে, সর্ব্বময় জিরো এক কিন্তু অনুভবাতীত। অনেকের ধারণা ঈশ্বর মহাশূন্য, এর পূরণ হয় না, বিয়োগ হয় না, যোগ হয় না, কিন্তু দেখা যায় যোগ পূরণ ভাগ বিয়োগ হচ্ছে সর্বদা। যথা প্রথমে মাতা-পিতার সাথে যোগ হয়, তার পর পূরণ হতে থাকে ভাই-বোন বন্ধু বান্ধবীদ্বারা; আবার স্ব স্ব সংসারে ভাগ হয়। অবশেষে বিয়োগ হতে থাকে। মহাশূন্যে উৎপত্তি, শূণ্যতেই লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাকে মৃত্যু বলা হযেছে। ইহা একটা বিশেষ অবস্থা (শরীরের)। বিরাট আকাশে বিন্দু গুলো এই রূপ, ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে ও আকাশ আছে। বহির্আকাশের ক্রিযা ওতে আছে। গ্রহ-উপগ্রহ, আমাদের এই পৃথিবী ঘূর্ণিত হচ্ছে। ইহা বিজ্ঞান সম্মত বিষয়।

ব্রহ্মাণ্ডে অখন্ড ভাবে, ব্রহ্মই বিন্দুতে বিকাশ। দেখা যায় মাতাপিতা হতে সন্তান, গাছ হতে চারাগাছ। দর্শন জ্ঞান, আদি বীজ, প্রথম সৃষ্টির কারণ সত্তা সন্ধান করে। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু বলে নাই। আত্মবিদদের মতে এক হতে বহুর সৃষ্টি, বহু আকৃতিতে তা প্রকাশ। ইহা ঐ একের প্রকৃতি (স্বভাব) সৃষ্টির মূল কারণ।

মনীষীরা বিজ্ঞান বিষয়ে উপেক্ষা করেন না। বিশেষ ভাবে তাঁরা চিন্তা প্রসারিত করেন, যোগ যুক্ত হন। বলেন-ব্রহ্ম- প্রকৃতির অধীনে সব কিছু হচ্ছে কিন্তু খাঁচার পাখীকে জেনে ও সবকিছু ভুলতে হয়, এ হল মহা বিষ্ময়।

স্বপ্রার্থনা নিজ একাগ্রতায় গ্রহণ করলে (শুনলে) প্রার্থনা পূরণ হতে পারে। বিষয়টি আমি এখানে ত্যাগ করছি।

সন্ধি বিচ্ছেদ মধ্যে আমার লেখা পরিচালিত হয়েছিল, এখন মন্দির লক্ষ করে লিখছি।

মন্দির ও ঈশ্বর

অধিকাংশ মন্দিরই সুঁচাল হয়ে আকাশের দিকে নির্দ্দেশ করায়। মন্দির চূড়ায় দেখি - পূর্ণ কুম্ভ, চক্র, পতাকা কারণ জেনেছি ঈশ্বর পরিপূর্ণ, এর উপমা স্বরূপ পূর্ণ কুম্ভ রাখা হয়। চক্র রাখা হয় দিনমান ঈশ্বর দ্বারা ঘুর্ণিত হচ্ছে বলে। পতাকা - ঈশ্বরের জয় ঘোষনা করে।
হিন্দু-মন্দিরের উপর ঘড়ী রাখা হয় না। মন্দিরের ভেতর দিকটাকে গর্ভ গৃহ বলে। পরি শুদ্ধ হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা হয়, নত নম্র হয়ে প্রার্থনা করা হয়। আকাশ ঈশ্বরের অন্তর্গত, এরজন্য লীলাময় কৃষ্ণরূপে আকাশ রেখে মন্দির করা হয়। ভাগবত গ্রন্থে পূর্ণ ব্রহ্মরূপে শ্রীকৃষ্ণ ভবিত আছেন। যশোদার বাৎসল্যে, গোপিকাদের প্রেমে, রাধার আরাধনায়, সখাদের অনুরাগে, কংসের বৈরিতায়। এই কৃষ্ণই মহাভারতে অর্জ্জুন সাবখা। তাঁর বিশ্বময় রূপ দর্শনে, অর্জ্জুন বিচলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরনাপন্ন হন। এখন প্রশ্ন হল - শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নের ভাব-মূর্ত্তি ? অনেকের মতে শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ ; আমার ধারনায় সর্বাকারে মানব ঈশ্বর তিনি। মানুষেই ঈশ্বর, যুগ প্রবর্ত্তক।
মহাভারত গ্রন্থে তখনকার দিনের সমাজ ইতিহাস আছে। কী ভাবে গুরু গৃহে বিদ্যার্থীরা শিক্ষা দিক্ষা পেত, কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া হত, তা জানা যায়। তখনকার সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি, যুদ্ধ নীতি অস্ত্রাদি বিষয় ও বিজ্ঞান কীরূপ উন্নতছিল সে সব আমরা মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থাদিতে জানতে পাই। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বর রূপ স্বীকৃত হয়েছে, তাঁকেই রাজ সূয় যজ্ঞে প্রথম অর্ঘ্য দেওয়া হয়। তিনিই অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান। এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে কাল্পনিক পুরুষ বলাহলে আমার ভূল হবে মনে করি।
জগতের স্বরূপ ও যুদ্ধ পরিণাম, কারুর অজ্ঞাত নয়। অনেকের মতে গীতা মহাভারতের মধ্যমণি এবং গীতাতে জ্ঞান-যোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, ও ভক্তিযোগ বিশেষ ভাবে আছে। ভক্তি দ্বারাই মানুষ আত্ম সমর্পন করতে পারে, কিন্তু তাহাই সবচেয়ে কঠিন। বিশ্বাস ভক্তি না এলে কিছুই সমর্পন করা যায় না। যেহেতু সব মানুষ দোষ শূণ্য নয়। দেখা গেছে-প্রকৃতি গত ভাবেই মানুষ বহু দোষে দোষী, পশুর চেয়েও হিংস্র, লোভী, চক্রান্তকারী, কামুক। নিজেদের দিকে তাকালেও তা জানা যায়। যেমন এও সত্য-মানুষই নিজেকে সংযত রাখতে পারে। মানুষের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ সময়ে, ভগবান জাগ্রত হন, মানুষই জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য চর্চা করে। মানুষই ভক্তিমান হয়।
"ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান", এ দিক দিয়ে ও শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করি ; এবং তাঁকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলতে বাধে না।
পরিব্যাপ্ত আকাশে সর্ব্বরূপ আছে, এমন হেন বস্তু নাই যা আকাশ ছাড়া। পিপড়েতে ও আকাশ আছে ; আকাশেই প্রাকৃতিক ক্রিয়া দেখাযায়। শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে, বাহিরে, প্রকাশমান হয়েও বিতর্কিত হচ্ছেন।
"অহিংনিত্য শ্বাসতয়ং পুরাণং গহন্যাতে হন্যমান শরীরে" আমরা তা বলতে পারি না, জন্ম

মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত আছি । শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্থ ব্যক্তি, তিনি জ্ঞানের আধার ।।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন - তুমি নর, আমি নারায়ণ। নরদেহে ও অন্তরে, ঈশ্বর প্রকাশ পান । অবতার-বাদ স্বীকৃত আছে । যেকোন আধারে সর্ব্বশক্তিমান প্রকাশ হতে পারেন ।

বিজ্ঞান যেমন বলে প্রকৃতি, প্রকৃতি; তেমনি-মনীষীরা বলেন অপ্রমেয়, অপ্রমেয় ।

যোগীরা অপ্রমেয় ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে যোগযুক্ত করেন, এর মধ্যে চিন্তা প্রসারিত করে প্রকৃতি অনুযায়ী প্রার্থনা করে কাম্য লাভ করেন বলে শুনেছি । বিজ্ঞানও বর্ত্তমানে এ বিষয় স্বীকার করে । মানসিক শক্তিতে অনেক কিছু হয় ; ইচ্ছা শক্তিতে কোষ তৈরী হয় এবং যে কোন অঙ্গ হতে মন সরান যায়, ঐ জন্যই বলা হয় "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লংঘয়তে গিরি, তত কৃপা তমহংবন্দে পরমানন্দ শ্রী মাধবং" সম্প্রতি, অন্ধ দৃষ্টি পাওয়াতে বিজ্ঞান ইহা অবিশ্বাস করেনা । আমি বিশ্বের অন্তর্গত, বিশ্ব অঙ্গে আমার প্রকাশ . বিশ্বাধার আমাকে লেখনী ধরিয়ে দিয়েছেন ।

এখন লিখছি নির্ব্বান মানে সলতে শেষ হওয়া । আয়ুর তুলনা সলতেটি নিভে যায় কেন ? ইহা বিজ্ঞানের প্রশ্ন ।

দেখা গেছে সলতে জ্বলে জ্বলে শেষ হয় . বাতাস রুদ্ধ করা হলে সলতে থাকলেও জ্বলে না ; তেমনি দমকা হাওয়াতে ও নিভে যায় ; বেশী দিন বাঁচতে হলে নিয়মে নিশ্বাস পরিচালন করতে হয় । উপরোক্ত বিষয় কিছু সত্য হলেও মৃত্যুর একটা না একটা কারণ বা উপসর্গ থাকেই । ওতে কারুব হাত নাই । জন্ম সাথে মৃত্যু ধার্য হয়ে আছে । তা কেহ বাধা দিতে পারে না, ইহা অবিসম্ভাবী ।।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে - অশেষ জিজ্ঞাসা নিয়ে ফিরে এসেছি । ঐ সুদীর্ঘ সময়ে অনেক অঘটন ঘটেগেছে ; জীবনটা উলট পালট হয়ে সময়েব সাথে সাথে, অনেক দূর এসে পড়েছে। যদিও তুমি পরিচিত, আমি সময় অনুযায়ী নূতন মানুষ, তা হলে ও সেই পুরাতন সুখ-দুঃখ আলাপ করতে বসেছি । সাজগোজ, চালচলন, বদলে গেলেও চিনতে পাবছ নিশ্চয, স্বভাব যে বদলায় না ।

শুনলাম অনেকে মারা গেছেন। আমি চিরদিন বাঁচবনা এটাই এখন সান্ত্বনা। কিন্তু অনেকে বলেন মানুষ মরেগেলে তাঁর আশা আকাঙ্খা নাকি মায়াময় পৃথিবীর বালুকনায় মিশে থাকে । দেহহারা মনের ক্রন্দনে আত্মা আবার ফিরে আসে ; মন্ত্রমুগ্ধের মত বিগত জীবনের বাসনা, অসমাপ্ত কাজ, সম্পূর্ণ করতে । যে মালা গাঁথতে গিয়ে, গাঁথা হল না, যে গানের অন্তরা গাওয়া হল না, রূপের তিয়াস নিয়ে যার অশ্রু সজল চোখ বুজে গেল, অর্দ্ধপথে যার গতি স্থগিত হল, সেই অর্দ্ধপথ, অসম্পূর্ণ আশা আকাঙ্খা, সমাপ্তীর প্রয়াস নিয়ে আবাব নাকি অতৃপ্ত প্রাণ শরীর ধারণ করে, নূতন জীবনে পুনরাবৃত্ত হয়, বিদেহী ক্রমাগত জন্ম গ্রহন করে। পৃথিবীর সাথে তার সূর্য্য পরিক্রমা শেষ হয় না । দেহ নিয়ে মানুষের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্খা, তা জীবনান্তে যখন শরীর ভষ্মীভূত হয়ে যায়, অথবা মাটি চাপাপড়ে। এখন বিদেহীর মূক চেতনায়-সকল ইচ্ছা, আকাঙ্খা থাকে নাকি এবং চৈতন্যই দেহ ধারণ করে নাকি । দেহ, মনের অশ্রয়স্থল; মনই অসম্পূর্ণ বাসনা নিয়ে শরীরে ঘরবাঁধে । আত্মচেতনায় মনই সুখ দুঃখ গ্রহণ করে; শরীরে

মনের ক্রিয়াই প্রকাশ পায়, কিন্তু বিজ্ঞান কী বলে ? শরীরে মন থাকে কোথায় ? চৈতনা সাথে যুক্ত নয় কি ?

দেখা যায় - শরীরের গতিরোধ হলে ও মনের গতি রোধ হয় না ; ক্রমাগত চলতে থাকে। এখানে কারুর আদেশ চলেনা, বিবেক বুদ্ধির দোহাই কিছুটা মানে, তা ও যুক্তি সাপেক্ষ । এই মনকে বসে আনা - আমার সাধ্যাতীত ; সাধনা করিনি সাধিও নি । মনের আরাম রাম যখন নাই, ক্রমাগত অবিরাম গতিতে হয়ত ফিরে আসব, তারা ও আসবে, কেউ কাকে চিনব না, একথা ভাবলে মরণে ও সুখ নাই । মালা গাঁথা ব্যর্থই হতে থাকবে বিস্মরণে আমরা থাকব । এ জন্মের সব ভূলে যাব, এটা কি আমরা চাই ? না, না, এত ভালবাসা, এত প্রিয়মুখ, আমি ভুলতে চাই না । যত দিন বেঁচে থাকব, আমার স্মৃতিতে থাকবেন তাঁরা । যতদিন আমার মস্তিষ্কের ক্রিয়া লোপ হবে না তোমাদের মনে রাখব ('ভূল বলছি') মনে থাকবে ।

হে বন্ধু, আমি যে তোমায় ভুলতে চাইনা । জানিনা ভবিষ্যৎ গর্ভে কী আছে । ভাল হোক্, মন্দ হোক, সময়ের বিপরীত কেউ চলতে পাবে না, অক্ষম হলেও নিঃস্পৃহ হয়েও সময় আমাদেব ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আমি ও থাকতে পারিনি ; সময় আমাকে তোমাব কাছ থেকে অনেক দূর ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ।

নিজেকে ছেড়ে দিতে হয়েছে, ফিরে দেখবার অবসর বা উপায় নাই ; চলতি পথে পায়ের ছাপ সঙ্গে সঙ্গে মুছে যেচ্ছে, পৃথিবীতে একটুকু স্মৃতি কারুব জন্য থাকে না. যা থাকে তা অন্তরেই থাকে তাই বলি হে মিত্র, আমি তোমায় মনে রাখব আমাব গানে, আমার জীবন ছন্দে; তুমি যে আমার চিন্তামণি ।।

"চিন্তামণি"

বিল্লমঙ্গলেব কাম্য ছিল চিন্তামণি বিল্লমঙ্গল হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে, মৃত্যুপণ করে খরস্রোতা জাহ্নবীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন । চিন্তামণি কে পাবার আশায় সর্পকে রজ্জু জ্ঞ্যান করে ছিলেন। তিনি প্রাচীর লঙঘন করে চিন্তামণির সন্নিধানে পৌঁছলেন। তাঁর কাম-অন্ধ মনের পর্দা সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন চিন্তামণি ; এমন দুর্যোগ রাত্রি, সম্মুখে দুস্তর পাবাবার কী করে উত্তীর্ণ হলে ? বিল্লমঙ্গল বলেন শুষ্ক কাষ্ঠ অবলম্বন করে ; ভেসে এলাম। চিন্তাঃ- দেখ, এ কাষ্ঠ নয়, শব। সময় স্রোতে ভেসে এসেছ । ঘাত প্রতিঘাতে জীবন তরঙ্গে ভেসে এলে। এখন বল তোমার আমার মাঝের প্রাচীর ব্যবধান কি করে লঙঘন করলে ? বিল্লমঙ্গল ঃ- ঐ দীর্ঘ রজ্জু ধরে প্রাচীর বিচ্ছেদ লঙঘন করেছি । চিন্তাঃ- দেখ, এ রজ্জু নয়, কালসর্প , সময় জীবনকে পরিচালন করে এগিয়ে নিয়ে যায়, অবশেষে মৃত্যু ঘটায় । তুমি মৃত্যুপণ করে যেভাবে আমার কাছে এসেছ - সে ভাবে ঈশ্বরে মন বুদ্ধি স্থাপন কর ; আত্মস্থ হও।

বিল্লমঙ্গল চিন্তামণির প্রশ্নালোকে জীবনদর্শন লাভ করেছিলেন, চিন্তার আলোয় চিন্তামণিকে দেখেছিলেন ।।

আমার চিন্তামণি বলেন - অশ্রু পারাবারে প্রস্ফুটিত হে আমার কমল, জীবন ফুরাইয়া গেলেও ভালবাসা ফুরাইয়া যায় না। পার্থিব জগতের সকল সম্মন্ধ চুকিয়া যায় কিন্তু আত্মার সহিত আত্মার বন্ধন জড়াইয়া থাকে ; ইহাই প্রেমের অটুট বন্ধন।

তোমাতে যে ধারা ক্রমাগত হইয়া চলিয়াছে, তাহার গতি রোধ করিও না । জীবনে যাহা প্রকাশ করার ভাষা ছিলনা, বুকের শিহরনে সেই অপ্রকাশ কথা - সুর খুঁজিয়া পাইয়াছে । তোমার কানে কানে না বলা কথাই আজ বলিব ।

আমার পরিতৃপ্তি, আমার শান্তি, আমার বলিতে - আমার সব কিছু তোমার, তা বলিতে গিয়া নিঃশেষ হইয়াও তোমাতে আমার ভালবাসা বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে । তুমি আছ, তোমাতে আমার সবই আছে, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব ; কেবল আমি বিদেহী । তোমাতে আত্মাহারা হইয়াছি বলিয়া - আমি তোমাতে পরিণত হইয়াছি । তুমি - আমি উভয়ই এক সূতায় গাঁথা মালা, এই মহামিলন । এখানে বিচ্ছেদ নাই, কিন্তু নিঃসঙ্গ বিরহ সঙ্গীত আছে - আমার বিলুপ্তিতে। কথা তোমার, ভাবনা আমার । তুমি ফুল, আমি সৌরভ। তোমার আমার মিলনে, সোনার খাঁচায় পাখী গান গায়।

বিকশিত জীবনে আমায় খুঁজিতেছ ? আমি যে ভাষার অতীত ; নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছি, সর্ব্বত্র আমি তোমার। যা চা ও - তা দিয়াই আমার আনন্দ। যা চাও না, তা আমার নাই। সমুদ্রে নদী মিশিয়া গিয়াছে, চোখের জল পৃথিবীতে শোষিত হইয়া গিয়াছে ।।

প্রিয় অনুপ, আমার চিন্তামনির কথা শুনলেত ? এখন লোকের কথা শোন। কেউ বলে আছে, কেউ বলে নাই, আছে নাই'য়ের মধ্যে মন দুলে উঠে। প্রশ্ন কবি - কী আছে কী নাই? এখন ওরা বলে - প্রেম আছে, প্রাণ নাই । ঐ কথায় আমার মন বিলাপ করে কাঁদতে চায়। ওদের কথা বেসুরো লাগে। বলি - এক সুরে দু কথা বলবেন না। আমি আপনাদের কথা বুঝতে পারছিনা। প্রাণ, এই মাত্র যাঁরা ছিল, যাঁর অভিব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ছিল, হাসি কান্না ছিল, মায়া ছিল, আজ নিথব কেন?

যিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে ছিলেন, যাঁব ভাব প্রকাশ ছিল, তিনি দৃষ্টিব অগোচরেই ছিলেন। তার ভাব ব্যঞ্জনা শরীরে প্রকাশ ছিল । শরীর অন্তে কী হল, কী হল বলি। প্রাণ ধারণ করে আমরা বেঁচে থাকি, অথচ নিজ প্রাণের বিষয়ই আমরা জানি না। প্রিয়জনের শরীর যখন আলোহীন দীয়া হয়ে পড়ে থাকে, আমরা শোকাকুল, বিরহী হয়ে শরীর আলিঙ্গন করে কাঁদি; প্রাণ জনাই প্রাণ কাঁদে। ওঁরা বলে - জল শোষিত হয়ে চক্ষুর অন্তরালে থাকে, আবার বাষ্প হয়ে বর্ষিত হয়, তেমনি শত শত প্রাণ পৃথিবীর আকর্ষণে অপূর্ণ মনসাধ নিয়ে বর্ষিত হয়। এর প্রমাণ নাই, যুক্তি মাত্র আছে।

আমি যে রূপ তঁকে দেখেছি সেরূপ দেখতে পারব না, আমি কাঁদি আমার ভালবাসার জন্য। মৃত্যু যে মহা দুঃখ অবসান। অভিজ্ঞান হারিয়ে জীবনাবসান হয়ে যায়, যবনিকা পতন হয়। এজন্য অনন্তকাল কথার প্রবাহ চলে এসেছে। এখানে কোন সান্ত্বনা নাই । আত্মা অমর বল, যাই বল, যখন মহাবিচ্ছেদ ঘটে যায় - নিরুপায় হয়ে হাহাকার করি। আশা নাই, প্রতিকার নাই, নির্ব্বাক হতে হয়।

বিশ্ব ক্রিয়াতে আমি এক বিন্দু, এই বিন্দুটি এটম আবিষ্কার করে নাই কি ? সর্ব্বশক্তিমানের কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকছে না। সবার আধারে স্বক্রিয় আছেন। আমার চেতনা ঈশ্বর প্রতীকের প্রকাশ চাইছে। নূতন আলোর উন্মেষে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি। ব্রহ্ম আলিঙ্গনে আমার মন প্রার্থনা করে - পৃথিবীর নবজীবন।।

আমার জন্ম কর্ম্ম একটি করণের মধ্যে আছে, এতে আমার লেখনী পরিচালত হতে চাইছে। আমি লিখছি আর পড়ছি। কখন বুঝছি কখন বুঝতে পারছিনা। আলো- আঁধারে চলেছি। কে যেন বলছেন পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর, জগন্ময়, ভগবান ইত্যাদি নামে আখ্যাত, ঐ শব্দ গুলো অর্থ পূর্ণ হয়ে আভাস দিতেছে। পুরান গ্রন্থে কথিত হয়েছে - ঈশ্বর অনাদি, অতুলনীয়, অসীম অপ্রমেয়। অহরহ নিজপূর্ণতায় রূপে গুণে সর্ব্বময় হয়ে নিরাকাব প্রতিয়মান হলেও বিশ্বরূপে সাকাব। এর তুলনা নাই।

যাঁর মধ্যে গ্রহ উপগ্রহাদি একটা নিয়মের মধ্যে ঘূর্ণিত আছে, যিনি বিশ্ব স্রষ্টা, তাঁকে শত শত রূপে নানাহ ভাবে - চিন্তা জ্ঞান যুক্তি দ্বারা অনেকে জানতে চান। সৃষ্টিতে থেকে স্রষ্টাকে জানতে চাইছি - জগতে অঙ্গিভূত হয়ে ;যাঁকে প্রমাণ করা যায় না, তুলনা করা যায় না, যুক্তি মাত্র হলেও এর গুরুত্ব আছে। অনেকের কাছে - তা আবার পাগলামি। মীরা, ভাবাবেগে ব্যাকুল ছিলেন, তাঁর সঙ্গীত - "মেরে তো গিরিধারী গোপাল দুসরা ন কোই। যাকেশির মোর মুকুট মেরা পতি সোই "।

সন্ত কবির বলেন - অবকিঁউ ঘর ছোঁড়ু বন যাঁউ। পিয়া ঘর আয়ে ঘর হীন কাহে সজাঁউ।
আমাকে একটা পাগালামি নেশা পেয়ে বসেছে বলাম না ? এঁদের ভাবে দুজনের বাক্য শব্দে পার্থক্য আছে। ভাব পার্থক্য খুব বেশী নাই ভালবাসায়। মীরা বিরহিনী কবির প্রিয় মিলনে সেজে উঠেছেন।

জীবন ধারণ মূলে আছে আমি সত্য, যেখানে আমি নাই, আমার ও নাই। সেখানে মায়া মরিচিকা সংসার বৈকি। মায়াবাদীরা বলেন সবই মায়া । তোমার আমার বলে কিছু নাই। তা অনেকটা স্বপ্ন মত, ওঁদের মতে । সবই মিথ্যা, যেহেতু ক্ষনস্থায়ী ; রংবদলে যাচ্ছে কিন্তু বলছে পুনরপি জনমং, পুনরপি মরণং, পুনরপি জননী জঠরে শয়নং। তাঁদের এই কথায় পুনর্জ্জন্ম বিষয় আছে। আত্মার বারবার প্রত্যাবর্ত্তন, রূপমাত্র পরিবর্ত্তন হচ্ছে। কিন্তু পূর্ব্ব স্মৃতি বিষ্মৃত হওয়াতে সংশয় উৎপন্ন হয়।

নিজের শরীরকে বিজ্ঞানাগার করে, শরীরে আমি কোথায়, দেখা যায় কি ? বিজ্ঞ্যান বলে সর্ব শরীর নিয়ে আমি ; এ স্থলে বলা যায় শরীর নিয়ে আমার প্রকাশ। মস্তিষ্কের ক্রিয়াতে দেখি শুনি বুঝি। অন্তর শরীর ও বহির শরীরের যোগাযোগ দ্বারা, দেখি, শুনি, বুঝি। স্নায়ু সমূহের দ্বারা, বোধোদয় হয়। এই বোধক্রিয়াতে জীব পরিচালিত হচ্ছে। পাশ্চাতোর বিজ্ঞানীরা শরীর বিষয়ে অনেক কিছু বলার পর বলছেন - আর জানার নাই। তাঁদের মধ্যে একজন বলনে - আরো যেন কিছু আছে, তা প্রমাণ হয় নি বলে যদি অস্বীকার করি, (আর জানার কিছু নাই বললে) বিজ্ঞানের গতি এখানে স্থগিত হবে।

প্রাচ্যের ঋষিরা বলেন সেইই আমি, সেই আমি; আমি ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ, আমি প্রতিধ্বনী।

জন্ম মৃত্যু শরীরের একটা অবস্থা মাত্র। আমি নিত্য শাশ্বত, আমি চৈতন্যময় সত্তা। ঐ আমি বোধকটি শরীরে সীমিত হয়। আমি শব্দে - সত্তাই স্বীকৃত হচ্ছে।

তুমি বলছ - আমি, আমি বলছি - আমি, সে বলছে - আমি ; তুমি, আমি, সে, সত্ত্বাকেই স্বীকার করে। আমি চেতনা এক, অদ্বিতীয়। শরীরের ভিন্নতায়, রূপ পার্থক্যে আছে। তুমিও আমি, আকারে প্রকারে উভয়ে উভয়কে দেখি ; দর্পনে প্রতিফলিত ঐ সর্ব্বশরীরে আমি বোধ হয় ; আমার নাম পরিচয় শরীরই বহণ করে। নামকরণ হয় যথা - যদু, মধু, মাইকেল, রহিম ইত্যাদি। কেহই নাম নিয়ে জন্ম গ্রহন করে নাই; এও সত্য যে সবার শরীর ক্রিয়া সমান। উক্ত কারণে সমবেদনাতে একাত্ম বোধ মূহুর্তের জন্য হলেও হয় এবং আমরা যা দেখি একই আত্মবোধে - তা বুঝি - দর্শিত বস্তুটি কী। কিন্তু তুমি, আমি, বলে, আত্মা ভিন্ন ভাবে আছে। "জল বিভিন্ন পাত্রে রাখার মত, আত্মা বিভিন্ন শরীরে আছে" ইহা আমি বহুবার শুনেছি। উক্ত কারণেই ভিন্নাকারে থাকাতে তুমি আমি ভাবাপন্ন হয়। 'ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান' শরীরে অর্দ্ধ দেহী- সর্ব্বশক্তিমান হয় না। যোগীরা সাধনায় কিছু শক্তি পান। যোগী ও বিজ্ঞানীর পার্থক্য হল - বস্তুবাদ ও ঈশ্বর-আত্মবাদে। উভয়ের একাগ্রতাই তাঁদের সিদ্ধি দিচ্ছে।

জানতে পেরেছি -পাত্রস্থ জলে তরঙ্গ উঠে না বায়ূর গতি বাধা পায় বলে। আবার আগুনে পাত্রটা বসালে তরঙ্গ উঠে। শরীরে তরঙ্গ আছে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যেখানে ঢেউ উঠে, শরীর ক্রিয়া সর্ব্বদা অক্সিজেন গ্রহণ করে। বিশ্বে প্রবাহিত বায়ূর সাথে নিশ্বাস প্রশ্বাস আছে; তা ঘুমের মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়, কোন ভাবনা চিন্তা দর্পন শ্রবন, বাক্যে, বাধা পায় না। ঐ রূপ অবস্থায় নিশ্বাস যদি প্রার্থনায় পরিচালিত হয় - একাগ্র প্রার্থনাই প্রার্থীকে ঈশ্বরেব সাথে যুক্ত করে। হাসি কান্নার মধ্যে থেকেও ঐ সাধক নিঃসঙ্গ হয়, কিন্তু শরীরস্থ চেতনা মায়া মোহে আবদ্ধ থাকায় তদানুযায়ী প্রার্থনা হয়।

অনুপ, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পার - ঐ রূপ ধারণা কেন করি আমি এই মাত্র বলতে পারি - যা জন্মের সাথে কর্মকরায়, তা ভাগ্য বল যাই বল, অনেকে প্রকৃতিও বলেন, ওটাই সবার অলক্ষ্যে, তারতম্য মধ্যে, একটার পর একটা কারণ সৃষ্টি করে, বশীভূত করে - সবাই কে নিয়ে যয়; সর্ব্বজন এর বলেই অগ্রসর হয় ; এরিমধ্যে মহাপ্রস্থান পথে অনেকে পিছু ফিরে দেখেন। অতীতই বর্তমান হয়ে ক্রমাগত ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে বর্ত্তমানকে ধাবিত রেখেছে। বিজ্ঞানীরাও অতীত বিষয় সমূহ অনুধাবন করেন, ইতিহাস লেখকরাও অতীত ঘটনাবলী সন্ধান করেন। দার্শনিকরা আত্মার মূল ভিত্তি সন্ধান করে, করে, পরম্পরাগত পথ ধরে, তাঁরা শেকড়ে যাচ্ছেন, আমি সেই অতীতের ডাক শুনলাম ; একটা শব্দ আমাকে স্পর্শ করল যে। আকর্ষণ করল- আমার মন বুদ্ধিকে।

চণ্ডিদাসের পদাবলীর মত (কানের ভৈতর দিয়া মরমে পসিল........)। ঐ শব্দক্রিয়াতে বশীভূত হয়ে লিখি।

কেউ স্বইচ্ছায় জন্ম গ্রহণ করে নি, ধনী গরিব হই নি, তা যদি হত কেউ দূরাবস্থায় থাকত না। (সবাই সৌভাগ্য নিয়েই জন্মাতাম)। আমাদের সবার জীবন অদৃশ্য সূতায় বাঁধা ঘুঁড়ীর মত পরিচালিত হচ্ছে। সর্ব্বনিয়ন্তা, ধ্যান ধারণায় প্রশ্ন তুলে লিপিবদ্ধ করে দিচ্ছেন।

অনুপ, তোমার মনে কি প্রশ্ন উঠে না - মৃত্যু যখন জীবনকে স্তব্ধ করে ডাক্তাররা যখন বলেন - অমুক রোগে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তখন প্রশ্ন উঠে নাকি - এই রোগ না হলে সেকি মরত না? চিরজীবি থাকত? জন্ম-মৃত্যু বিষয়ে বিজ্ঞান পাস কাটায় - প্রকৃতি বলে। ঈশ্বরবাদীরা আত্ম অনুভূতিতে ইহা একটা অবস্থা মাত্র বলেন। তা ও ব্যাক্তিগত স্বধারনা বলা যায়।
যারা আদি বীজ সন্ধান করেন, তাঁরা বলেন - ব্রহ্ম পরমাত্মা, ধ্যান ধারণার বিষয়, বস্তু বিষয় নয়, জন্ম মৃত্যু এর প্রকৃতিগত আশ্চর্য্য বিষয়।
আমি আবার চণ্ডিদাসের পদাবলী থেকে উদ্ধৃত করছি -
"আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা,
তোরা নিসাড় হইয়া আয়লো সজনী, আঁধার পেরিলে আলো,
কালোর ভেতর আলোটি রয়েছে চোঙ্গটি রয়েছে তথা,
এদেশের কথা সেদেশে কহিলে মরমে লাগিবে ব্যাথা।"
কালোটি, চোঙ্গটি, বলে-কবি, কৃষ্ণ ও তাঁর বাঁশীর কথা বলছেন। "নিসাড় হয়ে" সাড়াশব্দ না করে আসতে বলছেন। কালোর ভেতর কৃষ্ণরূপ বিশ্ব আলো করে - নানা ভাবে মগ্ন করে রেখেছে। সেই কৃষ্ণ আধ্যাত্মিক, আত্মা (অন্তর জগতের) সে দেশের কথা, (অনুভূত কথা), এ দেশে, বাস্তব বাদিদের কাছে বললে - ব্যাথাই পেতে হবে। তাই চুপি, চুপি, এস বলছেন।
অনুপ, বৈষ্ণব কবিদের কৃষ্ণ অভিসার রাতে রাধাকে তুমি দেখেছ? বাঁশীর ডাক শুনেছ? চুপি চুপিই বলছি তোমাকে, ঐ বাঁশীর স্বব বড় মধুর, খুবই আরাম দায়ক। চিন্তাকে পরিব্যাপ্ত করে, অনুভব দেয় তুমি আমি একাধারে বহুর সাথে আছি। ঐ শব্দটিকে মন্ত্র বা যোগসূত্র বলতে পার। ক্রমে ক্রমে তা যখন স্বরূপ প্রকাশ করে তখন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।
এক দল মন্ত্রধারীর কথা বলছি, সে জেনে -না জেনে, সংস্কৃত শ্লোক প্রতিদিন আওড়াত, ঐ শব্দ গুলো আলোকিত হয়ে তাঁর চিন্তায় স্পষ্ট হতে থাকে ; ধাপে ধাপে তাঁকে অগ্রসর করে, ব্যাপ্তীমধ্যে তাঁকে বেশ কিছুক্ষন রাখে, প্রার্থনা করায়।
যা অনেকে প্রার্থনা করেন, সে ও তাই করে, কিন্তু জানল অনুভব করল বাক্যাতীত অসীম, বিদেহী আমি চেতনা সমগ্র সাথে এক। সে জানল - তার মন বুদ্ধি বিশেষ ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কৌতুহলি হয়ে এমন সব প্রার্থনা করে - সে বুঝল, কোন প্রার্থনাই তার ইচ্ছাকৃত নয়। ঐ গুলো স্বভাবতঃই মন্ত্রের মত গোপনে কাজ করছে। তাঁকে হাসায়, কাঁদায়, মাতায়, একটার পর একটা কাজ করায়, পড়ায়, বুঝায়। প্রশ্ন তুলে, তুলে, মিমাংসা করে দেয়। সে বুঝল - ইচ্ছাই ইচ্ছা পুরন করে দিচ্ছ কিন্তু ইচ্ছাগুলো স্বীকৃত নয়।
শোন - আর একটা কথা। 'শ্রীমদ্ভাগবতে' শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন শ্রীকৃষ্ণের কথা লিখেছেন। সেই প্রেমমুগ্ধ গোপীকাদের ভাব মধুরতায় ভাবা পথ কবি বিদ্যাপতি লিখেন - সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়, সেই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়"।
শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকান্তি বংশীধারী, নিয়ত লীলাময়। তাঁর বাঁশীর কলস্বরে - একুল ওকুল, দুকুলে প্রবাহিত যমুনায় তরঙ্গ উঠে। কবির ছন্দায়িত প্রতিটি কথা, মর্ম্ম স্পর্শিত হয়ে - মর্ম্ম উদঘাটন করে। ব্রহ্মগোপাল নিয়ত আছেন ; রাধিকার অভিসার রাতে চন্দ্রোদয় হয়। ভাগবতে, রাসনৃত্য

কালে প্রত্যেক গোপীর সাথে কৃষ্ণকে নৃত্যরত দেখা যায়। তিনি যখন অন্তর্ধ্যান হলেন, হারিয়ে গেলেন (চোখের অন্তরাল হলেন) গোপীকারা ব্যাকূল হয়ে কৃষ্ণ অন্বেষনে যান ......, 'হায় কৃষ্ণ। তুমি কোথায় বলে কৃষ্ণ ধ্যানে যখন মগ্ন হলেন, ব্রহ্ম গোপাল সাথে তাঁদের ভিন্ন ভাব থাকে নাই, মহারাসে মহামিলন সংঘটিত হয়ে যায়।

অনুপ, আমি একজন শ্রুতিধর, যা শুনি তা আমার স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে, তা মণি মুক্তার মত ঝলমল থাকে।

বাংলা শুদ্ধ ভাষা বলার সুযোগ হয নাই, বই পড়ে লিখি, উচ্চারণ ঠিক না হওয়াতে লেখায় ভূল হয়। বইয়ের ভাষায় লিখতে হয়। অনেকে বলনে তোমার ভাষা কখন পুস্তকের ভাষা, কখন বাচনিক ভাষা. (দুটা মিশ্রন করে নাকি লিখতে নেই)। আমি তা পারছিনা।

আমাকে সামনে বসিয়ে পূজনীয় জেঠা নরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা সুদীর্ঘকাল কৃষ্ণকথা বলেছেন। এর প্রতিক্রিযা এখন বুঝছি। তিনি ভাল লেখক ছিলেন, কবি ছিলেন, রবি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রবিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অনেক কবিতা প্রকাশ হয়েছে। আমাদের বংশে অনেকে কবি আখ্যা পেয়েছেন। মহেন্দ্র কর্ত্তার ছোট ভাই বিমলচন্দ্র কবি ছিলেন (মহারাজ বীরচন্দ্রের পুত্র)। অনঙ্গ মোহিনী দেবী, মহারাজ বীরচন্দ্রের কন্যা। নরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা রাধাকিশোর মাণিক্যের পুত্র। জেঠা একদিন আবৃত্তি করেছিলেন -

"দিনের পরে দিন আসেরে বাঞ্ছিত এক দিনের লাগি,
তার আলোকে পুলক নিযে থাকবেরে প্রাণ নিশি জাগি।

তাঁর এই ভবিষ্যৎবানী কার জন্য জানিনা ; এ ও বলেছিলেন "লাভ বলে তা গনা হবে না, পারে এসে যদি ফিরাতে না পার ..." তখন বুঝতে পারিনি - কি বলছেন. কেন বলছেন।

সাধু সন্নাসীদের সাথে তাঁর অনেক আলাপ আলোচনা আমি শুনেছি। বলেন জল আনতে গিয়ে যদি ডুবে যাও, লাভ বলে তা গন্য হবে না ডুবেই গেলে ঘটি সহ। কথাটা সন্নাসীদের মতবিরোধী ছিল। সন্নাসীরা বলেন - আমি ব্রহ্ম স্বরূপ, কথা সত্য, কিন্তু শরীরধারীর এ ভাব স্থায়ী থাকে না।

যেমন আকাশে ঝড় উঠে, মেঘাচ্ছন্ন হয়. যদিও আকাশ স্পর্শিত হচ্ছেনা, কিন্তু বৃক্ষের পতন হয়, পাখীরা নীড় হারায়। শঙ্করাচার্য্যের কথা উল্লেখ করছি। "পুনরপি জনমং পুনরপি মরনং, পুনরপি জননী জঠরে শায়নং" আত্মা বার বার জন্ম গ্রহন করে। ব্রহ্মে লয় হয়ে যায় না। বৈষ্ণবরা বলেন আমি ঈশ্বরের দাস ; এই স্বীকারোক্তি সত্য। অনন্দস্বরূপ বলে নিষ্ক্রীয় হওয়া যায় না। প্রকৃতিই তা হতে দেয় না। কর্ম্মফল রোগ শোক সন্নাসীদের মানতে হয়। বিশ্ব প্রকৃতিতে মনের চিন্তা পরিচালিত হচ্ছে; এ ও দেখছি শরীর ধর্ম্ম সমান হলেও চিত্তবৃত্তি সমান না। রুচি ও সমান না। কারণদ্বারা সময় অবস্থায় সবই হচ্ছে। আমরা দাস দাসী নয় ত কি? এ স্থলে বৈষ্ণব মতবাদ সমর্থন করি। এই দেখ, কি লিখছিলাম, কি লিখেছি। লিখছিলাম মহামিলন সংঘটিত হয়।

গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলেন বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মগোপাল, তিনি তাঁর রূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

বড়ই পীড়াভি রামং মৃগমদ তিলকং কুণ্ডলাক্রান্ত গণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং মৃগমদ তিলকং স্বাধরে ন্যস্ত বেনু
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গম্ রবিকর বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্তা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতী শতবৃতং ব্রহ্মগোপাল বেশং।।

আবার লিখছি

অনেকেরমতে শ্রীকৃষ্ণ মহাভাবতে ঐতিহাসিক পুরুষ, আমি তা অস্বীকাব কবিনা। শ্রীকৃষ্ণে- সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মের বিকাশ বিশেষ ভাবেই বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি - শ্রীকৃষ্ণের বাণী।

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়শ্চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে

-ঈশ্বর কি স্পর্শাতীত -?

না, না, ঈশ্বর স্পর্শাতীত নয়, নিরাকারও নয়। অহরহ স্পর্শিত থাকায় বুঝতে পারছিনা, এর জন্ম যদি বলি স্পর্শাতীত, কথাটা সত্য হবে না। মাতৃ গর্ভস্থিত শিশু, মা'কে দেখেনা বোঝেনা, তা বলে কি মা নাই? অহরহ স্পর্শিত ছিলাম, মার গর্ভধারে ছিলাম ; তাকে বুঝি নাই, দেখি নাই। ভূমিষ্ঠ হয়ে জননীকে দেখেছি, বুঝেছি - তাঁর সমপর্য্যায়ে মুখোমুখি হয়ে। ঐ সীমিত রূপ ঈশ্বরে আরোপ করে সন্তুষ্ট হতে পারছিনা, কোথায় যেন ভুল হচ্ছে।
আকাশ যেন একটা পিঞ্জরা, এর মধ্যে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ভাবে সবকিছু বিশেষ বিশেষ কারণে আছে। শরীরেও ঐ সব আছে, আকাশই সর্ব্ব রূপ ধারক। একটা ক্যানভাসের কথাই ভাবিনা কেন? এতে যা সব আঁকা হল, তা সবটা মিলে একটা ছবি। তা নয় কি? আমরা কি পৃথক? বিশ্বেশ্বর সাথে কি যুক্ত নই? কিন্তু কোথায় কোথায় বলে - অপার সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে শূন্যে হাত বাড়াতে হয়।
দিন রাতের খেলায় আকাশ মগ্ন আছে। বসন্তের সুরভিত হাওয়া শীতের কুয়াশা, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদি ও জীবজগৎ তাকে স্পর্শ করে না। আমরা স্পর্শিত হচ্ছি, স্পন্দিত হচ্ছি; আকাশ অণ্ডাকৃতি বলে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়, তা অদ্বিতীয় এবং যেখানে দ্বিতীয় নাই, কে কাকে স্পর্শ করবে?
দেখা যায় বিরাট সংসারে সবই আমি, শত্রুও আমি, মিত্রও আমি, আমার কিছু নাই। বহু রূপে

আমি আমাকে ভালবাসছি, এই অবস্থাকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলা হয়।

অনুপ, এ আনন্দ কে পেয়েছেন জানি না। এরূপ আনন্দ যাঁর, তিনিও শত ধারায় কাঁদেন বলে মনে হয়। আমাদের কান্না যে তাঁরই কান্না ; হাসিটাও তার। এ তুমি অস্বীকার করতে পার না অদ্বৈতবাদে। আমার মতে তিনি কুঞ্জ রচয়িতা কবি, সৃজনে মগ্ন। আমাদের হাহাকার দুঃখ তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করে জাগ্রত করে তাঁকে, অভিন্ন যে। আমার কৃত মন্দ কাজের ফল ভোগ আমাকে করতে হয়, তেমনি তিনিও ভোগ করেন বলে মনে হয়। ঐ জন্যই যখনি, যখনি, গ্লানি আসে জনজীবনে, তখনি প্রতিকারের জন্য আসেন। এ চিন্তা আমাকে আনন্দ দেয়।

বংশীধারী কৃষ্ণ ও চক্রধারী বিষ্ণুর কথা আমরা শুনে এসেছি চক্র ঘূর্ণনে ঋতু ঘুরে, ঘুরে, আসে। ফিরে আসে বসন্তের পাখী। কৃষ্ণ আকর্ষণে পৃথিবী শুধু থাকে নাই, আমরা ও বাঁশী সুরে আকর্ষণে আছি মুগ্ধ হয়ে। এতো সুন্দর, এমন মধুর প্রতিদিনের সূর্যোদয়, প্রাণের এত কাছে, যা আলিঙ্গন করে রাখে। এরি জন্য পুনরাবর্ত্ত, এরি জন্য ফিরে আসতে হয়। তাই বলা হয়েছে বাসনা ত্যাগ না হলে নির্ব্বান হয় না।

ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিরা বলেন - পূর্ণস্য পূর্ণমিদং পুর্নাৎ পূর্ণমদুচ্চাতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বসিস্যতে।

'পূর্ণই পূর্ণকরে - পূর্ণতে আছে, পূর্ণই পূর্ণ থাকে'

ইহা সত্য বাণী কিন্তু নব নব রূপে, নববস্ত্র পরিধান করে।

গীতার এই বাণীতে মন সাড়া দেয় কিন্তু "স্থিতধী নমুহ্য'তে" কথাটা সকলকে বলা হয়নি ; তা স্থির ধীর, ব্যাক্তি বিশেষ কে লক্ষ্য করে। আত্মবোধ না হলে প্রচণ্ড মৃত্যু আঘাত সহ্য করা যায় না যে।

-কায়া আছে বলে ছায়া-

আমাদের শরীরস্থ আকাশ বড় অন্ধকার। এখানে চন্দ্র - সূর্য তারাপুঞ্জ নাই। চেতনা - অন্ধকারই অনুভব করে। চেতনা আছে বলেই সুখ-দুঃখ ভোগ করি। জগৎ ধারক কি তা ভোগ করেন না ? শুনে ছিলাম "অখিলংব্রহ্ম" ব্রহ্ম সর্ব্বময় ; উক্ত কারণে-হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রেম শ্রদ্ধা দয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান, যাবতীয় ঈশ্বরে সংঘটিত হচ্ছে। ভাল-মন্দ বিচার, অবিচার, কোনটাই বাদ পড়ে না। তাঁদের কথায় জেনেছি - প্রাণ এক, এর রশ্মি সর্ব্বরূপে আকারে প্রকারে বিচ্ছুরিত। মনে হল - আমরা প্রাণের ছায়া মাত্র। শরীরে প্রাণ অজ্ঞেয় আছে এবং স্ব প্রকৃতি বিধানে শরীরস্থ আছে।

এই শরীর পৃথিবীতে উৎপন্ন, তা দেখানো গেলেও জেনেছি যে পৃথিবীর উপাদানদ্বারা গঠিত। এরই মধ্যে মাতা-পিতা সন্তান যাবতীয় সব কিছু ধৃত আছে ; এ বিশ্বের একটা কনা মাত্র। "ইহার সূর্য্য পরিক্রমা শেষ হয় না"। দিনের পর দিন যায়, আসে, জন্ম, যৌবন, বার্দ্ধক্য সৃষ্টি হয় এর পরিক্রমায়।

"চক্রধারী সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকৃতিতে জগৎ পরিচালিত হচ্ছে -" পুরুষ আছে বলেই প্রকৃতি (স্বভাব) আছে, এ আমি বিশ্বাস করি । যেমন - কায়া আছে বলে ছায়া । পেছনের আলোই বস্তুর ছায়া সৃষ্টি করে , বস্তু না থাকলে ছায়া থাকে না ।

সকল জীব জগৎ কারণ ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা বলা হচ্ছে। ব্রহ্ম মানে অগ্নি মনে করি না ; মনে করি - বিস্তারের জন্য ব্রহ্ম শব্দ প্রয়োগ হয়েছে ।

আমি শরীরে প্রাণ সন্ধান করি । প্রাণকে আমরা হৃদপিণ্ডের মত দেখিনা, কিন্তু বুঝি শরীরে শিরা উপশিরা গুলো দ্বারা শরীরের ক্রিয়া আছে, যতক্ষণ ক্রিয়া থাকে ততক্ষণ প্রাণ থাকে, এবং প্রাণ ধারণের জন্যই শরীর । শরীর রক্ষা হলে প্রাণ প্রকাশ থাকে, তারপর থাকে না, যখন শরীর অক্ষম হয় । প্রাণই শরীর দ্বারা ভোগ করে সুখ দুঃখাদি । শরীরের পাঁচ বিষয় 'পঞ্চতত্ত্ব' জানার পর পরমাত্মা বিষয় উল্লেখ হয় , জানবার বিষয় হল - আত্মা ও পরমাত্মা । ঐ বিষয় ধারনা দেয় - কায়া ও ছায়ার মত ; তাই লিখেছি কায়া আছে বলে ছায়া । "পুরুষ আছে বলেই এর স্বভাব 'প্রকৃতি' আছে ।।

চোখ সব কিছু দেখে, কিন্তু চোখের জন্য দর্পণের প্রয়োজন হয় ; দর্পণেই আমরা ভূরু, কপাল, পীঠ পূর্ণ অঙ্গ দেখি । পরমাত্মার বিশ্বরূপ পূর্ণ অঙ্গ আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় । শরীরধারী আমরা বিশ্বরূপ দেখি, মুগ্ধ হই । বুঝি আমি সমুদ্রের বিন্দু ; পৃথিবীতে শোষিত হয়ে সমুদ্রেই মিশি । এই পৃথিবী জলের মধ্যে সৃষ্ট বলে নারায়ণ শব্দটি, (নর-জলজাত মানুষ) অয়ন মানে - ঘর । নানা ভাবে বুঝলেও অবুঝই থেকে যাই ।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, এর কাছ দিয়ে ও যাচ্ছিনা । ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রই আছি কিন্তু বহু আশা আকাঙ্খার মধ্যে তাঁকে না পেলে যেন শান্তি নাই । পরমাত্মা নাই মত মনে হয়, তিনি পূর্ণরূপে স্বীকার ; প্রত্যক্ষ ভাবে, পরোক্ষভাবে, তাঁর সাথে যুক্ত আছি। অভিন্ন জেনেও বিভিন্ন বোধ হয়। প্রাণ-যুক্ত আছে পরমাত্মার সহিত ; তা বুঝি যখন নিজের মধ্যে আকাশ অনুভূত হয় ; মহাশূন্যে আমি চেতনা যুক্ত হয়ে বলে "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচর । তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ " ।

জেনে, না জেনে, মন্দিরে মাথা রাখি ।

কেন না জেনে, আগুনে হাত পড়লে পুড়বেই ; তেমনি মন্দিরে ঈশ্বর ভাবিত হন ; চক্ষু রূপ দেখবেই । আমি অন্তরস্থ প্রাণ, শরীরে আমার রূপ পরিচয় যেভাবে আছে, সেরকম পরিচয় ঈশ্বরের আছে কি না এ হল প্রশ্ন । (ঈশ্বরের পূর্ণ অবয়ব, রূপ আছে কি না) । ব্যক্তি ভাবে - ব্যাক্তিগত ভাবে নাই কিন্তু সার্ব্বিক ভাবে রূপময়, সর্ব্বাধারে ইচ্ছাধীন, সর্ব্বশক্তিমান, (এখানে সকল প্রশ্ন শেষ হচ্ছে) । একি ! কে আমাকে নিয়ে চলে ? কার অঙ্গুলী নির্দ্দেশে, আদেশে, চলেছি ! সত্বাকে - ঈশ্বর জগন্ময় বিশ্বাধার পরমাত্মা ইত্যাদি বহু নামের ভাবার্থ দ্বারা অনুভব দেবার চেষ্টা হয়েছে ।

আমার আধঘন্টা সময় মন্দিরে কাটে। সুন্দর মূর্ত্তিতে স্থির হয় প্রার্থনা উঠে, আমার মনকে মুগ্ধ করে ।

বলত অনুপ, এ কেমন প্রার্থনা? অন্তর প্রার্থনায় যাঁকে দেখি, আমি বিশ্বাস করি - বিশেষ

ব্যাক্তিরূপে আসছেন। কিন্তু আমার প্রতিক্ষা শরীরের প্রতিক্ষার মত হয়ে উঠেছে। শত্রু মিত্র দ্বারা বৈতরনী পার হয়ে শুভ মুহুর্ত্তে আমার প্রার্থীতকে অনুভব করছি ।

আমি চিনতাম, সে কবেকার কথা ; পরিণত বয়সে বুঝছি । বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শূণ্যের আলিঙ্গনে ছিলাম, ঐ বিয়েটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে ছিলাম । আজ আমি হাসতে পারছিনা । অঘটন ঘটে গেলে । মন্দিরে ফিরে এলাম, থাকলাম নূতন-সূর্য্যের প্রতীক্ষায় ।

- আমি ক্লান্ত -

মহাভারতে অভিমন্যুর মত সপ্তরথী বেষ্টিত হয়ে পড়েছি ; অলক্ষ্য হতে প্রশ্নের পর - প্রশ্ন, আমাকে বিদ্ধ করে, আমি ক্লান্ত হযেপড়ি । প্রশ্নজাল হতে বেরুবার পথ পাচ্ছিনা ; আমার দৃষ্টি শূন্যাকাশে, বুদ্ধি পরমাণু পর্য্যন্ত। জ্ঞানী বিজ্ঞানীদেব বিতর্কে আমি বিভ্রান্ত । অজানা ধাক্কা লেগে ফিরে আসি , পরমানুতে বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায়।

অপারেশনের সময় ক্লোরোরফর্ম দেওয়া হয়েছিল, ভাবনা চিন্তা কষ্ট, কিছুই বুঝতে পারি নি। শরীরে চেতনা ছিল না, খুব আরামে ছিলাম কি ? তা ও জানি না । ঐ ভাবে থাকতে খুব ভাল লাগে। সারা জীবন ক্লান্তিতে ঐ বিলুপ্তি যে কি আরাম, ঐ ঘুমের আমেজে আরাম আছে বলেই অনেকে নেশা কবেন, ঐ মাদকতা চান । ইচ্ছা করলে ঐ আমেজ মাদক ছাড়াই নিশ্বাস ক্রিয়ায় অভ্যাস করা যায় । শব্দ, স্পর্শ, রোধ করাব নিয়ম পদ্ধতি জানতে হয । খুব নিরিবিলি থাকতে হয় নাকি ।

জেনেছি ঘুম ও মৃত্যু এক না হয়েও খুব কাছাকাছি আছে । জাগরণে নিঃসঙ্গ হতে কেউ চায়না, কিন্তু ঘুমের জন্য নিরিবিলি স্থান খোঁজে । ঘুম এলেই আরাম পায় । সম্পদশালী মহাসুখী জনেরা ও ঘুম চান, নেশা চান । অনেকে প্যাথেড্রিন নিতে খুবই ভালবাসেন অথচ মৃত্যু বিশ্রাম চান না । মৃত্যু বিষয় জানেন না, ভীত হন দেখলাম। তা ভয় পাবারই কথা, কারণ রোগ যন্ত্রনায় মৃত্যু কেউ চায় না বলে' পবিজন বেষ্টিত পৃথিবীর মাযাময় আকর্ষণ, আলিঙ্গন হতে বিচ্ছিন্ন হতে কেউ চায়না। তা ছাড়া মৃত্যু যে কী, অজানা ভয় ও আছে । বরাবর আমি ছিলাম না ; কখন কোথা থেকে এলাম তাও জানি না। মৃত্যুতে নিথর হতেও অনেককে দেখেছি। জানি, এই মৃত্যু আমারও হবে, তবু বাঁচতে চাই, বিশ্রাম আমেজও চাই। এটা সাধনীয়, কিন্তু অনেকে নেশায় অভিভূত হন, শেষটায় শারিরীক কষ্ট পান তারপর এ জন্মের বিশ্রাম।

— মৃত্যুতে, আমাদের কান্নার কারণ বিস্মৃতি —

চিরদিনের মত হারালাম, তোমার প্রিয়মুখ আর দেখতে পাবনা ; এই মহাবিচ্ছেদ প্রলয়ে তোমার আমার একমাত্র সান্ত্বনা ঈশ্বর পরমাত্মা । এখানে আমাদের সমাপ্তি হচ্ছে। একত্ব প্রাপ্ত হচ্ছি। ঈশ্বরে বোধোদয় হলেও মায়া ত্যাগ হয় না, একক অবস্থায় মন বিরহে ব্যাকুল হয়, তোমার ও আমার চিরবিচ্ছেদ ঘটে । এখানে কোন সংশয় নাই, সান্ত্বনা ও নাই । কিন্তু অনেকে বলেন - স্বপ্নে মিলন-বিচ্ছেদ-হলে-জাগরণে কেউ কাঁদে না । বলতে হচ্ছে মৃত্যুতে কান্নার কারণ

বিস্মৃতি এবং আমি বিরাট বিশ্বে এক ফোঁটে। চোখের জল, নির্ব্বাক একা। সই সুখের ঘরে কেউ ফিরে আসে না যে। যে যায় বিস্মৃতিতে লুপ্ত হয়ে যায় যে থাকে সে হতাশ, মৃত্যু প্রতিক্ষায় বিলুপ্তির জন্য থাকে। দূর হতে শুনি - কারা যেন বলছেন আমরা ঈশ্বরের বিন্দু কণা ; বিন্দুতে সাগর আছে এবং বিন্দুটি তরঙ্গে মিশে গেলে ক্ষুদ্রতা থাকে না। ঈশ্বর মর্ম্মস্থলে সর্ব্বদা আছেন। 'আমি', এই শব্দ ঈশ্বরেব।

আয়ুর্ব্বেদ মতে, শরীর অন্তে বিদেহী শূণ্যে অবস্থান করে এবং তার অপরিতৃপ্ত বাসনা - পূনর্জন্ম ঘটায়, কিন্তু এর প্রমাণ নাই। যুক্তি বোধহয় আছে। দেখা যায় - সহসা কোন কিছু উৎপন্ন হয় নাই, লয় ও ক্রমে ক্রমেই হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে বলা হয় - চেতনা ক্রমে বিলীন হয় এবং আকাশে স্তর আছে। বিজ্ঞানীবা বলেন - ওযেভ। আজ যা বলা হল, গাওয়া হল, তা সুদীর্ঘকাল থাকে নাকি ; বিটোফেনের সঙ্গীত রেকর্ড করা হযেছে তা প্রবাদেব মত শোনা যায়। শব্দ যেমন থাকে - চেতনাও থাকে, ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়। জীবনকালেই তা প্রমাণ হচ্ছে ; বার্দ্ধক্যে স্মৃতি শক্তি হ্রাস হতে থাকে।

ভারতীয় মতে - পিতৃলোক, দেবলোক, ব্রহ্মালোক, এই তিন স্তর উল্লেখ হযেছে। যতক্ষন পৃথিবীর আকর্ষণে থাকে ; চেতনা থাকে পিতৃলোকে। দেবলোকে গেলে মোহ থাকেনা। ব্রহ্মালোকে চেতনা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়।

গীতায় বলা হয়েছে - "দেহি নোস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীর স্তত্র ন মুহ্যতে ।।,

তা বলে কি দুঃখ হবে না ?

অনেকে বলেন - দুঃখ কে রেখে উড়িয়ে না দিলে দুঃখের কবলে থাকতে হবে। কেউ বলেন - সুখ দুঃখ সাময়িক অবস্থা। সুখ চিরদিন থাকেনা, দুঃখ ও থাকে না। কেউ বা বলেন - সহ্য কবতে হয়, অধৈর্য্য হতে নেই। ইত্যাদি উপদেশ আমরা শুনে এসেছি। উপরোক্ত ভাবে ছলে বলে দুঃখ এড়ান যায় কি ?

তা কিছুক্ষন এসপ্রিন খেয়ে মাথা ব্যথা তাড়ানো মত নয় ত ?

সুখ - দুঃখ মনের আনাচে কানাচে থাকেই, জীবনের সাথে, সাথে, চলতে থাকে।

মৃত্যুশোক সহ্য করতে আমবা বাধ্য। এটা কি ধৈর্য্য ? এত উপদেশ কেন। কান্নাত ক্লান্ত হয়ে আপনি থামে, হাসি ও সর্বদা থাকছে না ; দুটাই আমাদের ইচ্ছার বাইরে। যতদিন কাঁদতে পারে কাঁদুক্, হাসতে পারে হাসুক ; আপত্তির কারণ ত নাই।

আশ্চর্য্য হচ্ছি - কেন আমরা ধৈর্য্য প্রার্থনা করি ! সহ্য ত করতেই হচ্ছে ; বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করতে আমরা বাধ্য। অকাল মৃত্যুও হয়। যারা অকালে যায় - তারা ইচ্ছা করে যায় নি। এই বাধ্যতার নামান্তর কি ধৈর্য্য ? এখানে ধৈর্য্যটা কি দুঃখ জনক পরিহাস নয় ? আমরা নিরুপায়, জ্বালাময় সত্যের সম্মুখীন হতেই হয় ; অনন্ত বিচ্ছেদে সান্ত্বনা কোথায় !

বেঁচে থেকে প্রিয় বিচ্ছেদ ভুলতে হয়, যন্ত্রের মত জীবন বহন করি। সময়োচিৎ ভাবে চলতেই হয় ; এ স্থলে উপদেশ গুলো অর্থহীন। "নমুহ্যতে" তা প্রকৃতিগত ভাবে ঐ কথাটা মানতেই হচ্ছে ; তাই আমরা দেখছি - কিন্তু স্বইচ্ছায় ভুলে যাইনি সহ্যমানও থাকি না।

একজন কবি লিখেছিলেন " কাঁদিতে পার গো যদি - চিরকাল নিতি নিতি, এস তবে এস সখা - দুজনে করি পিরিতী । ঐ কবিতা পড়ে হেসেছিলাম ; আজ হাসতে পারছিনা । বুঝতে পারছি -প্রেমই কাঁদায় । তাই কবি বলছেন - চিরকাল জন্ম, জন্ম, কাঁদবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এস । শোক সন্তপ্ত জীবনে অশ্রু শান্তি যে কি, যারা তা জানেন, তাঁরাই বলেন কাঁদতে, অশ্রু সম্বরণ কর বলেন না ।

বুকটাকে মোচড় দিয়ে দু এক ফোটা চোখের জল যখন পড়ে - তা যে কত শান্তি , ঐ টুকু শান্তিও যাব নাই, কাঁদতে পারে না, সে মানুষ যন্ত্রের মত হয়ে উঠে । সুখ শোক নাই, ভাল-মন্দ নাই, এমন অবস্থায় মন নির্ব্বিকাব - পাথরের মত ঋকা হারায় । ঐটাকে ধৈর্য্য বলা যায় কি না ভেবে দেখ - অনুপ ।

সন্ন্যাস বলা যায় কি ? ঠাট্টা করছিনা, চিন্তা করছি -ধৈর্য্য মানে কী ? কী বুঝব ? একটা নিয়মের মধ্যে সংযত করে জীবন রাখতে হবে, নিয়মে থাকতে হবে, খেতে হবে, কিন্তু কেন, কিসের জন্য ? ক্লান্ত যখন হব - ঘুম আসবে, ক্ষিদে পেলে খাব, কান্না যদি আসে কাঁদব, হাসি পেলে হাসব । ঐ টুকু স্বাধীনতা কি আমরা পেতে পাবি না ? কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে ঘুম, ক্লান্তি অপেক্ষা করে, হাসি ও তাই, এর কারণ থাকে । রাত থাকে ভোরের অপেক্ষায , সময় কার অপেক্ষা করে ?

ধৈর্য্যের কথা বাদ দিচ্ছি ; বলছি ধৈর্য্যের পরিণাম। ধৈর্য্যচ্যুতদের আমরা পাগল বলি; পাগল নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারেনা , এর কারণ কি জান? কারণ হল - আত্ম সম্বরন ধৈর্য্য । অতি ধৈর্য্য, সহ্য করে, মনকে সংযত রাখতে গিয়ে জীবনটা যখন রক্তাক্ত হয়ে উঠে, তখন নার্ভ গুলো বিদ্রোহী হয়ে উচ্চ গুম্বুজটি ভেঙ্গে দেয় ; শত চূর্ণ ধৈর্য্য চিৎকার করে খান খান হয়, হাত পা ছুড়ে, অবশেষে জ্ঞান হারায় । কোন কিছুই তখন আয়ত্তে থাকে না ; বিশ্বে মানুষ পাগল হয়ে যায় ।

"শত গর্ব্ব অভিমান, চূর্ণ আজি শত খান,
শূণ্য ঘরে রিক্ত আত্মা করে হাহাকার ।"

হায় রে ধৈর্য্য ! এই যদি এর পরিণাম হয় - বলতে হচ্ছে মানুষের ধূলী ধূসর জীবনে শতধারায় কান্না নেমে আসুক ।

গম্ভীর ভাবমূর্ত্তি ভাল, বৈরাগ্যের মুখোস ত্যাগ করে, কেউ যদি গড়া গড়ি করে কাঁদে, আপত্তি কি ?

কাঁদ অনুপ, কাঁদ, যতক্ষন কাঁদতে পার কাঁদ : সমাজে সুখ্যাতি, লোক নিন্দা ভদ্রতা, মৃত্যু ভয় ওসব ত্যাগ করে কাঁদ । মরতে যদি ইচ্ছা হয় মর, সে ও ভাল ; নিজেকে বঞ্চনা করনা ।।

ঈশ্বর ভক্তি বড় কঠিন

আমি ছোট বেলা হতে ঈশ্বর শব্দ শুনে এসেছি । বহু জ্ঞানী গুনীদের ভাষণ বর্ষিত হয়েছে। ঈশ্বর ব্যাপ্তিতে সবাইকে আত্মীয় মনে হলে ও শ্রদ্ধা ভক্তি ভাব কেন যে আসেনা, এটা ভাবি।

অজানা অদেখা ঈশ্বর, তা আমার দরিদ্র মনের সম্পদ, ভাষা নাই তা প্রকাশ করি । জানি না, কেন এত ভালবাসি কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ রূপ ; আমি আঁকি তাঁর ছবি । শিশু কাল হতে আমাকে নিয়ে এসছে এমন একস্থানে যেখানে - দুঃখ, অপমান. শোকতাপ দারিদ্রতা নাই । সব ভুলিয়ে, অতন্দ্র প্রহরীর মত, জননীর মত, রক্ষা কবজের মত. একান্ত আমারি প্রিয়, আমাকে আগলে রেখেছে। আমার জীবনটাকে সর্বদা সুরভিত রেখেছে । আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি ; ভক্তিতে লুটিয়ে পড়তে পারলাম না । সর্বরূপে ঈশ্বর জেনেও শ্রদ্ধা হয় না । ভালবাসি অনেককে, তা ও নির্বিচারে নয় ।

যখন দেখি - শ্রদ্ধা ভক্তিতে, ব্যাক্তি বিশেষের পায়ে কেউ লুটিয়ে পড়েছেন, নিবেদন করেন ধন জন মনে, জীবটা ও তুলে দেয় ; তা দেখে শুনে অবাক হই । একি ! এমন অবস্থা হল কেন! কীসের জন্য ? এঁর কাছে ইনি কী চান, কী পান ? এতই কি নিঃসঙ্গ ? নিস্ব ? শান্তি পেলেন কি ? নিশ্চিন্ত হলেন কি ? তবে - কাঁদেন কেন?

তবু ওটা মেয়েদের কিছু সাজে ; কিন্তু ঐ পুরুষ গুলো? আরদ্ধ যদি ঈশ্বর হয়, একজন ব্যাক্তিকে তিনি সর্ব্বশক্তিমান মনে করেন কেন? যদি সর্ব্ব গুণান্বিত - রোগশোক রহিত নির্ব্বিকার হতেন, শ্রদ্ধা জাগত কি আমার ? ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি হল না, শুধু ভালই বাসলাম । তাই - ভক্তিটা সব চেয়ে কঠিন মনে হল । আমার অভক্তির জন্য আমি খুব দুঃখিত আছি। ঐ নির্ব্বিকার কৃষ্ণ মূর্ত্তিকেই ভালবেসে মুগ্ধ আছি । মহাভারতের নায়ক, ভাগবতের প্রেমিক, গোপীদের বল্লভ, আমারও বল্লভ । শ্রদ্ধা নয়, ভক্তি নয়, কেবল ভালবাসি, আব্দার তুলি । পরম পুরুষের প্রতি এ বিদেহী নারীর ভালবাসা ।।

প্রতিক্রিয়া

গৃহ বন্ধন স্বীকার করে গৃহিনী হয়েছিলাম , মনের শূন্যতা পূরণ হল না । একটা ছেদ থেকে যাচ্ছে । সামনে খোলা জানালা দিয়ে দেখি মন্দির চূড়া ; দেখি - খোলাদ্বার, মূর্ত্তীতে আমার মন স্পন্দিত হতে চায় ।

"লক্ষণের গন্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাও? কেন বাপু লঙ্কা কাণ্ড বাঁধাবে ? সীতাকে উদ্ধার করতে - রাম আসতে পারেন, সেই ত আবার বনবাস ।"

ছি ছি অনুপ, তুমি হাসছ ? এ কি হাসির কথা ? "তোমার ভক্তিমতী সঙ্গিনীকেই জিজ্ঞাসা করনা কেন ! শান্তি পেয়েছেন ? মনে কি কোন প্রশ্ন নাই ? আশা, আকাঙ্খা, অভিযোগ নাই ? ঈশ্বরকে পেলে সকল চাওয়া - পাওয়া শেষ হয়, এই ত ?

দেখেছ ঈশ্বরকে ? দেখ্তে কেমন ? শালগ্রাম শীলার মত নয়ত? ঈশ্বর কি পাবার বস্তু বিশেষ? অথবা ব্যক্তির মত তাঁকে ছুয়া যায়, কিছু বলা যায়, মনে অভিমান করে ঝগড়া করা যায় ? যে - যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই দেখেছেন ।

তবে ত বলতে হবে -.ঐ গুরুদেবরা চেয়েছেন, পেয়েছেন। গল্পের মত শোনা কথা আরো অনেক আছে, প্রমাণ কি সত্য তার? তুমি তোমার মনের রূপই দেখনি ? সেবা পূজায় মনের

আকাঙ্খা দেখা যায় । লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, গনেশ পূজা আদি সবই আকাঙ্খা নয় ? তবে এ সত্য - যে যা চায় তা পায় যদি একাগ্র নিষ্ঠাতে চাইতে পার ।

তুমি ত মনের মত মূর্ত্তীকে যা পরাতে চাও তা পরিয়ে 'আপন ভাবে' যা খেতে ভালবাস, তাতে নৈবেদ্য সাজিয়ে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা কর, এ - মনের পূজা নয় কি ? এতে মন তৃপ্ত হয়, কিছুক্ষন মন ভোলান যায় ।

অনুপ, আর একদিক দিয়ে চিন্তাকরে দেখ - যা ভালবাসি সব উজাড় করে দিয়ে - আমি চাইছি শুধু পরিতৃপ্তি ? ভালবাসার আগ্রহে নিজেকে নিবেদন করার আনন্দ কি নেই ? "কিন্তু কাকে নিবেদন করবে, যে অনুভবে নেই, দৃষ্টির বাইরে যে অসীম, তাঁকে ভালবাসা - কেমন পাগলামির মত নয় কি ? আছে - ভালবাসার প্রতিধ্বনী ?"

আছে, আছে, তা রিফ্লেকসন বা প্রতিক্রিয়া বলতে পার। ঈশ্বর যাঁকে বলি, তিনিই সান্ত্বনা । অবিচ্ছিন্ন হয়ে - তুমি আমি একসঙ্গে থাকব । "ভুল বলছ, এক হয়ে যাব বল" ।

"ভেবে দেখ - এখন কি আমরা এক সঙ্গে নাই ? সাগরে লহরি মত তরঙ্গ তুলে সবাই আছি, আছড়ে পড়ছি, আঘাত পাচ্ছি। তোমার-আমার ভালবাসা বিনিময় না হলে বিরহের অবসান হয় না ।

এ কেমন কথা? এই যে দুজনে ভালবেসে দেখছি, একি মিলন নয় ? কিন্তু অবাঞ্ছিত রূপে, অবস্থিত ভাবে কোন কিছুই চাই না । আমি আমার বাঞ্ছিত প্রিয়কেই ভালবাসি, তাঁরই আদর যত্ন চাই । আমার আদর যত্নেই তার আদর যত্ন পাই ।

"আমি তোমাকে ভীত এস্ত হতে দেখেছি, লাঞ্ছিত হতে দেখেছি, বল এটা কী ?"

কর্ম্মফল সকলকে ভোগ করতে হয় । অসহ্য যন্ত্রনায় হাত পা ছুড়ে যারা যন্ত্রনা দেয - যন্ত্রনা পায় বলে । এখানেও আমি দুঃখিত নই । বেশ মজাই লাগে । আমাব আঘাত সহ্য করতে ঈশ্বর পারেন না দেখলাম । আরো নিবিড় হয়ে আসেন ; কিছুক্ষণের জন্য ও কাছ ছাড়া হন না।

কাঠগড়া

আজকের লেখার বিষয় হল - আমার প্রবাহিত জীবনের বিচার । চলার পথে যাদের ফেলে এসেছি, সঙ্গে যাঁরা চললেন, প্রতীক্ষায় যাঁবা আছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে বিচার করা যায় না । 'ধাবমান গতিবেগে চলে এসেছি' লোকে তাই বলে । এখানে একটা কিন্তু আছে । পথে যেতে হোচট খেয়েছি, কখনো বিশ্রাম নিতে হয়েছে, কখনো ধূলী খেলায় মেতেছি । তবু চলার বিশ্রাম ছিল না । আজ কিছুক্ষন কাঠগড়ায় দাড়ালাম । আমি সামাজিক প্রসাধন আড়ালে থাকি নি ; সত্য মিথ্যায় জড়িত নই, কোন স্বাক্ষী সাবুদ প্রয়োজন হচ্ছেনা । আমি ভীষণ সত্য। বেসুরা গায়ক ; কুখ্যাত-অখ্যাত শিল্পী, অপরিণামদর্শী ; আত্মঘাতী মানুষ আমি । আমাকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না, জেলেও রাখা যাবেনা, কারণ জেলেতেই থেকে অভ্যস্ত, এ এমন কোন নূতন নয় । এমন কোন শাস্তি যে আর নেই যা দেওয়া যায় । আমার বিচার করতে - বিচারকরা কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন । এ আমি সইব কী করে । প্রিয়জনরা হতাশ চোখে

আমার দিকে চেয়ে অশ্রু বিসর্জন করে ; এ আমি সইব কি করে ?
ধর ধর, প্রভূ আমায় ধর ! এ কূল ওকূল দুকূলই আমার নাই। দুর্ণিবার জলে আমি ডুবে যাচ্ছি। কেন আমার আঁধার ঘরে আলো জ্বেলে দিলে ?
সর্ব্বনিয়ন্তা তুমি, উচ্চ শিখর হতে আমায় ফেলে দিয়েছ, শত ধারায় আমি যে নেমে এসেছি! হে ধরিত্রী, তোমার বুকের তৃষ্ণায় আমাকে শোষন কর । সহ্য কর, আমার পতন বেগ । ক্ষমা কর আমার দেওয়া আঘাত ; আমাকে ক্ষমা করবার যে কেউ নেই । মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে যাঁরা পারে না, তাঁদের ও তুমি ক্ষমাকর ।
অনুপ, অনুপ, আমি আবার চললাম, ঘরে যে মন বসলনা । জানি না কোথায় যাব, যাওয়াটাই আসল কথা, তা স্বর্গেই হোক্ বা জাহান্নামেই হোক্ । পেছনে যাদের ফেলে যাচ্ছি, আমার প্রিয় জনদের জন্য দুঃখ হয় । হায়রে আমার গর্ভ ধারিনী মা ! গর্ভ যন্ত্রনাই পেলে, ধরিত্রীর মত সহ্য করলে অনেক দুঃখ!
আমি সহ্য করব না, যা আমার প্রাপ্য, তা আদায় করে নেব । গুপ্তঘাতকদের শাস্তি পেতে হবে।।
"আদায় তুমি ঠিকই করেছ ; কিন্তু কৈ - শাস্তি দিতে পেরেছ ? যেতে পারলে জাহান্নামে? যেতে পারলে - স্বর্গে ?
মেতে উঠেছ ধূলি খেলায়, তবু পরাজয় মানতে চাওনা । তোমার কিসের গর্ব্ব, যার জন্য মাথা তুলে দাঁড়ালে ?
অনুপ, আমার মাথা থাকলেত মাথা তুলব ? আমি ধূলিতে মিশে গেছি কিন্তু অনেকে আমাকে গর্বিত মনে করে । তুমি নিশ্চয় ভূল করবেনা । আমাকে মাড়িয়ে বিভোর যায় নি । একে, একে, সবাই গেছে ; আমি পথ চেয়ে আছি, মাথা তুলিনি । যাঁরা থাকলেন - আমার পায়ের কাছে, তাঁদের জন্য দুঃখ হয় ; ওরা এমনিতে দুঃখ পাচ্ছে, মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে পারিনি। আসামীর মত ওদের কাতর চোখ - , আমাকে হার মানতে বাধ্য করেছে । আমার ভাগ্যের জন্য ওদের দায়ী করলে আমার দুঃখ মোচন হবে না । হে ভগবান, আমাদের দুর্ভাগ্য ক্ষমা কর। কারুর বিরুদ্ধে কিছু বলার নাই ; ঐ হৃদয়হীন মূর্ত্তীর দিকে চেয়ে থাকি । কি অদ্ভুত ! এই মূর্ত্তির সাথে আমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ; সুখের হলনা । আজো প্রতিক্ষায় আছি কে যেন আসবে ।
আমার জন্ম, জীবন, কর্ম্ম, কোনটার সাথেই সঙ্গতি রেখে চলতে পারি নি ; সকলেই কি তা পেরেছে ? কোথাও কি কোন অসঙ্গতি ব্যতিক্রম হচ্ছে না ?
কেউ বলতে পারে - সমুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হয় না, ওখানে আর ফুল ফুটবেনা ?
পা যেমন আগে পিছে হয়ে এগিয়ে যায়, অনেকটা সেরকম এগোচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে আছ। অনুপ, তুমি আমার বিচার করবে ?
হায়রে - এত মমতা নিয়ে কী বিচার করবে । বিচারককে যে পক্ষপাতশূন্য হতে হয় । এর চেয়ে স্বীকার কর - তুমি আমাকে ভালবাস । ভালবাসলে দোষ থাকে না, এ হল ভালবাসার মহিমা ; কি বল, কথাটা সত্য বলিনি ?

ভাবনা

"চির দিবস ভেল, হরি রহল মথুরা পূরী,
অতয়ে হাম বুঝয়ে অনুমানি প্রাণ প্রিয় আর আসবেনা" ।

বৈষ্ণব কবির গান গাইতে গিয়ে "চির" কথাটি আমায় ভাবিয়ে তুলল । বস্তুবাদীর জন্য চির শব্দটি মরণ কাল পর্য্যন্ত, আত্মবাদীর চির - সুদূর প্রসারী সীমাতীত কাল, অশেষ কাল। জন্ম জন্ম হতে প্রবাহিত। এই চির দিবসের শেষ নাই, চির বিরহেরও শেষ নাই । অহরহ কথা মত যুগ যুগ ধরে তা চিরদিনের । গেলে আর ফিরে আসেনা, আস্তিক নাস্তিক সবাই যায়, প্রাণ প্রিয় ফিরে আসেনা বলেই কাঁদেন । জীবন প্রবাহে সবই যায়, সেই রূপ, সেই মিষ্টি হাসি, নিয়ে ফিরে আসেনা বলেই কাঁদে ; এখানে তর্ক নাই সবাই কাঁদি ।

বৈষ্ণবের প্রাণ প্রিয় - বৃন্দাবন চন্দ্র কৃষ্ণ ; যিনি একান্তভাবে আমাদের ; অক্রুর তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন ; ভাগবতে বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যাব না । আমরা ব্রজবাসী পথিক, পথিকা, পথেই আমাদের বাস, কৃষ্ণ আছেন - সাথে সাথে । তবু প্রেম তাঁকে খোঁজে ; তিনি মথুরায় রইলেন বলে কাঁদেন হতাশায় কবি । বৃন্দাবন হতে মথুরা বেশী দূর নয়, তবু মন কাঁদে - প্রাণ বল্লভকে রাখতে পারলাম না বলে ।

শতরূপে লীলাময় চঞ্চল প্রিয়। লুকোচুরি খেলার মধ্যে— সহসা ঝলক দিয়ে, মুহূর্তের চমক দিয়ে গেলেন। সেইক্ষণকালের মধুস্মৃতি চিরবেদনায় কাঁদে। কবি, কৃষ্ণকে বিরহী করেন, রাধা প্রেমে- কৃষ্ণকে ব্যাকুল করেন, " সজনী ভাল করি পেখন না গেল মেঘ মালা সনে তড়িৎলতা যেন হৃদয়ে শেল দিয়ে গেল।"

তড়িৎ লতামত আরাধিতার রূপলাবর্ণী, শেল সম আঘাত দিয়ে গেল (বিরহ সৃষ্টি করে কৃষ্ণকে ব্যাকুল করলেন।) চিরদিন কিছুই থাকেনা, চোখের জলে আঁকা জলছবি - বাষ্প চোখে দেখি। চোখে পড়ে- শূন্য আকাশ। যন্ত্রনা মাত্র থাকে।

রাধাকৃষ্ণ প্রেম স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে আছে, মিথিলার কবিরা- রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহ, জীবনছন্দে ছন্দিত করে তুলেছেন। ভাগবতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমাদের কুঞ্জে বাঁশী বাজান। এত মনোহর রূপ ভুলা যায় না। ধারাগত হয়ে যমুনা প্রবাহে অসীম সুন্দর যে চিরকাল আছেন। তাঁরি জন্য চির প্রতিক্ষায় আমরা থাকি।

(আজ আর গান গাওয়া হল না) " ভাবিতে ভাবিতে, জনম গেল ; প্রাণপাখী তোমার অন্ত পেলাম না" এই বাউল গান অনেকে গেয়ে গেছেন। আমিও তা গাইব নিশ্চয় কিন্তু নিরাশ হব কি?

আর একদিন, আবার আর একটা গান শুনে ভাবনায় পড়লাম।

" দ্বিভুজ মুরলীধারী, দেখা দাও হে প্রাণহরি"

দ্বিভুজ বলায় হাসি পেল 'পরোক্ষে আরো যেন হাত আছে'।

তক্ষুনি- শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, সময় চক্র, গদাশক্তি, যিনি ধারণ করে আছেন ; আমাদের মধ্যে তাঁকে আপন ভাবা যায় না, তাই কি- ভক্তরা ভজনা করেন দ্বিভুজমুরলীধারীকে? ভক্ত,

ভগবানকে সহনীয় রমনীয় ভাবে - পেতে চান পরমাত্মীয় মত। গীতাতেও অর্জুন বলছেন -

অদৃষ্ট পূর্ব্বং হৃতোস্মি দৃষ্টা
সেয়েনচ প্রব্যথিতং মনোমে।
তয়েবদেব দর্শয়ে দেব রূপং
প্রসিদ প্রসিদ জগন্নিবাস।।

জগৎনিবাসী মানুষের মধ্যেই প্রকাশ পান, বিশেষ বিশেষ সময়ে লক্ষনীয় হন। আমাদের দুর্গত অবস্থায়, আমাদের আগ্রহে, বিশেষ মানুষ প্রকাশ পান ; আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করি, স্বীকার করি অবতারবাদ। মানুষ, ব্যক্তিকে স্বীকার করেই। মানুষেই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় বিশেষভাবে। যাদের আমরা চোখে দেখি নাই, তাঁদের অমৃতবাণী আদর্শ আমবা অনুসরণ করি, স্মরণ করি তাঁদের।

পুরাণ গ্রন্থাদি ও ইতিহাসে আমরা জেনেছি - আমাদের চরম অবস্থায আলোকধারী ব্যক্তি আমাদের ভাঙ্গা ঘরে জন্মগ্রহণ করেন আবার যখন কংস কারাগার সৃষ্টি হয়।

মানুষের অবনতি শুধু থাকা খাওয়া অভাবে হয়নি। যখন সহজাত ধর্ম ভিত্তি 'মানবতা' সভ্যতা নড়বড়ে হয়ে উঠে, আদর্শ শিক্ষা রক্ষা করে চলতে পারে না, নির্লজ্জ পশু প্রবৃত্তি হয়, তখন সংঘাত হওয়াতে- এর পরিণাম অত্যন্ত গর্হিত ভাবে অশান্তি সৃষ্টি করে, এতে আত্মস্থ চেতনায় আলোর উন্মেষ দেখা যায় ; আলোকধারী জাগ্রত হন। ঐ ব্যক্তিই মানবভিত্তি দৃঢ় করে শান্তি স্থাপন করেন।।

মন্দির ও ঈশ্বর

পুরাকাল হতে দার্শনিক যুক্তি, বিশ্বাসে, ঈশ্বরই ধর্ম্মের ভিত্তি। ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করে মন্দির গীর্জ্জা মসজিদ গড়ে উঠে। একমাত্র ঈশ্বরই প্রভু জেনে, শত শত মানুষ নত হয়ে মন্দিরে নম্রভাবে প্রবেশ করে প্রার্থনা জানায়। এখানে ধনী, গরীব, রাজা প্রজা প্রশ্ন নাই, ভেদ নাই। মন্দির আকৃতিতে পার্থক্য দেখা গেলেও ঈশ্বর, আল্লা, গড, এককেই বোঝায়। তিনি সর্বনিয়ন্তা প্রভু।ব্রহ্মবাদ- অদ্বৈতবাদ (একঈশ্বরবাদ)।ব্রহ্মব্যাপ্তীতে যাঁরা বিশেষভাবে দৃষ্টি গোচর হয়েছেন, তাঁরা জনসমাজে আমূল পরিবর্তন এনে- শান্তি বিধান করেছেন ; তারাই আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাদেরই অবতার বলা হয়, ঈশ্বরের দূতও বলা হয়।

ঈশ্বর স্বীকৃতিতে মন্দির মসজিদ গীর্জ্জা গড়ে উঠে, মন্দিরে মন্দিরে, আরতি আলোয় ভজন সঙ্গীতে ঈশ্বরের জয়গান কীর্ত্তন হয়। মানবাকারে ঈশ্বর প্রতীক স্থাপিত হয়ে - মাল্যে ভূষণে বিভূষিত করে পূজা হয়। শ্রদ্ধার সাথে প্রেম যুক্ত করা হয়। শক্তিমান প্রভু- পিতামাতা বন্ধু প্রিয়তম ভাবে ভাবিত হন হিন্দু মতে। শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় যশোদার বাৎসল্যে, সখা বন্ধুদের প্রীতিতে, ও প্রেয়সীর ভক্তিতে।

রাধাকৃষ্ণ সুর ও সঙ্গীতের মত অবিচ্ছেদ্য ; বৃন্দাবনে যুগলরূপ পূজা হয়। বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ,

শাক্তদের মা ও সন্তান, এখানে দ্বৈতভাব আছে। বিভিন্ন মতবাদ আছে, কিন্তু কোন কিছুই ব্রহ্মের বহির্ভূত নয়। সবার মধ্যে সে, তাঁর মধ্যে সব, এ হল ব্রহ্মবাদ (ইহা অভেদ বাদ)। মন্দিরে ভক্ত ও ভগবান থাকায় উৎসব আনন্দ আছে, সঙ্গীত আছে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আছে। স্নানাদি শুদ্ধ থাকার ব্যবস্থা নিয়ম বিধান যেমন আছে, ফুল চন্দন মাল্যদ্বারা সুরভিত রাখার ও বিধান আছে ; এতে শরীর মন উজ্জ্বল থাকে। পবিত্র ভাবোদয় হয়।

একটু দূর থেকে ভগবানকে দেখা ও অনুভব করাই শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রার্থনায় শোনা যায়। ব্রহ্ম মতে ধর্ম্ম ত্যাগ হয় না। সর্ব্বত্র আমি, সবই আমার, এই ভাব-ভজন থাকায় আল্লা বললেও আমি। গড বললেও আমি, কৃষ্ণ ভগবান বললেও আমি। ব্রহ্মবাদ সর্ব্বজনীন। স্বব্রহ্ম প্রকৃতিতেই মানুষ প্রার্থনা করে। মানুষের ধর্ম্ম (স্বভাব) ত্যাগ হয়না। ব্যক্তিরূপে, ব্রহ্মগোপাল শ্রীকৃষ্ণকে আমরা পাচ্ছি আমাদের মধ্যে। তাঁর বাণী আমাদের আশ্বাস দেয় (আমরা গীতা অনুসরণ করি।)

ইহুদিরাও প্রতীক্ষায় থাকেন বলে শুনি........................।

মানুষের ধৈর্য্যই মানুষকে প্রতীক্ষা করায়, মানুষই আশা পোষণ করে। মানুষেই ভগবানের আবির্ভাব হয়।।

যোগাযোগ

বিশাল বিশ্বে মন্দির-মূর্ত্তী একটা সুন্দর বিন্দু। বিগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ হয় ঈশ্বরের সাথে। কৃষ্ণ মূর্ত্তী চির নবীন সুন্দর, মন তাতে আকৃষ্ট হয়। ভাবাপন্ন হয়ে, মন ও শরীরে মাত্র ক্রিয়া করে না, জীবন মধুর করে। বার্দ্ধক্য পীড়া দেয় না।

কালীপূজার বিধান ভারতে আছে ; তা ভীষণ সত্য সহ্যকারে, জন্ম-মৃত্যুতে বিচলিত হয়ে ও বীরাচারে উৎসব পালন করা হয়। মন, নিশঙ্ক শিশুর মত, মা'র কোলে থাকে ; ভীত হয় না। ঈশ্বর , আল্লা, গড যে যা বলে - শ্রদ্ধার সহিত বলে। শ্রদ্ধার স্বভাব সদ্ আচরণ, সদ্‌ভাব-ভক্তি।

মূর্ত্তীর গোপন রহস্য হল - তা মাইক্রোফোনের মত যন্ত্র না হয়েও শব্দ বহন করে। যেমন প্রতিফলিত হয়ে রূপ দেখা যায়, তেমনি- প্রতিহত হলে শব্দ শোনা যায়। ফাঁকা জায়গায় ক্ষীণ শোনা যায়। মূর্ত্তির মুখোমুখি উচ্চারিত শব্দ স্বঅন্তর প্রার্থনা, সহজে অন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং তা সার্থক হতে থাকে, প্রার্থী সন্তুষ্ট হয়।

দর্পনের সামনে দাঁড়ালে রূপ প্রতিফলিত হয়, সেরকম - মন্দিরের মূর্ত্তীতে ঈশ্বর স্মরণাতীত থাকেন না। শালগ্রাম শীলা ও মন্দিরে থাকে, সর্ব আকারে ঈশ্বরই পূজিত হন। মন্দিরে মূর্ত্তী শত শত লোকের মনে ঈশ্বর ভাবনা সৃষ্টি করে আছে। বিশ্বাস অবিশ্বাস, উভয় অবস্থাতেই ভগবান নিজ মহিমায় আছেন। তিনি স্পর্শাতীতও নন, সর্বদা ভাবে থাকায় জানতে পারছিনা, ভুলতেও পারছিনা।

বিশ্বময় রূপ যা আপন অন্তরঙ্গ ভাবা যায় না, মূর্ত্তীতে তা 'বিশ্বময় বিচ্ছুরিত রূপ' সহনীয়,

রমনীয় হয়ে উঠে। বিশ্বের প্রতীককে মন আলিঙ্গন করে। নত হয়ে প্রণাম করে। মৃত্তী, মাথা রাখার বিশেষ সুন্দর আধার। আমরা মাটির সন্তান মাটিতে আছি, মাটিতেই দেহাবসান হয়; জন্মভূমিতে ঈশ্বর রূপ গড়ে পূজা করি।

মাটির আকর্ষণে আমরা সবাই আছি। মাটির মৃত্তীতে ঈশ্বরকেই স্মরণ করি। বৈষ্ণব সাধুরা সাষ্টাঙ্গে মাটিতে মাথা রাখেন।

ভাবাবেশে ভক্তিতে অনেকেই তা করেন এবং বলেন -ঈশ্বরে আত্মসমর্পন কর, নিজেকে নিবেদন কর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন- " তোমার ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমাব জীবন মাঝে"। কবির ঐ স্তরে না গেলে সবাই ঐ কথা বলতে পাবেন না।

বিশ্বেশ্বর, বিশ্বাধার যিনি, তাঁকে দেবার কিছু নাই, একমাত্র আমার শরীর চেতনায় আমি সমর্পিত হই। তবে এখানে একটা কথা আছে, তা হল- আমি। ওতে তরঙ্গ আছে, ঢেউয়েব পর ঢেউ উঠে, (আবেগ আছে, আকাঙ্খা আছে) তা যদি ব্রহ্মে স্থির হয় শরীর ক্রিযা বাঘাত হতে পাবে। শরীরে মন না থাকলে শরীব রক্ষা হয় না।

তোমাব ইচ্ছাই করহে পূর্ণ......, ইহাই সমর্পন। এতে জীবন সার্থক হয়।

ব্রহ্মাবাদী সন্ন্যাসীরা বলেন আমি অভেদ ব্রহ্ম। মহাজনদের পদানুসরণ করে বলছি বিশ্ব-ব্রহ্মের পূর্ণাঙ্গতা ওতে পৃথিবীর উৎপত্তিতে আমরা আছি। সহজে কেহ শরীর তাগ করতে রাজী নই ; লীলাময়ের লীলাতে মুগ্ধ আছি। চাওযা ও আমাদের শেষ হয় না জীবনটাই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে বলে মনে হয়।

আনন্দ পরিতৃপ্তির জন্য যদি ব্রহ্মে লীন হয়ে পড়ি- আমি লুপ্ত হয়ে যাব। আবার উল্লেখ করতে হচ্ছে - লাভ বলে তা গণ্য হবে না, ডুবেই গেলাম। আমি না থাকলে আমার কিছু নাই। পাবারও নাই, দেবারও নাই।

ব্রহ্ম ভাবাবেশে নিঃস্পন্দ, সঙ্গ-রহিত হচ্ছে, ঐ অবস্থায় মগ্ন হওয়া যায় বটে কিন্তু জীবনগতি রুদ্ধ হয়।

পরমাত্মা আছেন এ যদি স্বীকার করি, এও মানতে হয় যে- শরীর বাদ দিলে আনন্দ প্রকাশ পেতে পারে না। যারা সুখ দুঃখে সচেতন, তাঁরা জীবনে আনন্দ লাভ করে, দুঃখ ও গ্রহণ করে, এ ও খেলাঘরে জগৎ খেলা ; অণুকরণ নয়।

" অখন্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচর।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।"

এই প্রার্থনায় আলো আছে, ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে, যোগাযোগ হয়। আমি প্রার্থী, তুমি প্রার্থীত বন্ধু ; বন্ধুকে অবলম্বন করেই মন একাগ্র হয়, অগ্রসর হয়। চাইতে হলে এখানে চাও একাগ্র হও।

অনুপ, তুমি বিশ্বের পরিপূর্ণতায় সিদ্ধি লাভ কর, গ্রহন কর শুভেচ্ছা।

সমগ্রে যাঁর ক্রিয়া প্রকাশ আছে (বিশ্বরূপে) তোমাকে- আমাকে, বাদ দিলে বিশ্বরূপ সম্পূর্ণ হয় না।

সবার মধ্যে যিনি আছেন তাকে বলা যায় "রক্ষা কর"।

মূর্ত্তী হল - ধ্যানের অবলম্বন, নিরলস বাঁশী বেজে চলেছে। অফুরন্ত আমার চাওয়া, অশেষ তাঁর দান, ঈশ্বরেই আরম্ভ, ঈশ্বরেই শেষ।

আমি কখন কী শুনেছি, কী দেখেছি, কী জেনেছি এর প্রতিক্রিয়া সারা দিন গানের রেশ মত গুন গুনিয়ে থাকে, আমি তা এড়াতে পারিনা । কে যেন আদেশ দিল, লিখে যেতে হবে। আমার প্রার্থনা সব সময় কাছে থাক । তুমি যখন নীরব থাক আমার বীণায় ঝংকার উঠেনা; অন্তরের নিধি তুমি, তোমাকে ভুলা যায় না । তুমি ভুলনা বলেই স্মরণে আছ । হাত ধরে লিখিয়েছ, তোমার পরশ পাই নূতন - সূর্য হয়ে প্রকাশ হতে চাইছে বলেই অভিভূত হয়ে আগামী সত্য লিখেছি । আজ লিখছি যুগ প্রলয়, যা শুনেছি তাই লিখেছি। যা জানতে চেয়েছি যা শুনতে চেয়েছি-শুনিয়েছ ; তা'ই আমি লিখি। যে সব শব্দ সমূহ আমার কানে এসেছে ঐ শব্দ গুলো লেখায় প্রকাশ পেয়েছে ।

হে অচিন বন্ধু, আমি তোমার জন্য সেজে থাকতাম, তুমি সব অলঙ্কার খুলে দিলে। আমায় করেছ বিরহিনী। সঙ্গীতে আমি কেঁদেছি, নৃত্যে আমার তাল কেটে গেছে, তবু শত শত চোখে দেখেছ, ভালবেসেছ । নিয়ে এলে দুর্গম পথে ।।

যুগ প্রলয়

যখন যুগ প্রলয় হয়ে পৃথিবী জলমগ্ন হল, তখন এক জোড়া মানুষ, এক এক জোড়া জন্তু, সরিসৃপ, পাখী ইত্যাদি প্রাণী এবং বেদধারক ঋষিরা 'সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার' মানব - মানবী ও বালখিল্য ঋষিরা, এক একটা নৌকায় ভাসতে থাকে । 'শুনলাম' বাইবেলেও নাকি উক্ত বিষয় আছে ।

বেদেও সৃষ্টি রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভাষমান ঋষিরা কি যমুনাদ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলেন? কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কি এরপর বেদ বিস্তার করে বেদান্ত দর্শন লিখেছিলেন ? এর জন্যই কি তারনাম বেদব্যাস ?

যিনি বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ও মহাভারতে লিখেছেন ; আমার চিন্তায় উভয় কৃষ্ণ অভিন্ন । কারাগারে নারায়ণের আবির্ভাব ও এক হয়ে যাওয়া, বিষয়টি আমাকে অস্থির করে । পরাশর পুত্র কৃষ্ণ, লিখছেন - বসুদেব পুত্র কৃষ্ণ কথা ; এ ও শুনেছি - শুকদেব ভাগবত প্রচারকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন । এঁর বিষয়ে বলা হয়েছে - ব্যাসদেবের শ্রবণ হতে তাঁর জন্ম । জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৃহত্যাগী হন এবং ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন । শুকপাখী ও শ্রুতিধর, শুকদেব ও ভাগবত বিষয় বহন করেন, এর জন্য তাঁর নাম শুকদেব । তাঁকে ব্যাসদেবের আত্মজ (পুত্র) বলা হয় ।

অনেক অনেক কাল হতে আমরাও শুনে এসেছি ঈশ্বর কথা, শুনে এসেছি কৃষ্ণ নাম, রাম নাম। শুক পাখীর মতই ঈশ্বর বিষয় বলি, বলতে বলতে কৃষ্ণ নাম মনকে স্তম্ভিত করে ; আর বলার সাধ্য নাই, তখনি - নীরবে স্বীকার করি চিরসত্য পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরকে । হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, বলে নিঃশ্চিত যাঁরা হন, তাঁরাই আত্ম সমর্পিত হয়ে নিঃশঙ্ক হন । কোন ভয় থাকে না

বলে শান্তিও তাঁরা পান । উক্ত কারণে তাঁদের ইচ্ছা, প্রার্থণা পূর্ণ হয় কিন্তু শরীর স্বভাব ক্রিয়া - জীব লঙ্ঘন করতে পারে না । বিশ্ব প্রকৃতি সাথে আমরা সব দিক দিয়ে জড়িত আছি । সর্ব্বত্যাগীরাও বিশ্বের স্বভাব হতে মুক্ত নয়, শরীরে আবদ্ধ থাকায় শরীর ধর্ম্ম পালন করতেই হয় । যৌগিক ক্রিয়াদ্বারা অনেকে স্তব্দ থাকেন মাত্র । সমর্পিত বলে মরণ ভয়শূণ্য হন কিন্তু রোগ শোক তাঁরাও ভোগ করেন 'রঙ্গালয়ে' হাসেন-কাঁদেন, নির্দায়ী হয়ে যা করতে হয় করেন।

অনেক সময় শিশুমন যখন আব্দার তোলে, অগ্রাহ্য করেন না, মিষ্টি দিয়ে তুষ্ট করার মত তৃষ্ট করেন ।

সর্ব্বময় - তুমি, সবই তোমার এ জ্ঞান, ঈশ্বর চিন্তা, রক্ষা কবচের মত তাঁদের পবিত্র রাখে । সর্ব্বনিয়ন্তা ফাঁকে ফাঁকে ভাবাপন্ন করেন, তাঁরা আমাদের মধ্যে থেকে ও ব্যতিক্রম মত । জনসমাজে তাঁদের ব্যক্তিত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় ।

লিখিছিলাম কি দেখেছি শুনেছি, জেনেছি, হঠাৎ তা মোড় নিল । মাঝে মাঝে টুকরো কাগজ এঁটে দিচ্ছি যেমন, এটা ও অনেকটা তাই ।

স্মৃতি, শ্রুতি, দর্শন, জ্ঞান হতে মনে প্রশ্ন উঠে একি ! কেন ?

সন্ধান হতে থাকে ; বিদিত বিষয় সমূহ প্রথমে আলোচনা হয়, প্রচার হয়, এরপর লিপিবদ্ধ হয়ে গ্রন্থাকারে থাকে। পুরাণ গ্রন্থাদিতে জ্ঞান উন্মেষের প্রথম ইতিহাসে প্রথম মানুষ স্বয়ম্ভু মনুর কথা আমরা জানতে পাই । বলা হয়েছে তিনি ব্রহ্মের প্রথম পুত্র (আদি মানব) । অশ্বত্থ বৃক্ষ - আদিবৃক্ষ । ঋষি অথর্ব ঋষিই সকল বিদ্যার মূল কারণ ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করেন ; তিনি প্রথমে তা সুমন্ত, সত্যবাহ, অঙ্গিরাকে ব্যক্ত করেন, অঙ্গিরা তা অঙ্গিরসকে প্রদান করেন ব্রহ্ম বিষয় । এ প্রকারে ব্রহ্ম বিষয় প্রচার হতে থাকে । শুনেছি - অথর্বই প্রথম অগ্নি আবিস্কারক, যাগযজ্ঞ প্রবর্ত্তক । অগ্নিরক্ষার জন্য হোমকুণ্ড নির্ম্মান হয়, ঐ কুণ্ডে কাষ্ঠ স্থাপন করে চর্ব্বি দিয়ে আহুতি দেওয়া হত ।

অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, উল্লেখ হওয়াতে চর্বি বলছি । প্রথম অবস্থায় তা-ই সম্ভব । রন্ধন কার্য্যও তখন থেকে হয়েছে ধারণা করা যায় । ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থে মানুষের ক্রম বিকাশ জেনেছি ।

পুরাকালে পুরোহিতদেরদ্বারা, অর্থাৎ নগর উন্নয়ণ ভারপ্রাপ্তরা শিক্ষা দীক্ষা দিতেন এবং বিবাহাদি ও উপনয়ন দিতেন ; শ্রাদ্ধ কর্ম্মাদি সম্পন্ন করতেন । ঐ প্রথা ভারতে এখনও আছে। পুরোহীত তর্পন পুরাণ পুস্তকে জানা যায় তখনের ভূমি মূল্য, গো মূল্য, অশ্ব মূল্য, ইত্যাদি । তা উল্লেখ থাকায় তখনকার তুলনায় এখন আমরা বিশ্বাস করতে পারি না কিন্তু অনুসন্ধানী ইতিহাস লেখকদের নিকটও সব মূল বিষয় নগণ্য নয় । আমাদের বাপ দাদার সময়ে চালের মূল্য ছিল তিন টাকা মন, এরপর সাত টাকা, এখন তা ধারণার অতীত । স্বর্ণ মূল্য - সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ারেও ১০০ টাকার অধিক ছিল না । এখন ?

পূর্ব্বে নগরের সুব্যবস্থাকারীদের পুরোহিত বলা হয়েছে, অনুমান করা যায় উপযুক্ত ব্যাক্তিরাই পুরোহিত হতেন । বেদবেদান্ত তাদের কণ্ঠস্থ ছিল । অর্থবানই আয়ূর্ব্বেদ প্রনয়ন করেন । সয়ম্ভূ

পুত্র সয়ম্ভু মনু জন পদ স্থাপন করে তিনিই সমাজ ব্যবস্থা ও নীতি স্থাপন করেন, মনুব লিখিত বিধান (সংহিতার) এখনো ভারতে প্রচলিত আছে। বারদিনে শিশুর সূর্য্য দর্শন, ছ মাস হলে অন্নপ্রাসন, পাঁচ বৎসর বয়সে বালকের হাতে খড়ি দেওয়া, বার বৎসরে উপনয়ন (পৈতা) দেওয়া ও শ্রাদ্ধ শান্তি, বিবাহ, প্রসূতীব গৃহরক্ষা ব্যবস্থাদি, তো বুঝছি - বর্ত্তমান বিজ্ঞ্যান পরিপন্থি নয়। ভাবতীয জ্ঞান বিজ্ঞ্যান সেই তখন থেকে প্রচলিত হযে এসেছে। পুরোহিতরা আনুষ্ঠানিক ভাবে তা কবান।

ভারতের বিজ্ঞানী চিকিৎসকরা শরীব সংশোধন লিখেগেছেন, কায়কল্প বলা হয। মিশরের মামি বিষয় জানাবপব, কাযকল্প ব্যবস্থা ছিল বলে ধারণা হয। যৌগিক ক্রিয়াতেও তা করা হত বলে মনে হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানদ্বাবা চক্ষুদান, প্লাসটিক সার্জাবি দেখে শুনে, সবই সম্ভব বলে ধারণা হল।

পুরাণ গ্রন্থ বিষয়ে আজগুবি গল্প মত শুনতাম, প্রচলিত অনুষ্ঠান গুলি কুসংস্কার মনে করতাম; এখন বর্ত্তমান সময়। বিজ্ঞানই প্রমাণ করে দিচ্ছে এগুলি কুসংস্কাব নয। বিজ্ঞ্যান উন্নতী একদিনে হয় নি, সেই তখন থেকে ক্রমে, ক্রমে, অগ্রসর হয়ে এসেছে। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা মন বুদ্ধিকে পরিচালনা করে। ইতিহাস ও পূর্ব্ব বিষয় ভিত্তি ত্যাগ করে না এখন ও তখনের সমালোচনা হয় ইতিহাসে।

কেন আমবা সামাজিক ভাবে - অনুষ্ঠান করে সূর্য্য দর্শন, অন্নপ্রাসন, উপনযন, বিধান মত করতাম, তা প্রসূতীব গৃহরক্ষা থেকে আরম্ভ কবিছি। প্রসূতি গৃহে জন্ম লাভ করে বিজ্ঞান মৃত্যুতে স্তব্ধ আছে কিন্তু ভারতে ক্রিযা কর্ম্মাদিতে শ্রাদ্ধ শান্তি হয়; এখানে জ্ঞ্যান-বিজ্ঞ্যান মিশ্রনে অমৃত সন্ধান দেয়।।

প্রসূতি গৃহ

বার দিন দরজা বন্ধ কবে, প্রসূতি গৃহ বাখা হত আলাদা কবে। ভেতবে যেতে হলে পাদুকা খুলে যেতে হয় - অগ্নি স্পর্শ কবে। মা ও ধাত্রী ছাড়া নবজাত শিশুকে কেউ স্পর্শ কবত না। এ সব করার কারণ হল শিশুর সহসা বাইরের হাওয়া সহ্য না হওযাই স্বাভাবিক। ঘরের বাইবে ধূমায়িত আগুন রাখা হত মশা মাছি যাতে না আসে। বিজ্ঞানেব উন্নতির সাথে সাথে উপরোক্ত প্রয়োজন আর হয় না। কিন্তু জুতা পায়ে না ঢোকাই শ্রেয। পূর্ব্বের আচার বিচার যদি কুশিক্ষা মনে করা হয় - ভুলই হবে। কারন এর পেছনে বিজ্ঞ্যানেব পদক্ষেপ দেখা যায়, ইহা প্রাথমিক শিক্ষার সোপান।

ছয় দিনের পর শিশু চম্‌কায় কিনা লক্ষ করার জন্য সুকনো মটর, কলাই, হাড়ীতে রেখে কানের কাছে শব্দ তোলা হয়। কানে শোনে কিনা দেখে। এখন এই পরীক্ষা উন্নত মানের হয়েছে কিনা তা আমি জানি না।

সূর্য্য দর্শন

বার দিনে সূর্য্য দেখান হয় ; কারণ নবজাত শিশুর সহসা তীব্র আলো সহ্য না হওয়াই স্বাভাবিক, ১১ দিনে জানালা দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং ভাবতীয়রা ধান দূর্ব্বা দিয়ে পরিবাবেব সবাই আশীর্ব্বাদ করে । শিশুকে অন্ন দেওয়া হয় ছ মাস পর, মুখে ভাত ছোঁয়ান হয়। হজম করাব অবস্থা না হওয়া পর্যান্ত অন্ন দেওয়া হয় না ।

উপনয়ন

হাতে খড়ি দেওয়া হত পাঁচ বৎসর বয়সে এখন যেমন পেন্সিল দেওযা হয় কলম ধরতে শেখায় ।

বার বৎসর হলে পর উপনয়ন হয় । গায়ত্রী মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে পৈতা দেওযা হয়েছে পুত্রকে । গায়ত্রী হল সূর্য্য বিষয়ক ।

"বিশ্বামিত্রকে গায়ত্রী মন্ত্র দ্রষ্টা বলা হয়েছে" তিনি জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত করে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করেছিলেন জীব জগত সূর্য্য প্রাণ স্বরূপ ; সূর্য্য শুধু জাগতিক বস্তুকে আলোকিত করেনি, সৃষ্টিব কারণ স র্য্য । আমাদের মনে দর্শিত বিষয়বস্তু প্রজ্ঞা দিচ্ছে।

উপনয়ন হল জ্ঞান দৃষ্টি, (তৃতীয় নয়ন) বিজ্ঞানের প্রথম ধাপও বটে । বালককে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করে নিয়মের মধ্যে থাকার শিক্ষা দিয়ে, সূর্য্যের সম্মুখিন করে গায়ত্রী উচ্চারণ করান হয় । যেমন জমি কর্ষন করে বীজ বপন করা না হলে ফসল ভাল হয় না । তেমনি নিয়মের মধ্যে না বেখে শিক্ষা দিলে তেমন ভাল হয না । উক্ত কারণে নিয়ম সংযমে রেখে বালককে উদ্বুদ্ধ হবার ভূমিকা (ভিত্তি) দেওয়া হয় ।

সূর্য্য মন্ত্রের অর্থ হল ত্রিভূবন যার দ্বারা প্রসবিত সেই সূর্য্য দেবে মন বুদ্ধি প্রনোদিত হোক্ (সৃষ্টি কারণ সূর্য্য) । উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মে অধিকার হয় না । উপবিতধারীরা কর্ম্মে অধিকারী বলিয়া চিহ্নিত হয়েছেন । প্রাতে জীব জগৎ জেগে উঠে, এবং সূর্য্যালোকে দেখতে পায় প্রাকৃতিক শোভা, জাগরণে দর্শন শ্রবন দ্বারা মন বুদ্ধি সচেতন হয়। সূর্য্য রশ্মিতে শরীর সুস্থ থাকে, সুস্থ শরীরেই মস্তিষ্ক সতেজ থাকে । সূর্য্য রশ্মিতে লাল নীল হলদ এই তিন রং মিশ্রনে আরো অনেক রং দেখা যায় ; ভারতীয়রা রঞ্জন আলো শরীরের জন্য প্রয়োজন আছে মনে করে বিশেষ, বিশেষ, রত্ন ধারণ করেন। যার শরীরে যে রশ্মি প্রয়োজন, সেই রঙেব রত্ন ধারণ করতে জ্যোতিষিরা ব্যবস্থা দেন ।

প্রভাত আলো উদ্দিপনা এনে জীবন বিকশিত করে, উক্ত কারণে প্রাতে সূর্য্য সম্মুখীন হয়ে গায়ত্রী উচ্চারণ করা হয় ।।

বরাবরই ভারতীয়রা জানতেন ভূগোল চক্রাকারে ঘোরে, বলেন ঈশ্বরই চক্রধারী বিষ্ণু (পালক)। উপনয়ন বিজ্ঞানের বিশেষ ধাপ ।

মেয়েদের উপনয়ন দেওয়া হয় না কেন ? এ এক মহা প্রশ্ন মেয়েরা পুরুষের অধীনে থাকতেন বলে পুরুষের দায় দায়িত্ব স্বভাবতঃই সচেতন ছিল । এখন ও গ্রাম গঞ্জের পুষেরাই মেয়েদের সকল দায়ীত্ব ভার বহন করেন । নারীর কোমনীয়তাই তাই পুরুষকে শক্তিশালী করে তুলেছিল । নারীর সেবা যত্ন, মাতৃত্ব, কন্যার সরল বিশ্বাস, পত্নীর নির্ভর, স্বামীকে যোগ্য ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন করে । নারী পুরুষের সহ ধর্ম্মিনী ; নারীই মহাশক্তি দশমহাবিদ্যা । কোমলে কঠোরে স্বয়ং সিদ্ধা । মা'ই 'পিতৃপরিচয় শিশুকে দেয় ।।

শ্রাদ্ধ শান্তি

শ্রাদ্ধে আত্মা স্বীকৃত হচ্ছে। শরীর গত হলেও আত্মার বিনাশ হয় না, পরমাত্মায় ব্যাপ্তীতে থাকে ; বিদেহীর ব্যবধান কারুর সহিতই থাকেনা, একত্ব প্রাপ্ত হয়, এমন একটা ধারণীয় শ্রাদ্ধাদি ও তর্পন করা হয় । ভারতে দর্শন জ্ঞ্যানদ্বারা আয়ু ও পরমায়ু উল্লেখ হয়েছে । আয়ু হল প্রত্যাক্ষ্য জীবন, পরমায়ু হল অফুরন্ত, যা পরম্পরা ধারায় পুত্র পৌত্রাদিতে প্রবাহিত হয়ে চলে । দেখা যায় - পুত্র কন্যা ও পৌত্রাদির হোরায় পিতা - মাতার নাম রূপ রক্ষা হচ্ছে (সাদৃশ্য থাকছে)। ঐ সব কারণে পরমায়ু স্বীকৃত হয় ।

'দর্শন বলে' পরমাত্মার বিকাশ ও ক্রিয়া সর্ব্বাধারে আছে এবং পরমাত্মা তুষ্টিতে সর্ব্ব আত্মা তুষ্ট হয়, এই ধারণায় ঈশ্বর স্মরণ করে দান ভোজন সেবাদি হয় । আত্মীয় সজনরা আমন্ত্রিত হয়ে শ্রাদ্ধে আসেন । ব্রাহ্মন ভোজন দান সেবা তর্পনাদি করে, শ্রাদ্ধ করা হয় ।

"তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট" কথাটা ভারতে দীর্ঘকাল হতে আছে ।।

"পিতৃলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক," তা ক্রমে ক্রমে বিদেহী ব্রহ্মে বিশ্রাম লাভ করে সর্ব্ব দুঃখ বাসনা কামনা হতে মুক্ত হয় । যেমন ক্রমেতে জীবের বোধোদয় হয় এবং ধাপে ধাপে শিশু অবস্থা হতে বার্দ্ধক্যে জরা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে, তেমনি বিদেহীর আমি বোধ ক্রমে লুপ্ত হতে থাকে । পঞ্চ আত্মা, পিতৃলোক দেবলোক অতিক্রম করে ব্রহ্মে বিলীন হয় ।

ধারণা করি - পিতৃলোকে স্মৃতি -সংস্কার থাকে, দেবলোকে মোহ মুক্ত হয়, ব্রহ্মলোকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করে মায়ামোহ শূন্য হয়ে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় । দেখা যায় সবই ক্রমে ক্রমে হচ্ছে, যা হঠাৎ মনে করি কিন্তু তা ক্রমেই অগ্রসর হয়ে এসেছিল । কোন কিছু ক্রম অতিক্রম করে না। মহাভারতের যুগে ঋষিরা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন । আমরা জানি অতীত ও বর্ত্তমান ; ভবিষ্যৎ ও জানা যায়, কারণ অতীত বর্ত্তমানই ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে করে এগিয়ে এনে ভাল-মন্দ ঘটায়, অর্থাৎ অতীত ও বর্ত্তমান কর্ম্মদ্বারা ভবিষ্যৎ প্রস্তুত হচ্ছে, সুতরাং অতীত বর্ত্তমান লক্ষ্য করে যাঁরা ভবিষ্যৎ জানতেন, তাঁদের ত্রিকালজ্ঞ বলা হত । জ্যোতির্বিদরাও জন্ম পত্রিকা তৈরী করেন ; জন্ম লগ্নে গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান কোথায় ছিল বিচার করেন ; অঙ্ক কষেন । বিচার ও গণনা ঠিক হলে প্রায়ই ব্যাক্তি জীবনে তা ফলে দেখা যায় । গণন করা অদৃষ্ঠ গণনা করেন ; অদৃষ্ঠ অদেখা ভবিষ্যৎ । কিছু জানছি এবং রত্ন ধারণ করি কিন্তু জ্যোতির বিদ উমরখৈয়াম বলেন - যে অলখ্য হাত তাঁর দুর্নিবার লেখনীর মুখে,

অসংখ্য ললাটের নিত্য অকম্পিত বুকে -
ভাগ্যলিপি লিখে চলে যায়,
তোমাদের নয়ন ধারায় সে লিখন আজীবন ধৌত যদি হয়
তবু তার রেখা মাত্র মুছিবার নয় ।
তোমার সকল পূণ্য সর্ব্ব অনুরোধ,
রে অবোধ - ফিরাতে পারে না তারে আব
একটি কথাও কভু পালটি সে লেখে না আবার ।।
(অনুবাদক নরেন্দ্র দেব)

"ত্রিকালজ্ঞের কথা লিখতে গিয়ে এ আবার কি ?"

"জাতিস্মর তা কি সম্ভব ?"

আত্মা নূতন আকারে, নূতন পরিচয়, নূতন রূপে এলে গত জীবন কাহিনী মনে থাকে না ; এর কারণ - যে শরীর খাতায় কাহিনী ছিল , তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলে আবার সেই ভাবে বিন্যাস হয় না, নব জীবনের নূতন নাম রূপে, নূতন পরিচয় বহন করে ; বিগত ইতিকথা স্মরন করতে না পারাই স্বাভাবিক । বর্ত্তমান জীবনেও দেখা যায় বার্ধক্যেকে অতীত কথা স্তিমিত হয়ে আসে। অসুস্থ ব্যাক্তির ইহ কালের স্মৃতি লোপ পায় ; এমন উদাহরণ বহু আছে । এ স্থলে ভাবা যায় নাকি - শরীরেব অংশ গুলো (পঞ্চতত্ব) আলাদা হওয়ার পর বিগত জীবন কথা মনে না থাকাই সম্ভব । বিজ্ঞান দিক দিয়ে চিন্তা করলে নবজাত শিশুর বোধ শক্তি খুবই কম, ক্রমে তার জ্ঞানোদয় হয়, এবং নূতন পরিবেশে ও শিক্ষায় অবিনাশী আত্মা আবার নূতন জীবন আবন্ত করে । বলা হয়েছে পুঞ্জিভুত আকাঙ্খাই জন্মের কারণ । আমি কে ; এই প্রশ্ন হেয়ালি সৃষ্টি করে বরাবরই ছিল । আমি আমি বলতে বলতে নিজেকেই আমরা ভুলি ; কিছুতেই আত্মস্থ হতে পারি না বলে স্মরণাতীত থাকি, পূর্ব্বে কে ছিলাম মনে না থাকার আর একটি কারণ এও হতে পারে আমার বহিরাবরণ আমাকে আড়াল করে আছে । আত্মবোধ যদি কারোর থাকত, জন্মান্তরে স্মৃতি লোপ হতো কিনা কে জানে । অনেকেই জাতিস্মরের কথা বলেন । মনচেতনা যদি আমার হয় মনের গভীর দাগগুলো যা জীবনে অবিস্মরণীয় চেতনায় সর্ব্বদা ছিল , তা আবার আত্মায় ক্রিয়া হওয়া কি অসম্ভব ? (যদি মন চেতনাকে আমার বলে স্বীকার করি) কদাচিত উপরোক্ত কারণে জাতিস্মর হওয়া বিচিত্র নয় ।অনেকের ধারণা পরবর্ত্তী জন্মে - পূর্ব্ব শিক্ষা ও অভ্যাস গুলো আত্মা অনুসরন করে (পুনরাবৃত্তি হয়) ।

আমি এই জন্মেই স্মৃতি লোপ হতে থাকে বলেছি, কিন্তু অভ্যাস থাকে । ধারা গত শিক্ষা জীবনকে পরিচালনা করে। পরজন্মে তা ক্রমে লোপ পায়। নূতন জন্মে, নূতন শিক্ষা, কিন্তু অসম্পূর্ণ আশা আকাঙ্খা সম্পূর্ণ করতে প্রয়াস পায় ।এই ভারতীয় পৌরাণিক মত পরমাত্মাতে

নির্ব্বান লাভ করার জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্যই আত্মা বার বার জন্ম নেয় । বিশ্রামে আনন্দ আছে এতে আমার কোন সন্দেহ নেই ; যে কোন কাজে যখন কৃতকার্য লাভ করি, মন শান্ত হয় আনন্দ পায়, এতেও সন্দেহ নাই, অসম্পূর্ণতাই দুঃখ, নিরানন্দের কারণ মনে হয় । এর জন্যই বার বার জন্ম । এ জন্মে সুখের সংসার হলো না, পর জন্মে আবার নূতন ঘর সৃষ্টি হয়। এ সব কথা মানলেও - না মানলেও, প্রতিদিন আমরা বিশ্রাম চাই, বিশ্রাম করি । বিশ্রামে আরাম আছে, পশু পাখী ও বিশ্রাম কবে । উপরোক্ত কাবণে নির্ব্বান চাওযা হয়েছে : চিরনির্ব্বাণই মুক্তি আবাম ।।

ধুনুমুনু নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

হঠাৎ লিখে বসল স্কুল কলেজে যাওযা হয়নি, তবু আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্রী। মাটির সে কত রং, গাছ, পাখী, সমুদ্র - নদনদী, ঝর্ণা, চন্দ্রসূর্য, আকাশ, আমাকে ভাবিয়ে তুলে, লেখাপড়ায় মন দিতে পারিনি। মাষ্টারনী ও মাষ্টারমশায় বিরক্ত হযে নিরস্ত হলেন। আমাব কাছে হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত সব ঘোলাটে হয়ে একাকাব হওযাতে তাদেব ধৈর্য্য থাকেনি। অথচ কিছু বলারও ছিল না।

ছোট বোনেবা পড়ছিল, লেখাপড়া কবে যে, গাড়ীঘোড়া চড়ে সে, প্রশ্ন করেছিলাম, একেমন 'বই ? লেখাপড়া না কবে কত লোকেই গাড়ী চড়ে, আমিও চড়ি।

আমার কথার উত্তর মাষ্টাবমশায় দিলেন না। বললেন- কি ধরণেব বই পছন্দ কব- বল? হিন্দীতে অহল্যাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ, সুন্দর, সুন্দব গল্পেব মত অনেক বই আছে, আনব ? পডবে তুমি ?

মাষ্টারমশায়ের সংশয়ের কারণ আমি জানতাম, বলেছিলাম চেষ্টা করব। আমি চেষ্টা করেছি, অনেক বই জড়ো হয়েছিল। প্রশ্নজালে জড়িয়ে পডতাম। এত অক্ষব এত কথা , তা মানুষের জীবনে বোঝা নিয়ে বইগুলো আছে, আকাব, ইকারে মন দিতে পারতাম না, বেচারা হয়ে পড়লাম, আমার, লেখায় ভুল হতেই থাকল, এখন যেমন হচ্ছে ।

মাষ্টার মশায় লেখায় ভুল সংশোধন করে দিতেন। ওতে আমার প্রশ্নের মীমাংসা হতো না। পরীক্ষা পাশ করাতো দূরের কথা, স্কুলে যাওয়াই হয়ে উঠত না। মাষ্টারমশায় জ্যাঠা নরেন্দ্র কিশোরের নিকট গিয়েছিলেন আমার জন্য দুঃখ করতে। এটাই মাষ্টার মাষ্টারণী মা'র জন্য শান্তিপ্রদ হয়েছিল, আমার জন্যও। তিনজনেই রেহাই পেলাম।

জ্যাঠা, আমার শিক্ষার ভার নিলেন বোধ হয় এতদিন আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলাম, এখন জ্যাঠা আমাকে প্রশ্ন করছেন - " সবচেয়ে তোমার কি রং ভালো লাগে? কী সুন্দব লাগে?"

বলেছিলাম- মর্ণিং গ্লোরি ফুলটার রং ভাল লাগে। সুন্দর লাগে আকাশ।

জান? ঐ ফুলের রংটা লাল ও নীল মিশ্রণে হয়?

খুব হালকা বেগুনী না?

তুমি লেখাপড়ায় মন দাও না কেন। মাষ্টারমশায় দুঃখ করছিলেন।

আমার কথার জবাব না দিলে আমি পড়িনা। তোমার কথার জবাব দিলে পড়বে?

আকাশের চন্দ্র সূর্য্য তারার মত, কত কথা অক্ষরে আছে, তা জানতে হয় ; ওতে আনন্দ আছে। শুধু ভাল লাগে বলে চেয়ে থাকলে অনেক কিছুই তোমার না জানা থেকে যাবে। আকাশ কেন তোমার সুন্দর লাগে, বলতে পার? তা'ই লেখ না কেন। লেখ আকাশের কথা; চিন্তা করে দেখ কেন ভালো লাগে।

আকাশে এত রং, এত আলো, আকাশ শূন্য। সবকিছু থেকেও এর পূরণ হয় না।

কিছু লিখতে পড়তে শিখলাম। কিন্তু আকার ইকার ভুল হতেই লাগল। ভুলের মধ্যে প্রথমে পদ্য দিয়ে লেখা আরম্ভ করি, ক্রমে তা গদ্যে পরিণত হয়ে গেল। তারপর আঁকতে আরম্ভ করলাম; মেতে উঠেছিলাম রং খেলায়। গাছ পাখী কত কি আঁকলাম। শাখা বিস্তার হয় বটে, তেমন সজীব করে তুলতে পারি নি। নীল আকাশ চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, সবই আঁকি। মনের মত হয়ে চমক দিল না। হাসি কান্নাও এঁকেছিলাম, তা আমার টেরা বাঁকা অক্ষরের মত হয়ে উঠল। গানে আনন্দ পেতাম, কিন্তু তাল কেটে যেত, তবু আমার কুঞ্জে - আমি পাখী।

দিদিদের মত নাচতে ইচ্ছা হল, দু একবার নাচলাম, তারপর ভাল লাগল না। আমি থমকে গেলাম। বংশ মর্যাদার জন্য আড়াল করলাম নিজেকে। কিন্তু সেই বিভোরতা - আমাকে বিভোর করে অশেষ হয়ে থাকল। জীবন প্রবাহে আমি ভেসে গেলাম। যে ডুবে গেলো, সে থাকল আমার অন্তরে এক ফোঁটা মুক্তার মতো।

অনেকে বলেন আমি নাকি অস্থির। তারা আমার কর্ম ব্যস্ততায় অস্থির হয়ে উঠেছেন বোধ হয়। (আমার সমালোচনা হয়েছে) সবই বুঝতাম, কিন্তু ইচ্ছে হল না নিজেকে থামাতে। কাজের পর কাজ হতে থাকল......। অনেকে আমাকে প্রশংসা করেন, পছন্দ করেন, কিন্তু ভালবাসতে পারেন না। বুঝেছি এর পেছনে কারণ ছিল, প্রচার ছিল। নিতান্তই যাঁরা ভালবাসেন, তারা কাঁদলেন, আমার জীবন সঞ্চয় মধ্যে তারা চোখের জল রেখে গেলেন। ওদের বন্ধন ছিন্ন করার সাধ্য আমার হয়নি। ঐ বন্ধনই সবচেয়ে দুঃখ আমাকে দিয়েছে।

রাজশক্তিতে আমি বিশ্বাসী নই। রাজরোষ আমার জন্য বৃথা, ব্যর্থ হয়েছিল। পৃথিবীটাই আমার কারাগার।

যাঁদের ভালবাসি, তাদের কাছে আমি ভীত, ত্রস্ত ; যখন ওরা ছেড়ে দিয়েছে আমার হাতে, আমার আনন্দ হয় না। কেউ ক্ষমা চাইলে মন আমার উদাস হয় ; আমার সত্ত্বা ছটফট করে। অসুস্থ বোধ করি।

আমি কাউকে দুঃখ দিতে চাইনি, ভাগ্যদোষে দোষী হয়েছি। ক্ষমা চাইলাম না, ওদের চোখের জলে সিক্ত হলাম। ক্রমাগত স্রোতে ভাসা মানুষ আমি, অনেক অনেক দিন পর আমার ঘুম আসছে। আকাশের রং গভীর দেখায় একটা স্বপ্ন নিয়ে ডুবে যাচ্ছি। আমার চাওয়া পাওয়ায় যে আছে, সেই আমাকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

আমার স্বপ্নে তুমি থাক, জেগে থাক, এ আমার শেষ প্রার্থণা। এখানে আমার বিশ্রাম।।

এ যেন - সুপ্তসিন্ধু

" শান্তাকারং ভুজগ শায়নং পদ্মনাভ সুরেশ্বরং।

বিশ্বাধার গগন সদৃশ মেঘবর্ণং সুভাঙ্গং।।
লক্ষ্মীকান্ত কমলনয়নং যোগবিদ্ ধ্যান গম্য।
বন্দে বিষ্ণু ভবভয় হরণং সর্ব্বলোকৈকনাথং।।

শান্তাকারে ঘুমে মগ্ন হয়ে আছেন, তিনি পদ্মনাভ, প্রস্ফুটিত জগৎ ধারক।
বিশ্বাধার। মেঘবর্ণ আকাশের মত সুন্দর, রূপময়
কমল নয়ন, লক্ষ্মীকান্ত তিনি। ঐশ্বর্যময়।
ঐশ্বর্যময় রূপবান। যোগবিদ্ ধ্যানে জ্ঞাত
বিষ্ণুকে প্রণাম করি। তিনি ভবভয় হরণকারী
সর্ব্ব লোকের প্রভু।।

তুমি সূর্য, আমি চাঁদ, তোমার আলোকে আমি আলোকিত। সমগ্র বিশ্বের তুমি আঁধার। তুমি তোমাকে দেখেছ, বসুদেব পুত্র কৃষ্ণ বলেছ। মাথা রাখবার স্থান আমাদের দিয়েছ। একান্তভাবেই কাছে টেনে নিয়েছ। তবু আমি নিঃসঙ্গ, অতৃপ্ত, অসুখী। তোমার আমার বিচ্ছেদ হয়েছে। তুমি অশেষ, আমি, সমাপ্ত, লিখে পুস্তক শেষ করতে পারছি না।
তমক্ষরং পরমং বোদিতব্য
অসম্য বিশেষ্য জগৎ নিধানং
তমেয় শাশ্বত ধর্ম্ম গোপ্তা
তমস্য বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপে।।
আমার স্বপ্নে তুমি থাক, জেগে থাক, এ আমাব শেষ প্রার্থণা ; এখানে আমার বিশ্রাম।

সুপ্তসিন্ধু

" শান্তাকারং ভুজগ শায়নং পদ্মনাভ সুরেশ্বরং।
বিশ্বাধার গগন সদৃশ যোগবিদধ্যান গমনং।।
লক্ষ্মীকান্ত কমলনয়নং

শান্ত নির্ব্বিকারভাবে ঘুমে মগ্ন, বিশ্বাধার, মেঘবর্ণ আকাশের মত সুন্দর রূপময় আকাশের ঐশ্বর্যবান তাঁর মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্ম, সৃষ্টি ধারক বিষ্ণু তাকে প্রণাম করি।
আমার স্বপ্নে তুমি থাক, জেগে থাক, এ আমার শেষ প্রার্থণা। এখানে আমার বিশ্রাম।